মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান

বাংলাদেশ ও তালিবান

[সর্বশেষ আফগান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ]

মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান
বাংলাদেশ ও তালিবান

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান

বাংলাদেশ ও তালিবান

উবায়দুর রহমান খান নদভী
প্রধান সম্পাদক ঃ ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্ণাল
সম্পাদক ঃ পন্থা ।। আহবায়ক ঃ শুভশক্তি

সেল্‌স ঃ
কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

॥ একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা ॥

মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান

বাংলাদেশ ও তালিবান

উবায়দুর রহমান খান নদভী





প্রকাশক ঃ

ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষে –

ফারহাত জাহান সানিয়া



হোল সেলার ঃ

কিতাব কেন্দ্র, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭-৮৪৫৩৩৭



প্রথম সংস্করণ ঃ

জুলাই ঃ ২০০২



মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

অর্পণ

চিরকল্যাণময় বিশ্বব্যবস্থারূপে
পুনরায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে
বিশ্বব্যাপী জিহাদরত মর্দে মুমিনদের প্রতি –

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

প্রারম্ভিকা

নির্বাচনে ফেল করা প্রার্থীর সমর্থকদের মতো দেশের মানুষ যেন জীবন্মৃত হয়ে গেছে। নিজের পছন্দের দল বিশ্বকাপে হেরে গেলে উৎসাহী দর্শকদের যে দশা হয়। বিন লাদেন ও তালিবান শাসকদের নিয়ে যারা গর্ব করতেন, অনেক কিছু আশা করতেন, কৌশলগত পন্থায় কাবুল-কান্দাহার থেকে তালিবান বাহিনীর চলে যাওয়ায় এরা যেন চুপসে গেলেন। চরম এ অসম লড়াইয়ে যদিও এমনটিই ছিল স্বাভাবিক তথাপি মানুষ নিজের মনকে বোঝাতে পারছিল না। তালিবানের চলে যাওয়ার সাথে যদিও ঈমান ও কুফরের চূড়ান্ত লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক নেই, বিশ্বসন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মজলুম মানবতার প্রতিরোধ আন্দোলন তো এক ফ্রন্টেই শেষ হয়ে যায় না, তবুও মানুষ হিসাবে সাময়িক হতাশা ও দুঃখবোধে আক্রান্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

টেলিফোনে খবর পেলাম ছোট ভাই ওয়ালীয়ুর রহমান খানের একটি মেয়ে হয়েছে। এটা তাদের প্রথম বাচ্চা। আমার স্ত্রী-পুত্রসহ, বড় বোন ও তার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ক্লিনিকে গেলাম বাচ্চা দেখতে। ভাবলাম, আজ তালিবান সরকারের বিদায় দিনে মেয়েটির জন্ম হলো। এ তো এক ঐতিহাসিক দিন। ফিরার পথে আপাকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যখন ডেইলী পেপারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম চোখে পড়লো দৈনিক ইত্তেফাক চলিত ভাষায় ছাপা হয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সাধুভাষার ঐতিহ্য ছেড়ে দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে হার মানলেন ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ। একটু বেখাপ্পা মনে হলেও ভালোই লাগলো। ভাবলাম কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টিতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন আর কেউ মনেও করবে না যে ইত্তেফাক কোন সময় সাধু ভাষায় প্রকাশিত হতো। এই তো দুনিয়ার নিয়ম!

বাসায় ফিরে 'মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান ঃ বাংলাদেশ ও তালিবান' নামক একটি সংকলন তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু কী লিখবো? মনের যা অবস্থা! হঠাৎ মনে হলো, তালিবান শাসনের এ পাঁচ বছর বাংলাভাষায় যেসব কাজ এ দেশের ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও

সাংবাদিকগণ করেছেন, এ সবের একটি নির্বাচিত অংশ তো রেকর্ড করে রাখা যায়। অতএব, হাতের কাছে যেসব পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, বই-পুস্তক ও নোট্স ছিল এসবের ভিত্তিতে একটি সংকলন তৈরি করলাম। এতে যাদের লেখা স্থান পেয়েছে তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ গভীর ঋণ স্বীকার করছি। উভয় জাহানে আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

পাশাপাশি একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া সমীচীন মনে করছি যে, এ সংকলনটি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ যথোপযুক্ত খাতেই ব্যয়িত হবে। কেননা, সম্পূর্ণ স্বরচিত বইপত্র ছাড়া অপর কোন সংকলন থেকে (যাতে অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা প্রতিক্রিয়া স্থান পায়) প্রাপ্ত বৈষয়িক কোন সুবিধা গ্রহণ থেকে আমি নিজেকে সচেতনভাবে দূরে রাখতে চাই। সংকলনে সন্নিবেশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও মন্তব্যের মর্মের সাথে সংকলক ও সম্পাদক হিসেবে আমার একমত হওয়া অপরিহার্য নয়। এসবে প্রতিফলিত মতামত লেখকদের একান্তই নিজস্ব। অতএব কেবল আমার ব্যক্তিগত মতামত ও মন্তব্যের ব্যাপারেই আমি দায়িত্বশীল।

নানা কারণে সংকলনটি প্রকাশে অনেক দেরী হলেও শেষ পর্যন্ত তা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসটুকু কবুল করুন। আমাদের জীবন, কর্মশক্তি ও সময় যেন তাঁর সন্তুষ্টির পথেই নিঃশেষে ব্যয়িত হয়। বিশ্বব্যাপী মজলুম মানবতার জয় হোক। সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত হোক মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী।

বিনীত

ঢাকা ॥ মার্চ ২০০২ **উবায়দুর রহমান খান নদভী**

মওসুমি জ্বর ও সর্দি চলছে। গত ক'দিন ধরে কোন কাজকর্মে লাগছি না। চেহারায় একটা শুষ্ক ও রুক্ষ ভাব এসে গেছে। যদিও আমার বড় বোন আমাকে সব সময়ই বলে থাকেন, 'তোর সুদিন দুর্দিন সব সমান। খুব ভালো সময়ও তোর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখিনা আর খারাপ সময় বা অসুখ বিসুখেও চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাবে না যে লোকটা উদ্বিগ্ন বা অসুস্থ!' আমাকে দেখে ওরাও প্রায় এমন কথাবার্তাই বলতে শুরু করলেন। গলার আওয়াজ, শরীরের তাপ বা চেহারার ভাব কোনটা দিয়েই ওদের মানাতে পারলাম না যে আমি অসুস্থ। আমাকে ঢুকতে দেখেই ওরা জেঁকে ধরলেন। আশে পাশে পরিচিত যারা ছিলেন তারাও সুরসুর করে এসে জমা হচ্ছেন তাদের বসের ঘরে।

ওদের ভাবখানা এমন যেন ওদের অফিসে স্বয়ং তালিবান সরকারের কোন হোমড়া চোমরা এসেছেন। প্রথমেই একজন খোঁচা মেরে কথা শুরু করলেন, 'কি ভাই, বোমা মেরে মেরে তো প্রস্তরযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আফগানিস্তানকে!' অন্য দুয়েকজনও যত পারেন বাক্যবাণ ছুঁড়ে চললেন। তাদের এ আঘাতগুলো কিন্তু শত্রুতাবশত নয়; অনেকটা কৌতুহল আর কিছুটা আমোদ মেশানো আছে এসবে। বিশেষ করে আমার নতুন বই 'বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ'ঃ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা' হাতে পাওয়ার পর থেকেই এরা আমার সাথে তর্কযুদ্ধের অপেক্ষায় ছিলেন।

আমি খুব শান্ত কণ্ঠে পাঁচ সাতটি কথা বলে ওদের চুপ করিয়ে দিলাম। বললাম, মুসলমানদের এত ভঙ্গুর প্রত্যয়ী, অস্থির চিত্ত আর উৎকণ্ঠিত হলে চলবে না। মুসলমানদের তো হতে হবে হিন্দুকুশ পর্বতমালার পিঠের মতো দুর্জয়, দুর্মর। আজ একমাস পূর্ণ হলো, সভ্য পৃথিবীর সুসভ্য নেতৃত্ব তাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিয়ে একাধারে শত শত ঘন্টব্যাপী লক্ষ লক্ষ টন বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে একটি হত-দরিদ্র জাতির উপর। একটি চাল-চুলোহীন রাষ্ট্র ও ভাগ্য বিড়ম্বিত দেশের উপর। কোটি কোটি ডলার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস ও অশান্তির আয়োজনে। হত্যা, আঘাত ও বিনাশের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেনসহ পশ্চিমের সকল গোষ্ঠী এই একমাস ধরেই তো দেয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা আর দানবীয় জিঘাংসায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে এরা অনেকটা নাক মুখ থেতলে যাওয়া রক্তাক্ত বানরের চেহারা ধারণ করেছে। কিন্তু দরোজা খুলতে পারেনি। কী বলে যে এখন যুদ্ধ বন্ধ করবে

ত্য-ই হয়তো ভাবছে এরা। যদিও হাকডাকে কোন কমতি দেখা যাচ্ছে না। 'পবিত্র রমযানেও হামলা চলবে', 'তালিবানরা কিছুটা দুর্বল হয়ে এসেছে' ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আচ্ছা আমি বলি, একমাসব্যাপী এমন কঠিন হামলা চললে পৃথিবীর আর কোন দেশ জাতি রাষ্ট্র বা সরকার এভাবে টিকে থাকতে পারতো! এতো সমরোপকরণ, বিমান, সৈন্য ব্যবহার করে মসজিদ ভাঙ্গা, খাদ্য গুদাম ধ্বংস, অফিস, আদালত, হাসপাতাল, বাড়ি-ঘর, এয়ারপোর্ট, রেডিও অফিস ইত্যাদি মিলিয়ে যৎসামান্য বিপর্যয়, হাজার দুয়েক নিরীহ নারী শিশু বৃদ্ধ ও বেসামরিক মানুষ হত্যা আর দেশটিকে অবিস্ফোরিত বোমা, অনির্দিষ্ট মৃত্যু, পঙ্গুত্ব আর ভয়াবহ মারণাস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিয়ে মার্কিনীরা কী পেয়েছে?

মানবতার বিরুদ্ধে তাদের এত বড় অপরাধের শাস্তি তাদের পেতেই হবে। পরকালে তো বটেই ইহকালেও সহসাই তারা লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হবে, ইনশাআল্লাহ! আজ পর্যন্ত তো তারা শায়খ ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা মোহাম্মদ ওমরসহ তালিবান নেতৃবৃন্দ, আল-কায়েদার রূপকারগণ বা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তালিবান মিলিশিয়াকে ধরতে বা মারতে পারেনি। এখনো কি এরা বোঝেনা যে হায়াত মওতের মালিক এরা নিজেরা নয়, মহান আল্লাহ্‌ই-বিশ্বজাহানের প্রভু! এরা মনে হয় মৃত্যুর ফেরেশতার হাতের চাপড় খেয়েই কেবল বুঝতে পারবে যে, 'পরাশক্তি কাকে বলে?' আর তারা আসলে কত দুর্বল অসহায় মানবসন্তান? ঠিক ফেরাউনের মতো। সে-ও তো লোহিত সাগরের তলদেশে আজরাঈলের তাদের চাপড় খেয়ে কেঁদে ওঠেছিলো। বলেছিলো, 'আমান্তু বি রাব্বি মূসা ওয়া হারূন।' নবী মূসা ও হারূনের খোদাকে আমিও বিশ্বাস করলাম। আজ বুঝলাম যে, আমি খোদা নই। কিন্তু চড় খাওয়ার পর ঈমান আনায় কোন লাভ হয়নি। সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন আজকের ফেরাউন নমরূদেরাও বলবে, বিন লাদেন আর মোল্লা ওমরের ধর্ম আমরাও গ্রহণ করলাম, আমরাও মেনে নিলাম– আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু'র শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু আজরাঈলের রক্তচক্ষু দেখে ঈমান আনায় কোন ফায়দা হবে না। ঈমান আনার তো এখনই সময়!

ইতোমধ্যে ঝালমুড়ি আনা হলো। ক্যান্টিন থেকে চা আসছে বলে ঘোষণা দেয়া হলো। এক জবরদস্ত কলামিস্ট সাহেব আমাকে আরেকটু খোঁচা দিতে চাইলেন, বললেন– এ সব তো রূহানী কথা। আখেরাতমুখি কথাবার্তা। বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি তো এমন নয়, তাই না? আমি একটু হেসে বললাম, আরে ভাই, রূহানিয়াতের জোরেই তো আফগানরা গোটা বিশ্বকে একহাত দেখাতে পারছে। আর ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর অনুসারীরা, আর মোল্লা ওমরের তালিবানগোষ্ঠী আখেরাতপন্থী হওয়ার ফলেই আজ বিশ্বত্রাসের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আখেরাতপন্থী শক্তিকেই তো দুনিয়াপন্থী অপশক্তিগুলি ভয় পায়। 'বাস্তবতার আলোকে' বলতে আপনারা কী বোঝেন, আমি বুঝিনা।

বাস্তবতা তো আজ একটাই যে, পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি একটি বৃহৎশক্তির মস্তানীর সামনে অসহায়। ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা অর্ধইচ্ছায় সকলকেই আজ তার গুন্ডামিকে সমর্থন দিতে হয়। আর সচেতন মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা তো এই যে, ওরা যত ইচ্ছে মারবে তাতে দোষ নেই কিন্তু মজলুমেরা টু শব্দটি করলেও এদের দোষ হবে, এদের আখ্যায়িত করা হবে সন্ত্রাসী অশুভশক্তিরূপে।

কক্ষে পিনপতন নীরবতা। কেউ কোন কথা বলছে না। ভাবলাম, বন্ধুদের এভাবে দমিয়ে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এরা তো দেশের সেরা সব ব্যক্তি, জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর। এমনসব গুণীব্যক্তির কাছ থেকে এত অপার বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও স্বীকৃতি তো আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ দান। এদের মধ্যে যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা কম আন্তরিক, তারাও একটু একটু করে শুভশক্তির প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। ইনশাআল্লাহ্‌, এক সময় এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ইসলামের সৈনিক। অতএব আলোচনার ভাবগাম্ভীর্য কমিয়ে আনতে আমি ঝালমুড়ির প্লেটে হাত দিলাম। বললাম, ভাই, নিন শুরু করুন। আজ আর কথা নয়; দু'লাইন কবিতা দিয়েই কথা শেষ করি– উর্দুটা ঠিক মনে নেই, অনেকটা এমন–

ওহ্‌ সীনে পে খন্‌জর চালায়ে
তব ভী শিকায়ত নেহী,
ঔর হাম আহ্‌ ভী কারে
তো ইয়ে জুর্ম হেয়্‌!

অর্থাৎ, ও যখন আমার বুকে ছুরি চালায়ে, তখন এতে কেউ কোন দোষ দেখেনা, আর আমি একটু উহ্‌ করলে এটাই হয় বড় অপরাধ।

কথা শেষ করে যখন সবাই চায়ের পিয়ালার দিকে মনযোগী তখন প্রবীণ এক রাজনৈতিক নেতা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, ভাতিজা, আল্লামা ইকবালের ওই 'নশীমন' কবিতাটা একবার পড়ে ফেলুন, তাতে আফগানীদের মনোবলটা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মুরব্বীর কথা শুনে অন্যরাও মুডে এসে গেছেন। বললাম,

নশীমন পর নশীমন ইস্‌ কদর
তা'মীর কারতা যা,
কে বিজলী গিরতে গিরতে
আব খোদ বে-যার হো যায়ে।

অর্থাৎ, হে ভগ্নহৃদয়, তুই বাজ পড়াকে পরোয়া করিসনে। একের পর এক নীড় রচনা করে চল। তোর দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য আর প্রত্যয় দেখে, একসময় মেঘমালা ও বিজলীরাই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে। তখন দেখবি তোর ঘর আর জ্বলছে না। তুই আর নীড়হারা নস্‌। দুনিয়ার মানুষ অত্যাচার করে করেই এক সময় ক্লান্ত হয় পড়বে। তোরা দেখবি, এক সময় ওরা বিতৃষ্ণ হয়েই তোদের থেকে

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তখন আর তোদের নীড় ওরা জ্বালিয়ে দেবে না। কথা বলতে গিয়ে আমার নিঃশ্বাস ফুলে উঠছিলো। হালকা একটু বাষ্পও কণ্ঠকে রুদ্ধ করছিলো বোধহয়। আবেগ ও ঈমান আমাকে শ্রোতাদের খুব গভীর গহনে নিয়ে গেছে। ওরা খুব প্রেমময় হৃদয় নিয়ে শুনছেন বলে আঁচ হওয়ায় আমি পিওনকে বললাম, ভাই, গতকালের পত্রিকার ফাইলটা আনো তো! টেবিলে ফাইলটি রেখে পাতা উল্টিয়ে একটি রিপোর্টের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনারা বোধহয় সবাই এটি দেখেছেন। তবু একটু পড়ে শোনাই, দেখুন, কত মানবিক একটি রিপোর্ট। এটি ছিল আফগানিস্তানে নির্বিচার বোমা হামলায় নিহত ছোট্ট শিশুদের উপর একটি প্রতিবেদন।

পড়া শেষ হলে আমি বিদায় হতে চাইলাম। আমার এক মাননীয় সাংবাদিক তখন সবেমাত্র এসে পৌঁছুলেন। এ বৈঠকে থাকতে পারেননি বলে আফসোস করছিলেন আর বলছিলেন এমনিতে তো ছ' মাস ন' মাসেও আসেন না আর আজ যাও এলেন তো বুঝে শুনে যে আমি নেই। বললাম, না জনাব, বিষয়টি এমন নয়। আসলে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে একটা কাজ ছিলো তো একটু চক্কর এ দিকেও দিয়ে গেলাম। শেষ মেশ আমি এ প্রবীণকে খুশী করার জন্যে বললাম, আজকের আলোচনা আমার পরবর্তী বইয়ে যুক্ত করা হবে এবং বিদায় বেলায় এ বৈঠকের সারমর্ম একটি কবিতায় বলে যেতে যাই– যা দেরিতে আসার ফলে সৃষ্ট আপনার আবেগটিও দূর করবে। আর এ কবিতাটি আফগানিস্তানে মার্কিন মিত্রশক্তির একমাসব্যাপী লাগাতার হামলার এক মাসপূর্তি উপলক্ষে বীর আফগান জাতির প্রতি নিবেদিত। কবিতার কথা শুনে শেষ মুহূর্তে মজলিস আবার ঝকমক করে ওঠলো। আমি বললাম,

তূফান কার রাহা হে মেরা
আযম কা তাওয়াফ,
দুনিয়া সমঝ রাহি কে মেরি
কাশ্‌তি ভওঁর মে হেয়।

সামুদ্রিক ঝড়েরা আজ আমার দৃঢ় প্রত্যয়, দৃপ্ত পৌরুষ আর প্রচণ্ড দুঃসাহসের তাওয়াফ করছে। আর বিশ্বব্যাপী দর্শকেরা তাদের 'বাস্তবতার আলোকে' দেখতে পাচ্ছে যে, আমার নৌকা ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে যাচ্ছে।

খুব হালকা একটু বাহবা ওঠলো। আমি বললাম, আরে ভাই, এ লাইনটা যদি আজ আমি ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের কোন সুধী সমাবেশ বা প্রেসক্লাবে পড়তাম তাহলে বাহবা দিয়ে শ্রোতারা আমার জ্বর, সর্দি তো ভালো করতোই, বৃষ্টিভেজা এ রাতে গাড়িতে লিফটও পেতাম। এ জন্যেই ঢাকায় কথা বলে আরাম পাই না।

এরপর আরেক দফা চা হলো। আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

নিজ হাতে গড়া বিপদ

মক্কার কাফেরদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি। মহানবী (সাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকে গিয়ে ওদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সাহাবীরা বিক্ষুব্ধ। কষ্টে অভিমানে তারা পাথর হয়ে গেছেন। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, এ হচ্ছে মুমিনদের জন্যে সুস্পষ্ট বিজয়ের পূর্বাবাস। কাফেরদের মিথ্যা আত্মবিশ্বাসে ফেলে রাখার এক অস্ত্র। মনস্তাত্ত্বিক ও কৌশলগত যুদ্ধের অমোঘ হাতিয়ার এ অসম চুক্তি। হাজার দেড়েক অনুসারীসহ মহানবী (সাঃ) হুদায়বিয়ার এসেছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে আর মাত্র দু'বছর পর ৮ম হিজরীতে যখন তিনি মক্কাভিযান করেন তখন তাঁর সাথে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন দশহাজার সাহাবী। এ অভূতপূর্ব বিজয় ও বর্ধিত জনসংখ্যা ছিল এ চুক্তিরই ফসল।

কাফের পক্ষের প্রতিনিধি সোহায়ল একপাশে সাক্ষর করলো। অপর পাশে মহানবী (সাঃ)-এর সীল মোহর মারা হবে এখনই। দূর-দিগন্তে দেখা যায় এক আগন্তক। খুব দ্রুত সে ছুটে আসছে। এই তো তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ওমা, এযে কাফের নেতা সোহায়লেরই মুসলমান পুত্র আবু জান্দাল। কী প্রিয়দর্শন সুপুরুষ রে বাবা! শরীরে কাটা ছেড়ার দাগ, আগুনের উত্তাপে ঝলসে যাওয়া দেহ। পায়ে ছিন্ন শেকলের বেড়ি। শ্রান্তি, ক্লান্তি ও উদ্বেগের গভীর ছায়া তার চোখে মুখে। ও তাই তো! আবু জান্দাল তো মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে যাওয়ার অপরাধ তার বাবা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। তার উপর মক্কার কাফেররা কঠোর নির্যাতন চালাতো। আজ সে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছে। ওই তো, আবু জান্দাল চিৎকার করে বলছে। মুসলিম ভাইয়েরা, আমি পালিয়ে এসেছি। তোমরা আমাকে গ্রহণ করো। আমাকে পাক মদীনায় নিয়ে চলো। রাসূলে খোদার কদম মোবারকে আমাকেও যেন তিনি ঠাঁই দেন! আমি মুক্তি চাই। আমি বাঁচতে চাই।

সোহায়েল ক্রুর হাসি হেসে বললো, এখনই দেখা যাবে মুহাম্মদের নীতিনিষ্ঠা। প্রেমের নবী বললেন, চুক্তি কিন্তু এখনো স্বাক্ষরিত হয়নি। আবু জান্দালের মুক্তির পর থেকেই চুক্তি কার্যকর হবে। সোহায়েল বললো, এ হয় না। চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও এর শর্ত ও বিষয়গুলোর উপর আমরা কথা চূড়ান্ত করে ফেলেছি।

মহানবী (সাঃ) বললেন, শুধু এই ছেলেটাকে একটু রেহাই দাও। ওকে তোমরা ফিরিয়ে নিতে চেয়োনা। সোহায়েল বললেন, এটাই তো তোমার সত্য নিষ্ঠার পরীক্ষা, হে আবদুল্লাহর পুত্র! মহানবী তখন সন্ধি পর্ব সমাপ্ত করে মদীনায় ফিরে আসার কথা ভাবছেন। সোহায়েল তার পুত্র আবু জান্দালকে দুজন গুণ্ডামার্কা

কাফেরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, পুত্রকে আমার মক্কায় নিয়ে চল। বাড়ি গিয়ে আমি ওকে শায়েস্তা করবো। বুঝাবো ইসলাম গ্রহণের মজা!

এ পর্যায়ে আবু জান্দাল আর্তনাদ করে উঠলো। বললো, ওহে মুসলিম ভাইয়েরা, আমাকে তোমরা মক্কায় ফিরিয়ে দিওনা। আমাকে তোমরা রক্ষা কর। আমাকে অভয়াশ্রম মদীনায় নিয়ে চলো। হুযুর যেনো আমাকে তাঁর পায়ে ঠাঁই দেন। সাহাবীরা হযরতের মুখ পানে চেয়ে। চোখ তাদের অশ্রু সজল, বুক ব্যথা ভারাক্রান্ত। প্রতিরোধের চেতনা তাদের স্নায়ুকে টানটান করে দিচ্ছে। পেশীগুলো হয়ে উঠেছে ইস্পাতদৃঢ়তা কিন্তু দৃষ্টি আনত, আনুগত্যের বিগলিত ধারায় নেয়ে চলেছেন সব জানবাজ সাহাবী।

নবীজী (সাঃ) বললেন, ধৈর্য ধরো আবু জান্দাল! শীঘ্রই দিন বদলে যাবে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমি তোমাকে মদীনায় নিয়ে যেতে পারি না। আমি তোমায় ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য। তুমি ফিরে চলো। আল্লাহই তোমার একটা ব্যবস্থা করবেন। মহানবীর আদেশ শিরোধার্য। সাহাবীরা যেন বিষ খেয়ে বিষ হজম করলেন। আবু জান্দালও ফিরে চলেছেন মৃত্যুযন্ত্রনার পথে। পথিমধ্যে কৌশলে তিনি পালিয়ে যান। এরপর তিনি মদীনায়ও আসেননি, পুনরায় ফিরে যেতে হবে ভয়ে। আবু জান্দাল আশ্রয় নিলেন মক্কা থেকে সিরিয়া যওয়ার পথে এক মরুপবর্তের আরণ্যিক ঘাঁটিতে। কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটে এ সাহাবী যুবকের। ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আজ যার জীবন ছন্নছাড়া। নবীজীর প্রেমে পাগলপারা মক্কার আরো বন্দী যুবক এখন খোঁজ পেয়ে গেছে নতুন আশ্রয়ের। মদীনার পথ রুদ্ধ হওয়ায় ওরা এখন ছুটতে পারলেই আবু জান্দালের আস্তানায়। একে একে দল ভারি হচ্ছে। কাছে পিঠে মক্কার কাফেরদের সন্ধান পেলে হালকা পাতলা শিক্ষাও দেয়া হচ্ছে ওদের। মক্কার বাণিজ্য কাফেলা তো এ পথ মাড়াতেই সাহস পায় না। আবু জান্দালের ভুখা-নাঙ্গা বাহিনী কাফেরদের সহায়-সম্পদে নির্দ্বিধায় হাত চালায়। কেননা, তাদের ঘর-বাড়ি, বিত্ত-বৈভব, আশ্রয়, নাগরিকত্ব সবই তো লুটে নিয়েছে এই কাফেরের বাচ্চারা। বাঁচার তাগিদেই এরা আজ সন্ত্রাসী।

মক্কা থেকে এক নওজোয়ান মদীনায় পালিয়ে এলো। সাহাবীরা শর্ত অনুযায়ী তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দুই কাফের সৈনিকের প্রহরায় ভগ্নহৃদয়ে ফিরে যাচ্ছে সে আবার পুরানো জাহান্নামে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেললো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তো আমাকে ফিরিয়েই দিয়েছেন। মদীনায় আর না গেলেই তো তাঁর ওয়াদা পালিত হয়। তো আমি অন্যত্র পালিয়ে যাই না কেন? অমনি সে শুরু করলো নিখুঁত এক অভিনয়। ভাই, কী আর করা বলো! এত কষ্ট করে মদীনায় এলাম আর ওরা আমাকে গ্রহণই করলেন না। দুর, দেশে ফিরে গিয়ে সুশীল সমাজের সাথে মিশে

গিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনই যাপন করবো। ইত্যাদি কথাবার্তায় প্রহরীরা বেশ রিলাক্স ফিল করছিলো। এক সময় যুবক বললেন, কত রকম তরবারি যে জীবনে দেখলাম রে বাবা! বন্ধু তোমার তরবারি খানা তো বেশ! প্রহরী পটে গেলো। বললো, হাতে নিয়ে দেখ না। কত ঝকঝকে আর ঋজু এটি। শাই শাই করে বাতাস কাটে, ঘুরাতে কি যে আরাম! যুবকটি হাতে নিলো সুচিক্কন তরবারি। বার দুই ঝনাৎ ঝন্ ঝাকি দিয়ে বললো, বাহ কি চমৎকার জিনিস। এবার কোপ বসালো ওই তরবারিওয়ালার ঘাড়ে। কচ্ করে আলাদা হয়ে গেলো তার মুন্ডু। মাটিতে পড়ে রইল বিশাল বপুটা। বুঝে ওঠার আগেই একজন শেষ। অপরজন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দে ছুট। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো সে মক্কায়।

যুবক ফিলে গেলো মদীনায়। তাকে দেখে সাহাবীরা আন্দাজ করতে পেরেছেন যে সে কী করে এসেছে। বললেন, কি হে ভায়া, সঙ্গী দুজনকে যে দেখছি না। বললো যুবক, দ্বিতীয়টিকে ধরতে পারলাম না। আর ওর পিছনে খুব একটা দৌড়িওনি। কারণ মক্কায় খবরটা পৌঁছা দরকার। এখন তো আর আমাকে মদীনায় রাখতে মানা নেই। নবী করীম (সাঃ)-এর অঙ্গীকার তো রক্ষা হয়েছেই। আমি তাঁর হুকুম পালন করে ফিরেও গেছি। এরপর একটা পথ আল্লাহ খুলে দিয়েছেন, আবার আমি ফিরে এসেছি। এবার আমায় গ্রহণ করুন। কিন্তু না, এ ধরনের ঘটনা প্রশ্রয় দেবে না মদীনা। অতএব, এ সাহাবীকেও সম্ভবতঃ চলে যেতে হলো আবু জান্দালের ঘাঁটিতে।

বঞ্চিত এ যুবক মুসলিমদের গেরিলা যুদ্ধ তখন মক্কার কাফেরদের অর্থনৈতিক উৎসের বিরুদ্ধে। সিরিয়ায় আসা যাওয়ার পথে মক্কায় বাণিজ্য কাফেলা প্রায় সময়ই আক্রান্ত হচ্ছে এ ভুঙ্গা-নাঙ্গা বাস্তুহারাদের হাতে। হয় এদের মদীনায় যেতে দিতে হবে নয়তো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে ভ্রমণ ও বাণিজ্যে।

অবশেষে মক্কার কূটনীতিকরা মদীনা শরীফে গিয়ে মহানবী (সাঃ) কে বলতে বাধ্য হলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে 'মুসলমান হয়ে মদীনায় আসা লোকদের ফিরিয়ে দিতে হবে'– এ শর্তটি বাতিল করে দিন। আমাদের যুব-তরুণেরা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসার পথ না পেয়ে আবু জান্দালের পার্বত্য ঘাঁটিতে গিয়ে জড়ো হচ্ছে আর আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করছে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা। মহানবী (সাঃ) বললেন, মনে রাখবেন আমাদের সাথে চুক্তি কিন্তু আপনারাই ভঙ্গ করতে চাচ্ছেন। ইতিহাসে দেখা যায় কাফেররা এ চুক্তি লংঘনের মক্কা মাধ্যমেই বিজয়াভিযানের বৈধতা সৃষ্টি করে। যে নমনীয় চুক্তিটি মুসলমানদের বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করলেও এর সুদূরপ্রসারী উপকারিতা মুসলমানদের জন্যে চূড়ান্ত বিজয় হয়ে দেখা দেয় এবং মহান আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি 'মহা বিজয়' এভাবেই বাস্তবায়িত হয়।

ওদের মৃতেরা জাহান্নামে

বদরে মুসলমানদের জয় হয়। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা একরকম হেরে যান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের আঘাতে মারাত্মক আহত হন। মুসলমানদের ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। দিন শেষে একটি পাহাড়ে হযরত (সাঃ) তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন, তখন মক্কার কাফের বাহিনীর নেতৃবর্গ অপর একটি পাহাড় থেকে চিৎকার করছিলেন। বলছিলেন মুহাম্মদ কি বেঁচে আছে? আবু কোহাফাপুত্র আবু বকর বেঁচে কি আছে? ইত্যাদি। নবী করীম (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, তোমরা কোন কথা বলবে না। ওদের কথার উত্তর দিও না। এক সময় মক্কার সর্দার আবু সুফিয়ান বললো, খাত্তাবপুত্র ওমর কি শেষ হয়ে গেছে? হযরত ওমর আর থাকতে না পেরে চিৎকার করলেন, তোমরা যাদের মৃত্যুর সংবাদের আশা করছ তারা কেউ মরেনি। এই যে হযরত আছেন, আবু বকর আছে, এ বান্দাও জীবিত ও সুস্থ আছে।

এসব শুনে আবু সুফিয়ান নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নতুন শ্লোগান তুললো, দেবতা হোবলের জয়। হযরত উমর পাল্টা শ্লোগান দিলেন, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও মহান! আবু সুফিয়ান বললো, তোমাদের উজ্জা নেই, আমাদের দেবী উজ্জা আছে। পাল্টা জবাব সন্ধানে হযরত উমর (রাঃ) থতমত হয়ে গেলে মহানবী শিখিয়ে দিলেন, বল, আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ্ আছেন। তোমাদের হাতে তৈরী কিছু প্রতিমাই আছে, শক্তিশালী কোন প্রভু নেই। এ কথা শুনে কাফেরদের মনে খুব শূন্যতা অনুভূত হলো। এরপর ওদের মাঝে একটা গর্ব দেখা গেলো এ জন্যে যে, তারা আজ মুসলমানদের ৭০ জন সৈনিককে হত্যা করছে। মহানবী (সাঃ) কে আহত করে রক্ত ঝরিয়েছে। বদরে তাদের অনেক বড় বড় নেতাকে হত্যার বদলা নিতে সক্ষম হয়েছে। তখন মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, ওদের মৃতরা জাহান্নামে চলে গেছে আর আমাদের মৃতেরা জান্নাতে। অর্থাৎ মৃত্যু এখানে ফ্যাক্টর নয়, বিষয়টি হচ্ছে শেষ পরিণতি কার কেমন হলো! সুতরাং যুগে যুগে মুসলমানদের জীবন দর্শন রূপে এটি এক অনন্য শিক্ষা যে মৃত্যু, ধ্বংস বা পরাজয় ধর্তব্য নয়, ধর্তব্য হলো মৃত্যুটি ঈমান ও সত্য-ন্যায়ের পথে হলো কি না!

যার এক চোখ অন্ধ অন্য চোখে আছে বাজপাখির দৃষ্টি

১৯৮০ সালে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক চোখ হারিয়েও শক্ত হাতে আফগানিস্তানের তালেবান শাসন ধরে রেখেছেন যে নেতা তার নাম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। শোনা যায়, ওই লড়াইয়ে তিনি চারবার আহত হয়েছিলেন। গুলিতে চোখ উড়ে যাওয়ার পর সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয় চোখের কোটর। ওমরের তালেবান অনুসারীদের বিশ্বাস, আল্লাহই তাকে বাঁচিয়েছেন।

একটি চোখ নেই তাতে কি? অন্য যে চোখটি আছে বাজ পাখির মত তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। সেই সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসের জোরে কঠোর হাতে তালেবান শাসন ধরে রেখেছেন ওমর। তাকে সব সময় বলতে শোনা যায়, 'ইসলাম থেকে সরে গেলেই আমরা হারতে শুরু করবো।' এ কারণেই অনুসারীরা ওমরকে বলকে ঈমানের কমান্ডার। যে কোন লড়াইয়ে নামার আগে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এই নেতার আশীর্বাদ নিয়ে যান মিলিটারি কমান্ডাররা। নানা আবদার খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন ওমর। তারপর সৈন্যদের জন্যে শক্ত একটি মেটালের বাক্সে দু'হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভরে তুলে আনেন একগাদা ব্যাংক নোট। পরে মৃদু হেসে বাক্সের চাবিটি ঢুকিয়ে রাখেন জ্যাকেটের পকেটে। তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান এভাবেই শাসন করেন তিনি।

এ মূহুর্তে সৌদি ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন আর গোটা আফগানিস্তানের ভাগ্য বিধাতার ভূমিকায় আছেন ওমর। সাম্প্রতিক সময় এরকম গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত হয়েও বহির্বিশ্ব এমনকি আফগানদের কাছেও ওমর এক রসহস্যময় ব্যক্তিত্ব। ওমরের একটি ছবি নেই কোথাও! তালেবান আন্দোলনের এই অবিসংবাদী নেতার ছবি প্রচারমাধ্যমের কোনো চৌকস ক্যামেরাও কখনও তুলতে পারেনি। কোন পশ্চিমা সাংবাদিকই কখনও তার সাক্ষাৎ পাননি। ওমর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে। ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর বৈঠকেও তিনি উপস্থিত না থেকে তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকেন। আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের অনেকেই শুধুমাত্র তাকে নামে চিনে। তবে, যারা ওমরকে দেখেছে তারা বলে, কালো চুল, লম্বা দাঁড়ি এবং মাথায় কালো পাগড়ি পরা লম্বা আকৃতির মোল্লা ওমরকে ৪২ বছর বয়সেও বেশ তরুণ দেখায়। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী কান্দাহারের বাসভবন ছেড়ে ওমর সচারাচর কোথাও যান না। এই কান্দাহারেরই একটি ছোট গ্রামে ১৯৫৯ সালে জন্মেছিলেন মোল্লা ওমর।

ওমরের নেতৃত্বে তালেবান আন্দোলনের সূচনা ১৯৯২ এ। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির পারস্পরিক হানাহানি শুরু হয়। জাতীয় জীবনের সেই কলঙ্কজনক মুহূর্তেই নেতৃত্বের জন্যে নিজেকে তৈরী করেন ওমর। তার আগ থেকেই তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে যুক্ত চিলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয়ায় তার পড়াশুনা আর হয়ে উঠেনি। লড়াইয়ে জয়ের পর দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে ওমর আবার পড়াশুনা শুরু করার জন্য গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এই সময়টিতেই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পারস্পরিক হানাহানির মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ওমর পুনরায় লড়াইয়ে নেমে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নিজেকে। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তার নেতৃত্বে তালেবান কান্দাহার দখল করে নেয়। পরে ১৯৯৬ সালে ওমরের নেতৃত্বেই তালেবান কাবুল দখল করে।

যুক্তরাষ্ট্রের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় শীর্ষ ব্যক্তি বিন লাদেনের সঙ্গে মোল্লা ওমরের সখ্যতার কারণে আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই প্রায় একঘরে হয়ে পড়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার নায়ক সন্দেহে লাদেনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে ওমর। বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের গোয়েন্দা ব্যর্থতা ঢাকার জন্যেই লাদেনকে অভিযুক্ত করছে। ওমরে সঙ্গে লাদেনের এই সখ্যতা দীর্ঘদিনের। ধারণা করা হয় লাদেন আফগানিস্তানে তালেবানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযানে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

বর্তমানে আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে তালেবানরা। আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ব করার পর ওমর দেশে মাদ্রাসা ও মুসলিম স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেন। তার শাসনাধীনে দেশটিতে কঠোর ইসলামি আইন প্রবর্তিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে ওমরের মতো মৌলবাদী নেতা আর নেই বললেই চলে। ইসলামের প্রতি অবিচল অনুরাগই তার জীবনের চালিকা শক্তি। ছেলে-মেয়ে সহশিক্ষায় ঘোর বিরোধী তিনি। পুরুষদের দাড়ি রাখা তার মতে অপরিহার্য। সেই সঙ্গে নাচ, গান, সিনেমা কিংবা কোনরকম অর্থহীন বিনোদন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন ছবি থাকা ইসলাম ধর্মমতে নিষিদ্ধ হওয়ায় ওমর তার ঘরে বা অফিসে কোন ছবি রাখেন না। আর নিজেও ছবি তোলেন না। ওমর তার ছবি তোলা তো দূরে থাক কণ্ঠ রেকর্ড করার অনুমতিও কখনো কাউকে দেননি। শুধু ১৯৯৬ সালে একবার কাবুলের রেডিওতে আফগানরা বিবিসি থেকে প্রথমবারের মতো ওমরের কণ্ঠ শুনেছে। সূত্র ঃ আজকের কাগজ

তালেবান শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে উপর্যুপরি বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তালেবানের শক্ত ঘাঁটি কান্দাহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাতসহ বিভিন্ন শহরে রাত ৯টার দিকে মার্কিন বি-১ বোমারু বিমান ও এফ-১৮ জেট ফাইটার থেকে মিসাইল ও বোমাবর্ষণ করে। কান্দাহারে তালেবানের প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোর আশাপাশে এই হামলা হলেও তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। তৃতীয় হামলার শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী কাবুলসহ কয়েকটি শহরের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এর আগে মার্কিন বাহিনী কান্দাহারে তালেবান শীর্ষ নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বাড়িতে টোমাহক ক্রুজ মিসাইল হামলা চালায়। এতে বাড়িটি আংশিক বিধ্বস্ত হলেও অল্পের জন্য বেঁচে যান মোল্লা ওমর। নিহত হন আব্দুর রহমান নামের এক প্রতিবেশী। মোল্লা ওমর এ সময় বাড়িতে ছিলেন না। তিনি এবং ওসামা বিন লাদেন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং তারা আফগানিস্তানেই আছেন বলে ইসলামাবাদে আফগান রাষ্ট্রদূত আব্দুল

সালাম জায়ফ জানান। তিনি জানান, মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণের জন্য ২০ লাখ তালেবান যোদ্ধা প্রস্তুত আছে। আফগাস্তিানে মার্কিন হামলা শুরুর পর মঙ্গলবার সকালে প্রথমবারের মতো দিনের আলোয় এফ-১৮ ফাইটার ও বি-১ বোমারু বিমান কাবুল কান্দাহার ও মাজার-ই-শরীফে হামলা চালায়। এ সময় ১৫ টোমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় এবং কয়েকটি যুদ্ধবিমান কাবুলের আকাশে কয়েকদফা চক্কর দেয়। তালিবান যোদ্ধারাও রকেট লাঞ্চার থেকে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর আগে সোমবারের হামলায় তালিবান বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার আখতার মোহাম্মদ মনসুর নিহত হয়েছেন বলে পশ্চিমা সামরিক সূত্রগুলো জানায়। এছাড়া ওমর আতাইয়্যা নামে একজন পদস্থ তালেবান সামরিক কর্মকর্তাও ওই হামলায় নিহত হন। তিনি একটি ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার ছিলেন। তবে তালেবান কর্তৃপক্ষ এ খবর অস্বীকার করেছে। টানা তিন দিন মার্কিন হামলায় মোট ৩৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে মোল্লা ওমরের মুখপাত্র আবদুল হাই মুতমায়িন জানান। ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়ফও সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন সন্ত্রাসবাদের নামে আফগান সরকার এবং মুসলমাদের ধ্বংস করার উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। খবর এএফপি, এপি, রয়টার্স, সিএনএন. বিবিসি'র। সোমবার রাতে দ্বিতীয় পর্যায়ে থেমে থেমে কয়েকদফা হামলায় কান্দাহারে একটি বিমানঘাঁটি, কয়েকটি তেলের ডিপো ও কাবুলে জাতিসংঘ পরিচালিত স্থলমাইন অপসারণ অফিস বিধ্বস্ত হয়। বোমার আঘাতে এ অফিসের দু'জন কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। চারতলা ভবনের ধ্বংসস্তুপের নিচে পড়ে আরও দু'জন নিহত হয়। এ ঘটনার পর আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের সমন্বয়কারী মাইক স্যাকেট সামরিক হামলা থেকে বেসামরিক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর আহ্বান জানান ওয়াশিংটন বলছে, তারা কেবল ওসামা বিন লাদেন ও তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক এবং তালিবান শাসকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর হামলা চালিয়েছে। পেন্টাগন জানিয়েছে, বোমাবর্ষণ করে তারা নিরাপদে ফিরে এসেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড র‍্যামসফিল্ড বলেছেন, আফগানিস্তানে তিন দিনের হামলায় মার্কিন বাহিনী প্রায় ৮৫ শতাংশ লক্ষ্য অর্জন করেছে। তবে তিনি বলেন, কেবল বিমান হামলা করে বিন লাদেন বা তালিবানকে পরাস্ত করা যাবে না। স্থল অভিযানের ব্যাপারেও তিনি কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলো জানায়, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে স্পেশাল ফোর্স নামানোর চিন্তাভাবনা করছে। মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী হামলা শুরুর পর ২ দিনেই বোমাবর্ষণের পাশাপাশি মোট ৫৫টি ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেছে যার আর্থিক মূল্য সাড়ে ৫ কোটি ডলার। অথচ এ বছর তালিবান সরকারের বাজেট হচ্ছে ৯ কোটি ডলার। এ পর্যন্ত হামলায় কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে বিন লাদেনের একটি পূরনো আস্তানায় হামলা চালানো হয়। কিন্তু বিন লাদেন এ সময় ওখানে

—২

ছিলেন না। হামলায় কান্দাহার বিমানবন্দরের রানওয়ে এবং রাডার ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাথমিক হামলায় কান্দাহার এলাকায় অন্তত চারজন আহত হয়। এছাড়া কান্দাহারে অনেক লোক তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ ও মাজার-ই-শরিফে কয়েকটি বিমানবন্দর এবং তালিবানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি বলে মার্কিন সমরনায়করা জানিয়েছেন। এদিকে তালিবানরা উত্তরাঞ্চলীয় জেলা পাকতিয়া, খোস্ত, লেগের এবং গার্দেজে তাদের সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেছে। সৈন্যরা স্বল্পপাল্লার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, আমেরিকার তৈরি বিমানবিধ্বংসী স্ট্রিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। ১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি আফগান গেরিলা গ্রুপকে যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছিল। জালালাবাদে তালিবান যোদ্ধারা ফ্রান্সের একজন সাংবাদিককে আটক করেছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, সঙ্গীয় দুই পুরুষসহ ওই সাংবাদিক বোরখা পরে আফগান মহিলার ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করছিলেন।

আফগানিস্তানে দফায় দফায় মার্কিন হামলায় বিক্ষোভে ফুঁসে উঠছে মুসলিম বিশ্ব। পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে তালেবান সমর্থক তিন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে। পশ্চিম তীরের গাজায় ৩ জন মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে। ইসলামাবাদসহ বিভিন্ন শহরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোয়েটাসহ কয়েকটি বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মিসর, মালয়েশিয়া, ওমান, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবাননসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জাকার্তায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে গতকাল কয়েকশ' বিক্ষোভকারী সমবেত হয়ে বুশ ও মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দেয় এবং অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান জানায়। আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরুর পর থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কিন নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আমেরিকার অভ্যন্তরেও নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্র ঃ যুগান্তর

মোল্লা ওমরের ঘোষণা ঃ হয় বিজয় না হয় মৃত্যু

আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেছেন, তার মৃত্যুতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই থেমে যাবে না। অন্যরা তার স্থান নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবেন। লন্ডনভিত্তিক সউদী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'আল-মাজাল্লা' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। পত্রিকাটি দাবি করেছে, কান্দাহারের তালিবান সদর দপ্তরে এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। খবর বিবিসি থেকে জানা যায়।

পত্রিকাটিকে মোল্লা ওমর বলেছেন, আফগান জাতিসত্তা যুদ্ধের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত। মোল্লা বলেন, 'এর পরিণতি হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু। দুটোই আল্লাহর ইচ্ছা।'

তিনি বলেন, আফগানিস্তানে হামলাকারীদের জন্য বিজয় নয়, বরং মৃত্যুই অপেক্ষা করছে। আফগানিস্তানের ভূ-প্রকৃতি ও জনগণের লড়াকু চরিত্র যুগে যুগে এ দেশকে আক্রমণকারীদের গোরস্তানে পরিণত করেছে।

মোল্লা ওমর তালিবান বিরোধী আফগান নর্দান এলায়েন্সের হুমকিকে খাটো করে দেখান এবং বলেন যে, অতীতে সোভিয়েত হামলাকারীদের সহযোগীদেরও একই সঙ্গে পতন ঘটেছে। সূত্র ঃ প্রথম আলো

আফগানিস্তান ঃ ইসলামী আদর্শের বিজয় ভূমি

চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের হোতা মাওসেতুং একবার বলেছিলেন, বিপ্লব কোন চা চক্র নয় যে এখানে সব কিছুই নিয়ম-কানুন মাফিক পরিপাটি রূপে হবে। অর্থাৎ জয়ী শক্তি বিপ্লবের সময় সব কিছু সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। এখানে জয়ী শক্তির অংশ বিশেষ আবেগতাড়িত হয়ে সামান্য তান্ডব চালালে তা ধরা ঠিক হবে না। এটা তার মতে। কিন্তু আমার মতে সে বিপ্লব কিছুটা হলেও পাপনির্ভর থকে যায়। আর পাপমুক্ত বিপ্লব যে হতে পারে তা তিনি মৃত্যুর আগে স্বীকার করে যেতেন, আর স্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষ করে যেতেন যদি তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখ সকাল পর্যন্ত বেচে থাকতেন। কারণ এক পাপমুক্ত বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় হয় ২৭ সেপ্টেম্বর রাত ১টায়। তাই পর দিন সকালে খবরে শুনতে পারতেন এক পাপমুক্ত বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নের খবর। এতে তার পূর্বের ধারনায় ধস নামতো। যা হোক, এই ধরনের এক পাপমুক্ত বিপ্লবের সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের ইসলামী তালেবান আন্দোলন নামের একটি শক্তি। বিজয়ী দল সাধারণত বিজয়ের পরে লুটপাটে লিপ্ত থাকে কিন্তু এরা সামান্যও এ দোষে দুষ্ট হয়নি। ঘটনার গভীরে একটু যাই।

তালেব অর্থ ছাত্র। আর তালেবের বহু বচন তালেবান যার অর্থ ছাত্রগণ। এ দলের প্রায় সদস্য হলো ছাত্র (মাদ্রাসার)। আমাদের দেশে যখন ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যায়ের সবুজ চত্বরকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে একে অপরের মধ্যে হানাহানি করে, তখন এই মাদ্রাসার ছাত্ররা আফগান জাতির দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য বাহিনী লাঞ্ছিত হয়ে চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর '৯২-এ সেখানে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বেধে যায়। এই প্রেক্ষাপটে এমন এক বিপ্লবের দরকার হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই মাদ্রাসার ছাত্ররাই তা জাতিকে উপহার দেয়। বহু দিন ধরে এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের ফলে সব

আফগান মুজাহিদ দলগুলোর উপর ছিল বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু তালেবানদের কার্যকলাপ খুবই ভালো বলেই সবাই প্রায় তাদের স্বাগত জানিয়েছে সারা দেশে।

অবশেষে আফগানে ইসলামী শক্তির মহাবিজয় ঘটল মাদ্রাসার ছাত্রদের নেতৃত্বে। এরা ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুলে প্রবেশ করে একপ্রকার বিনা বাধায়। সেই সাথে পশ্চিমাদের গ্রহণযোগ্য এবং উদারপন্থী রব্বানী সরকারের পতন হয়। এরা কাবুলে প্রবেশ করেই ঘোষণা করে আফগানিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। সেই সাথে ২টি ইসলামী রাষ্ট্র হলো। তারা শরীয়া আইন চালু করেছে। এ নিয়ে বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তবে প্রায় দেশই এর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। পাক সরকারই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্র মনে হয় ১৯৭৯ সালের পর এই প্রথম কাবুলে রাষ্ট্রদূত পাঠাবে। আর সে দেশ বলেছে, আফগান সমস্যার সমাধান শুধু তালেবানরাই করতে পারে।

এদের ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলি। এদের আবির্ভাব হয় ১৯৯৪-এর সেপ্টেম্বর। এদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ হাজারের মতো। এ দলে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আইনজ্ঞ, সমাজসেবী থেকে শুরু করে প্রায় সবাই আছে। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রদের সংখ্যা বেশি। এদের নেতা মোল্লা ওমর রুশ খেদাও যুদ্ধে ১টি চোখ, ১টি পা হারিয়েছেন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর-এ কান্দাহারে হেযবে ইসলামী দলের এক কমান্ডার ও তার ক'জন সহযোগী নারী ধর্ষণ করলে মোল্লা ওমর তাঁর মাদ্রাসার ছাত্র নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ঐ কমান্ডারকে হত্যা করনে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। দৃশ্যতঃ এ অভিযানের মাধ্যমেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। এদের সবাইকে তারপর ২২ মাসের বিমেষ ট্রেনিং দেয়া হয়। তারপর কিছু দিনের মধ্যেই তালেবানরা কান্দাহার এবং এর আশেপাশের বহু প্রদেশ দখল করে। আফগানের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে দোস্তামের ৭টি প্রদেশ বাদে তালেবানরা সব প্রদেশই দখল করে নিয়েছে। ৯০% এলাকা এখন তালেবানদের হাতে। এসব প্রদেশ তালেবানরা অতি দ্রুত বিশেষ ঝটিকা অভিযানের মাধ্যমে দখল করেছে। তাদের জয়লাভের ধাপগুলোকে এভাবে বললে বলা হবে যে, প্রথম ধাপে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধ, তৃতীয় ধাপে জয়লাভ-এই তিন ধাপের উপর এদের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এরা এখনও গ্রামের পর গ্রাম দখল করছে। এদের অগ্রাভিযান চলছেই। গত ১১ মাস আগে তারা কাবুল অবরোধ করে এ পর্যন্ত ছিল কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর তারা চূড়ান্তভাবে রাজধানী দখল করে। কাবুলে ঢুকেই তারা জাতিসংঘ দফতরে লুকিয়ে থাকা সাবেক স্বৈরশাসক একনায়ক, মুরতাদ ডঃ নজিবুল্লাহকে ও তার ভাইসহ অন্য ক'জনকে টেনে বের করে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আফগানিস্তানকে জঞ্জাল মুক্ত করে একটা কাজের কাজ করে। এবং তাকে ল্যাম্পপোস্টের খুঁটিতে ২ দিন ধরে ঝুলিয়ে রাখে। তালেবানরা বলেছে, নজিবুল্লাহ ১৫ লাখ মানুষ হত্যাকারী আর

ইসলাম বিরোধী, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। মুরতাদের যেমন জানাযা হয় না তেমনি তারও জানাযা হবে না বলে তারা জানিয়েছে। ৫দিন পর তার গলিত পাপিষ্ট দেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়। এই সেই ব্যক্তি যে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত আফগানে কমিউনিস্ট শাসন চালিয়েছে। শেষে সব মুজাহিদ দলের চাপের মুখে পদত্যাগ করে এবং জীবন বাঁচানোর জন্য জাতিসংঘ দফতরে আশ্রয় নেয়। এ পর্যন্ত পশ্চিমা স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাব্বানী সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ এতোদিনও নজিবুল্লাহর বাঁচার অধিকার ছিল না। তাঁর তালেবানরা প্রথমেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করল তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। ১৫ লাখ আফগান জনতার হত্যাকারীকে তালেবানরা হত্যা করে খুবই ভালো কাজ করলেও জাতিসংঘ এর প্রতিবাদ করেছে।

তালেবানরা যে এলাকাই দখল করেছে সেখানেই তারা ইসলামী আইন চালু করেছে। তারা ইসলামী আইন শুধু চালুই নয় তা সারা দেশে প্রয়োগেরও ব্যবস্থা করেছে। তালেবানরা তাদের প্রশাসনে দাড়ি ও টুপিওয়ালাদের নিয়োগ করেছে, চুরির অপরাধে হাত কেটে দিয়েছে। ব্যভিচারের দায়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করছে, সব প্রেক্ষাগৃহ জ্বালিয়ে দিয়েছে, ডিশ এন্টেনা প্রতি বাড়ি থেকে নামিয়েছে। রেডিওতে অশালিন সংগীত নিষিদ্ধ করে রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত ও নৈতিকতা সমর্থিত সংগীতের ব্যবস্থা করেছে। হিন্দি, আরবী গান নিষিদ্ধ করেছে। মহিলাদের বোরখা পরে বাইরে বেরুতে বলেছে, সরকারী কর্মকর্তাদের ৪৫ দিন সময় বেধে দিয়েছে দাড়ি রাখার জন্য, তারা দাড়ি কাটতে পারবেন না, এর ব্যতিক্রম হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে তাদের, নামায বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলমানদের নামায পড়তে হবে। রাস্তায় পথচারীদের তারা নামাযে বাধ্য করেছে, মানুষের ছবি তোলা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদের বোরখা, পুরুষদের ইসলামী বিধিসম্মত পোশাক পরতে বলেছে। নারীদের তারা ঘরমুখী হতে বলেছে, পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক কেউ গায়ে দিতে পারবে না। নামাযের সময় হলে প্রত্যেক যানবাহনের চালককে মসজিদের কাছে গাড়ী থামাতে নির্দেশ দিয়েছে, যানবাহন থেকে তালেবানরা সব ধরনের গানের ক্যাসেট সরিয়ে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ওয়াজ, সূরার ক্যাসেট ব্যবহারে চালকদের বাধ্য করেছে, মদ, গাঁজা, আফিম উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তালেবানরা। মোট কথা তালেবানরা সর্বপ্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ তুলেছে যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা নারী শিক্ষা সম্পর্কে বলেছে যে, ইসলাম নারীদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে তাই আমরা তার বিরুদ্ধে কোন আইন করতে পারি না। তারা নারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়ার পক্ষে কথা বলেছে আর নারীদের স্কুল বন্ধ করে দেবার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে যখন ইসলামী ধাঁচের

পাঠ্য পুস্তক তৈরি হবে তখন আবার তাদের (নারীদের) স্কুলে পাঠানো হবে। যত দিন না তাদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় গড়ে তোলা যায় ততদিন নারীরা স্কুলে যাবে না। তাও সহ শিক্ষা তালেবানরা গ্রহণ করবে না। চাকরির ক্ষেত্রেও তারা আলাদা কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নারীদের কাজে যেতে দেবে। আর এতো দিন ঐ নারীরা বাড়ি বসেই বেতন পাবেন। আর নজিবুল্লার বিচার না করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে বলে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারা বলেছে, নজিবুল্লার বিচার ইসলামী আদালতে হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আর দাড়ি নিয়ে তারা বলেছে দাড়ি হলো কাউকে মুসলিম চেনার উপায় এছাড়া পোশাকের ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য একই।

ইসলামী আইন মানতে হবে তাই তাঁর আগেই ১০ লাখ মানুষ অধ্যুষিত কাবুলের আড়াই লাখ বেদ্বীন মানুষ পালিয়ে গেছে। অধিকাংশ আফগান তালেবানদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে। আর তাদের কঠোর আইনে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণসহ অন্যসব অন্যায় কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে আরো বেশি আফগানী তাদের সমর্থন দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তালেবানরা ৬ সদস্যের অন্তবর্তীকালীন পরিষদ গঠন করছে। সাবেক সরকারের দু'একজন সদস্য তালেবানদের স্বীকৃতি না দেবার জন্য বিশ্বের সব দেশকে বলেছে। ওদিকে তালেবানরা বিশ্বের স্বীকৃতি চেয়েছে। এবং সব দলকে আলোচনায় বসতে বলেছে। ওদিকে আহমেদ শাহ মাসুদ তার সৈন্যদের একত্রিত করেছেন। কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ তালেবানরা যে এলাকা দখল করেছে সেখানেই তারা তাদের ক্ষমতা সুসংহত করেছে এবং ভালো প্রশাসন উপহার দেবার মাধ্যমে তারা জনগণের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে। জনগণ চায় শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি, যা তালেবানরা তাদের দিচ্ছে এবং দিয়েছে।

ইরান তালেবানদের ক্ষমতা দখলকে ভালোভাবে নেয়নি কারণ তারা চাচ্ছিল আফগানে তাদের মতো শিয়া নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পাক, সুন্নীদের নেতৃত্বে নয়। রাব্বানী শিয়া সমর্থক বলে ইরানের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বেশি। আর ভারত তালেবানদের ক্ষমতা দখলকে নিন্দা করেছে কারণ এখন এ সরকার কাশ্মীরীদের সাহায্য করবে। কাশ্মীরে যোদ্ধাও পাঠাতে পারে। যার মাধ্যমে কাশ্মীরের স্বাধীনতা দ্রুত বাস্তবায়ন হবে। যা ভারতের জন্য খুবই খারাপ খবর। কাশ্মীরের এক পুলিশ কর্মকর্তা সে আশংকাই করেছেন। ওদিকে রাশিয়াসহ অন্য সব মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশ তালেবানদের উত্থানে হতচকিত হয়ে পড়েছে। কারণ এখন এ তালেবান সরকার ঐসব দেশের ইসলামপন্থীদের সাহায্য করবে। যেমন তাজাকিস্তান। এখন রুশ তাবেদার সরকার হটাও আন্দোলন করেছে ইসলামপন্থীরা। যদি তা হয় তবে এসব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাবুল দখলের পর লুটপাটের ঘটনা ঘটার কথা ছিল কিন্তু তালেবানদের দৃঢ় নেতৃত্বে তা ঘটেনি। তাই জনগণ তাদের ভালোভাবে স্বাগত জানিয়েছে। তালেবানরা রাব্বানী সরকারকে কয়েকটি শর্তে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে তালেবানরা দোস্তামকে রাব্বানীকেসহ অন্য সব মুজাহিদ দলকে। তালেবানরা আফগানে ব্যাপক ভিত্তিক সরকার চায় বলেইতো মনে হয়। যা হোক সবাই মিলে এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করুক তাদের মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে তা পরিত্যাগ করে।

তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তারা পাকের তৈরি চর। এটাকে তালেবানদের ভুল প্রমাণিত করতে হবে সবার কাছে। দেশের স্বার্থে সবাইকে বিদেশের প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে। তারা সবাই একটি আলাদা ইসলামী ব্লক গঠনে কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করুক এটাই সবার সময়ের দাবি। তালেবান যাতে সব দেশের ছাত্রদলগুলো, মডেল হিসেবে নেয় সে জন্য তাদের পাপমুক্ত, পরিচ্ছন্ন সমাজ উপহার দিতে হবে। তবে আমরা বলতে পারি আফগানে ইসলামী শক্তির বিজয় সুচিত হয়েছে। তা যুগ যুগ বেঁচে থাকুক এটাই আমরা সবাই চাই।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ প্রাবন্ধিক ইমরান আহমেদের লেখার উদ্ধৃতি

আফগানিস্তানে তালেবান অভ্যুদয়

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আফগাস্তিানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, উত্তরে উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন এবং পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান অবস্থিত। পামীর মালভূমি করিডোরের ঠিক উত্তরে। ওয়াকহনের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তান চিত্রল ও গিলগিট এলাকা।

তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান এই তিনটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে তাজিকিস্তান আফগান সীমানা দীর্ঘতম, এর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। চীন আফগান সীমানা অতিঅল্প প্রায় একশত কিলোমিটার। পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছু কিছু উপত্যকা ছাড়া অধিকাংশ অঞ্চল অসমতল পাহাড়ী।

হিন্দুকুশ পর্বতের শাখা প্রশাখা আফগানিস্তানের প্রায় সর্বত্র ছাড়িয়ে রয়েছে।

আকসাস বা আমুদরিয়া নদী আফগানিস্তানের উত্তর সীমানা কিছুটা অংশ নির্দেশ করছে। আফগানিস্তানের অন্যান্য নদীগুলোর মধ্যে আছে হেলমান, ফারারুদ, ফরিরুদ, কূনার, লোগার ইত্যাদি।

আফগানিস্তানের ৭৫% ভূমিই হলো পাহাড়ী এবং মরুভূমি। ১৩% এলাকা আবাদযোগ্য। দেশের ১০% স্থান তৃণভূমি, যাতে কোটি কোটি ছাগল, ভেড়া প্রতিপালিত হয়।

নগরাঞ্চল ঃ রাজধানী কাবুল ব্যতীত আফগানিস্তানের প্রধান শহর চারটি। এগুলো হলোঃ ১. জালালাবাদ, ২. কান্দাহার, ৩. হেরাত এবং ৪. মাজার-ই শরীফ। আফগানিস্তানের দু'টি প্রধান শহর জালালাবাদ এবং কাবুল পেশোয়ারের নিকটবর্তী। কাবুল ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত জালালাবাদ। বোলান পাশ গিরিপথ হয়ে পাকিস্তান হতে কান্দাহারে যেতে হয়। খাইবার পাশ গিরিপথ দিয়ে যেতে হয় জালালাবাদ হয়ে কাবুলে।

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা শহরের নিকটবর্তী শহর হলো আফগানিস্তানের স্পিন বূলডাক এবং কান্দাহার স্পিন বূলডাক কোয়েটা এবং কান্দাহারের মাঝামাঝি। হেরাতের উত্তর-পশ্চিমে ইরানে অবস্থিত বিখ্যাত মাশাদ শহর।

আফগানিস্তানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ইরানের নিকটবর্তী শহর হলো হেরাত। আফগানিস্তানের উত্তরাংশে অর্থাৎ উজবেকিস্তানের নিকটবর্তী বলখ প্রদেশের শহর মাজার-ই শরীফ হলো এখন বলখ প্রদেশের রাজধানী।

কাবুল থেকে বিমান পথে অনেকটা সমান দূরত্বে অবস্থিত দক্ষিণে কান্দাহার এবং পশ্চিমে হেরাত। উত্তরে সালং টানেল দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে মাজার ই শরীফ যেতে হয়। পথের ডান পাশেই পূর্ব দিকে আছে পাঞ্চশির উপত্যকা। পাঞ্চশির অধিবাসীরা মূলত তাজিক গোত্রভুক্ত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্বতের পেট কেন্টে তৈরি হয় সলাং ট্যানেল বা সালাং পাশ। এ ট্যানেলের মুখ কাবুল হতে ১২০ কিলোমিটার।

জনসংখ্যা ঃ আফগানিস্তানের আয়তন ২ লক্ষ ৫২ হাজার বর্গমাইল। আয়তনের দিক দিয়ে দেশটি বাংলাদেশ হতে ৫ গুণ বড় কিন্তু অধিকাংশ এলাকা বিশেষ করে উত্তরের এলাকা পর্বতময়। আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৬ লক্ষ (১৯৯৫ খৃঃ)। ১৯৭৯ সনে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। তখন জনসংখ্যার সম্প্রদায় বা গোত্রগত সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ ১. পুশতন (৭০ লক্ষ), ২. তাজিক (৩৫ লক্ষ), ৩. হাজারা (৮ লক্ষ(, এবং ৪. উজবেক (১৩ লক্ষ)। এছাড়া রয়েছে আরো ৬টি গোত্র, ৫. আইমাক (৮লক্ষ), ৬. পার্সিয়ান (৬ লক্ষ), ৭. তুর্কমেন (৩ লক্ষ), ৮. ব্রাহুই (২ লক্ষ), ৯. বালূচী (১ লক্ষ), এবং ১০. নূরস্তানী (১ লক্ষ)।

আফগানিস্তানে গ্রামের সংখ্যা ১৮ হাজার। এগুলো সাধারণতঃ দেশের উর্বর এলাকায় অবস্থিত। জনসংখ্যার ৯০% পল্লীবাসী। নাগরিক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই রাজধানী কাবুলে বাস করে।

আফগানিস্তানের অধিবাসীদের ৬০% হলো পুশতুন। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের পাঠানগণ গোড়া সুন্নী। তাদের সঙ্গে ইরানের শিয়াদের বেশ কিছু মতপার্থক্য আছে। শিয়া নেতা আব্দুল আলী মাজারী তালেবানদের হাতে নিহত হন।

পুশতুনরা লেখাপড়া করতে যায় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর), পাকিস্তান এবং ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় বা ফিরিঙ্গি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে। শিয়ারা আকৃষ্ট হয় ইরানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে।

প্রদেশসমূহ ঃ আফগানিস্তান ৩২টি প্রদেশে বিভক্ত। প্রদেশগুলো হলো ১. কাবুল, ২. কান্দাহার, ৩. হেরাত, ৪. বালখ (রাজধানী মাজার-ই-শরীফ), ৫. গজনী, ৬. ঘোর, ৭. বাদাখশান, ৮. কুনার (রাজধানী আশাদাবাদ), ৯. নানগ্রাহার (জালালাবাদ), ১০. কাপিসা, ১১. পারওয়ান, ১২. লাঘমান, ১৩. বাঘলান, ১৪. টাকহার, ১৫. কন্দুজ, ১৬. সামানগান, ১৭. যাউজযান, ১৮. ফারিয়াব, ১৯. বাদঘীস, ২০. ফারাহ, ২১. নিমরোজ, ২২. হেলমান্দ, ২৩. উরুজগান, ২৪. বামিয়ান, ২৫. ওয়ারডাক, ২৬. লোগার, ২৭. পাকতিয়া, ২৮. পাকটিকা, ২৯. জাবল, ৩০. বাদঘিস ইত্যাদি।

৩২টি প্রদেশের মধ্যে ২৬টির নেতৃত্ব তালেবানদের হাতে। ৬টি প্রদেশের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম, এই ৬টি প্রদেশ হলোঃ ১. ফারিয়াব, ২. যাউজযান, ৩. বালখ, ৪. সামানগান, ৫. কনদুজ এবং বাঘলান।

ভাষা ও গোত্র ঃ অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় আফগানিস্তানও এক ভাষাভাষী বা এক গোত্রীয় দেশ নয়। আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পারসী। কাবুল শহরের ভাষার নাম দারি। এটা পারসী ভাষারই একটি উপ ভাষা। জালালাবাদ কান্দাহার অঞ্চলের ভাষা পুশতুন উত্তর-পূর্ব কোণে তাজিকদের ভাষা তাজিক।

উত্তর -পশ্চিম অংশের অধিবাসীরা উজবেক গোত্রভুক্ত। আব্দুর রশিদ দোস্তাম তাদের নেতা। এই অঞ্চলের ভাষায় উজবেক ভাষার প্রভাব বেশি। উজবেক অঞ্চলের প্রধান শহর হলো বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই-শরীফ।

পুশতুনরা বাস করে দেশের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে। কান্দাহার হলো তাদের এলাকার সবচেয়ে বড় শহর। তাদের কাছাকাছি গোত্র হলো বেলুচি, বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী এলাকায় তাদের আবাস। দেশের নেতৃত্ব নিয়ে অতীতে পুশতুন এবং উজবেকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ছিল। অন্যপক্ষে দেশের পূর্বাঞ্চলের তাজিক এবং পুশতুনদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। কোন কোন এলাকায় দেখা যায় পুশতুনরা জমিদার এবং তাজিকেরা কৃষক। কোন কোন এলাকায় দেখা যায় পুশতুনরা যাযাবর এবং সুদী ব্যবসায়ী।

রাজধানী কাবুলের কোন একটি বিশেষ গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। যেমন আছে কান্দাহারে পুশতুনদের, মাজার-ই-শরীফ এ উজবেকদের, বাদখশানে তাজিকদের এবং হেরাতে পার্শিয়ানদের।

হাজারা গোত্র অধিকতর দরিদ্র। তাদের জমি পশতু যাযাবরগণ ক্রয় করে নেয়। কাবুল শহরে সাধারণতঃ নিম্নস্তরের কতকগুলো হাজারা গোত্রের লোকেরাই

বাস করে থাকেন। হাজারা গোত্র বাস করে কাবুলের পশ্চিমে হাজারাজাত অঞ্চলে, উরুজগান, বার্মিয়ান, গৌর প্রদেশে।

সোভিয়েত উজবেকিস্থান এবং তাজিকিস্তান থেকে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত সময়ে হিজরত করে বহু তাজিক এবং উজবেক আফগানিস্তানে গোত্রীয় লোকদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা হিজরত করে এসেছে বলে অধিকতর ইসলামী চেতনাসম্পন্ন মুহাজিরগণ স্থানীয় অধিবাসীগণ থেকে আর্থিকভাবে অধিকতর উন্নত।

তাজিক অঞ্চলের গোত্রীয় নেতা হলেন মুজাহিদ নেতা প্রকৌশলী আহমদ শাহ মাসুদ (জন্ম-১৯৪৭ খৃঃ) এবং রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন রব্বানী। তাজিক ভাষাভাষীগণ প্রশাসনিক চাকরিতে বেশি, পুশতুনগণ সামরিক বাহিনীতে সংখ্যায় অধিক।

পশ্চিমের হেরাত অঞ্চলের ভাষা মূলত পারসী। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই শিয়া মতোভাবাপন্ন। হেরাতের নেতা হলেন ইসমাইল খান। তিনি শিয়া, তবে দলগতভাবে বোরহানুদ্দিন রব্বানীর জমিয়ত-ই ইসলামের সমর্থক।

পুশতুন এবং ফারসীই হলো দেশের প্রায় ৮০% মানুষের ভাষা। অন্যান্য ভাষার লোকেরা পুশতুন অপেক্ষা পারসী ভাল বুঝেন আফগানিস্তানে ভাষাসংখ্যা ২০টির কম নয় উপভাষা (dialect) আরো বেশি। আফগানিস্তানে কখনও Census বা জরীপ হয়নি। তাই বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্যাদি অনুমান নির্ভর মাত্র।

পুশতুন, পারসী এবং তাজিক ও উজবেকী এই চার ভাষার প্রভাব আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্পষ্ট।

মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য ঃ আফগানদের মধ্যে গোত্রীয় অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। ফলে শক্তিশালী রাজার শাসনে বিভিন্ন গোত্র এক রাজ্যভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে একক জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি। আফগানগণ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা ও স্বাতন্ত্রবাদী। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি চেতনা দুর্বল। আফগানিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক কারণে এতই অনুন্নত যে, বছরের কয়েক মাসই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গমনাগমন কষ্টসাধ্য। তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে ওঠেছে।

আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে ত্যাগের প্রবণতা আছে; কিন্তু ঐক্যের প্রবণতা অত্যন্ত দুর্বল। অনৈক্য শুধুমাত্র সুন্নীদের মধ্যে নয়, শিয়া মুজাহিদ আন্দোলগুলোও বিচ্ছিন্ন। শিয়াদের বড় গ্রুপ হলো পাঁচটি, ১. সৈয়দ আলী বেহেস্তীর নেতৃত্বাধীন শুরা দল, ২. শেখ মুহসিন এর নেতৃত্বাধীন হারাকাত-ই-ইসলামী (ইসলামী আন্দোলন), ৩. মুহসিন রেজার নেতৃত্বাধীন

সেফা-ই-পাসদারা, (বিপ্লবী গার্ড), সাজমানুই নাসর (বিজয় সংগঠন) এবং ৫. হিজবুল্লাহ।

জাবহা-ই-নাজাত-ই মিল্লি (ন্যাশলাল লিবারেশন ফ্রন্ট) পার্টির নেতা হলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী। তিনি নকশবন্দী তরীকার পীর। সোভিয়েট সরকার কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের সময় সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী বিদেশে ছিলেন। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার গাদ্দাফী তাঁকে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের মুবাল্লিগ হিসেবে অবদান রাখার ব্যবস্থা করে দেন।

পীর সৈয়দ আহমদ জিলানী নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাহাজ-ই-মিল্লি ইসলামীয়া এর (ইসলামী জাতীয় ফ্রন্ট)। তিনি কাদেরিয়া তরীকার পীর। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরসুরি সৈয়দ হাসান জিলানী (জন্ম ১৯৫৩) অত্যন্ত প্রতিশ্রুতশীল তরুণ নেতা। আফগানিস্তানে কাদেরিয়া তরিকার প্রভাব বেশি। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) (১০৭৭-১১৬৬) এদেশে পীরবাবা নামে খ্যাত।

আব্দুর রাব্বুর রাসূল সাইয়াফের (জন্ম ১৯৪৫) দল হলো ইসলামিক এলায়েন্স অব আফগান মুজাহেদীন (১৯৮১ খৃঃ স্থাপিত)। প্রফেসর সাইয়াফ কমুনিষ্ট অভ্যুত্থানের পর বন্দী হন। তিনি ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দক্ষ অধ্যাপক। ১৯৮০ সনে মুক্তি পেয়ে পেশোয়ার চলে যান।

সবচেয়ে বড় দুটি দল হলো অধ্যাপক বুরহানুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হেজব-ই-ইসলামী (ইসলামী দল)। রুশ দখলের সময় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনজিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্র। তার চেয়ে ৭ বছর বেশি বয়স্ক বুরহানুদ্দিন রাব্বানী একই সময়ে। ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের অধ্যাপক। রব্বানীর প্রভাবিত এলাকা হলো উত্তরের বদখশান, টাকহার, বাকলান এবং পরওয়ান প্রদেশ।

হেজব-ই-ইসলামী দল দুভাগে বিভক্ত। একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ইউনুস খালিস। তিনি বৃদ্ধ। তার বয়স হেকমতিয়ার এর বয়স হতে ৩২ বছর বেশি। হিজব-ই-ইসলামী প্রচারপন্থী দল হিসেবে পরিচিত।

নবী মোহাম্মাদী হারাকাত-ই-ইনকিলাব ই-ইসলামী (ইসলামিক রিভোলিউশনারী আন্দোলন)-এর নেতা। জন্ম ১৯২৪ ইং। এই আন্দোলন লোগার, কাবুল, জাবুল, নিমরোজ এলাকায় শক্তিশালী।

১৯৯৪ সনের অক্টোবর-নভেম্বরে গঠিত তালেবান কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৯৬ কাবুল দখলের পর তালেবানদের যে কেন্দ্রীয় শুরা গঠিত হয় তার সদস্যসংখ্যা হলো ছয়। এ সদস্যারা হলেন ১. হাজী মোহাম্মদ হাসান, কান্দাহার প্রদেশের আমীর, ২. মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক, তালেবান সামরিক বিষয়ক

প্রধান। ৩. মৌলভী গিয়াস উদ্দিন, পারিয়ার প্রদেশের আমীর এবং উজবেক নেতা। ৪. মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল, নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান। ৫. মোল্লা মোহাম্মদ গাউস, পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান। ৬. মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আমীরুল মুমেনীন।

তালেবান শুরার ৬জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন আধ্যাত্মিক নেতা অথবা মোল্লা। ১ জন মৌলভী, ১ জন হাজী। মোল্লাগণ সুফী প্রকৃতির পরহেজগার। মোল্লা ঐ ব্যক্তিদের বলা হয় যিনি আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা প্রিয় মনে করেন। তিনি আমাদের দেশের বুজুর্গদের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

তালেবানদের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড ঃ অনেকগুলো দলের পরিচিতি অপেক্ষা নেতাদের পরিচিতি বেশি। এ ক্ষেত্রে তালিবান হলো ব্যতিক্রম। তাদের নেতৃত্ব প্রচারবিমুখ।

আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানদের উদ্ভব এবং সাফল্য অনেকটা ধূমকেতুর মতো। কারা এই তালেবান? কি তাদের আদর্শ, নীতি, আখলাক আচরণ?

আফাগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ২৭.০৯.১৯৯৬ হতে তালেবান দখলে। যারাই রাজধানী দখল করে থাকেন তাদেরকেই সাধারণত সে দেশের মূল রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে সার বিশ্ব মেনে নিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের বিশ্ব তালেবানদের সে স্বীকৃতি দেয়নি।

কাবুল, কান্দাহার, হেরাত প্রভৃতি প্রাদেশিক শহর ছাড়াও তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পারওয়ান প্রদেশের রাজধানী চারিকা, পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কাপিসায়। দেশের চার ভাগের তিনভাগই এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে।

তালেবান উৎস ঃ তালেব আরবী শব্দ। এর অর্থ জ্ঞান তলবকারী বা ছাত্র। তালেবুল ইলম অর্থ, জ্ঞান তালাশকারী ছাত্র। তালেবান শব্দটি পারসীতেও প্রচলিত। আরবীতে তালেবান অর্থ ২ জন ছাত্র। পারসী ভাষায় তালিবান অর্থ বহু ছাত্র। বহু ছাত্রের আরবী প্রতিশব্দ হলো তালেবুন, তালেবীন ইত্যাদি। মুসলিম শব্দটি আরবী। কিন্তু মুসলমান শব্দটি পার্শি। কুরানিক মাদ্রাসায় তালেবান কোর্স মাত্র ২২ মাসব্যাপী। তালেবানগণ শুরুতে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান এবং আফগানিস্তানের কান্দাহার, হেলমান্দ, পাকটিকা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং রিফিউজি ক্যাম্পে স্থাপিত মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ক্রমশঃ অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের সাথে যোগ দেয়।

পাকিস্তানের মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বেলুচিস্তান এবং তার দলের নাম পাকিস্তান জমিয়াতে ওলামা-ই-ইসলাম।

প্রাথমিক পদক্ষেপ ঃ তালেবানরা সব সময় বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রতি ছিল বীতশ্রদ্ধ। তালেবানদের প্রথম দিকে প্রধান কাজ

ছিল কিছু মোজাহিদদের অপকর্ম প্রতিরোধ। তারা ছিল নারীধর্ষণ, আফিম ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও লুণ্ঠন বিরোধী। মোজাহিদদের কিছু কিছু জুলুম প্রতিরোধ করে তারা সর্বপ্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জন করেন।

১৯৯৪ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে তালেবানরা আফিম ব্যবসা বন্ধ করার উদ্দেশে এই সমস্ত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতাকারী কয়েকটি সীমান্ত চৌকি আক্রমণ করেন এবং আফিম ব্যবসায়ীদেরকে হেস্তন্যস্ত করেন।

বাণিজ্য কাফেলা মুক্তকরণ ঃ ১৯৯৪ খৃস্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তান হতে একটি মালবাহী ট্রাক কনভয় কান্দাহার হয়ে হেরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ কনভয়ের মালিক ছিলেন পাকিস্তানের প্রভাবশালী ব্যবসায়ীবৃন্দ। কান্দাহারের উত্তর দিকে তালেবান পূর্ব মুজাহিদগণ এ কনভয়টি আটক করে। কনভয়ের মালিকগণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কনভয়টি উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

কান্দাহারের সরকারী শাসক ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্নীতিপরায়ণ। তিনি বাণিজ্য কাফেলাকে কোন সাহায্য করতে সমর্থ হননি।

কনভয়ের মালিকগণ অগত্যা কান্দাহারের মাদ্রাসা ছাত্রদের দারস্থ হয়। এ মাদ্রাসাগুলো ছিল জমিয়াতে ইসলাম দলপ্রভাবিত। মাদ্রাসার ২ হাজার ছাত্র কান্দাহারে পৌঁছে বাণিজ্য কনভয়টি মুক্ত করে রাস্তায় চালু করে দেন।

তালেবানগণ আরো খবর পান যে, কান্দাহারের সরকারী শাসক তার হেরেমে হেরাতের দুটি মেয়েকে আটকিয়ে রেখে তাদের শ্লীলতাহানি করছে। তারা মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করে। এতে তাদের শক্তির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের পর তালেবানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারা অস্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী হয়। অর্থ এবং অস্ত্র পেয়ে তাঁরা লুটেরা এবং সন্ত্রাসী না হয়ে আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৪ সনের অক্টোবর নভেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা এবং সনদ বিতরণী উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার পর সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে তালেবান আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তানী সাহায্য ঃ পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল মুজাহেদীন দলের একটিকে সমর্থন না করে অনেকগুলোকেই কিছু কিছু অস্ত্র দেয়া। যাতে তাদের উপর প্রভাব থাকে এবং তাদের বিবাদের সময় মধ্যস্থতা করতে পারা যায়। ইতোপূর্বে কয়েক ডজন মুজাহিদ গ্রুপকে তারা অস্ত্র দিয়েছে।

তালেবানদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা বিচিত্র কিছু নয় এবং এটা ছিল তাদের সরকারী নীতিরই একটি অংশ। আফগানিস্তানের কোন মুজাহিদ গ্রুপকে অর্থ সাহায্য করতে পাকিস্তান সীমান্তের শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।

অনুমান করা হয় যে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাঁদেরকে কিছু কালাশনিকভ রাইফেল, বিভিন্ন ধরনের হালকা অস্ত্র সরবরাহ করে। এ ছাড়া শিক্ষা দেয় যুদ্ধ কৌশল এবং প্রদান করে বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ।

অস্ত্রশস্ত্র ঃ তালেবানগণ কিছু সংখ্যক কালাশনিকভ রাইফেল চীনা বি, এম.আই মিসাইল নিয়ে অক্টোবর ১৯৯৪ সনে তাদের অভিযান শুরু করেন। প্রথম বছর অক্টোবর মাসে (১৯৯৪) তারা কান্দাহার দখল করেন। আর মাত্র দু বছরের মধ্যে তারা কামান, বন্দুক, ট্যাংক এমনকি জঙ্গী বিমান চালনাও শিখেছেন। উপমহাদেশের মিলিটারী একাডেমীগুলোতে বুনিয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অধীনে শিক্ষানবিসি কাল শেষ করতে লেগে যায় চার বছর। তালেবানরা কোন মিলিটারী একাডেমীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাননি। উস্তাদের নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দু'বছরের মধ্যে একটি দেশের ক্ষমতা দখল করা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা।

রব্বানী দোস্তাম হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত্তি গোত্রগত। তালেবানগণ আফগানিস্তানের সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণের দাবিদার। হেকমতিয়ার পুশতুন। মোল্লা ওমর হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত আয়ত্ত করে নিয়েছেন। তিনি নিজেও পুশতুন। তবে আব্দুর রশিদ দোস্তমের এবং বুরহানুদ্দিন রব্বানীর নিজস্ব জাতিগত এলাকায় তালিবান প্রভাব বিস্তার করা অধিকতর কঠিন হতে পারে।

তালেবান ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে কান্দাহারের নিকটবর্তী ছোট শহর দুরাহী আক্রমণ করে দখল নিয়ে নিজস্ব ধর্মীয় প্রশাসন কায়েম করেন। দুরাহী একটি ক্ষুদ্র বাজারের মত শহর বিধায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষ তেমন আমল দেননি। দুরাহী শহরে নৈতিক প্রশাসনের মাধ্যমে তারা অন্যান্য মাদ্রাসা ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নেতৃত্ব ঃ তালেবান বাহিনীর বর্তমান প্রধান হলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং প্রধান সেনাপতি হলেন নূর হাকমল। তালেবানগণ মনে করেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বী (অন্য আর একজন নেতা) সাধারণত ভুল সিদ্ধান্ত নেন না।

তালিবানগণ কমিউনিষ্ট বিরোধী আন্দোলনে তালেবান হিসেবে অংশগ্রহণ করেননি। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হিসাবে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে একটি চোখ হারান এবং খোঁড়া হয়ে যান।

তালেবাগণ যে গোড়া এবং মৌলবাদী ইসলামপন্থী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তালেবানদের মধ্যে গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী নেই। যদিও তালেবানদের অধিকাংশই পুশতুন গোত্রভুক্ত, তাদের মধ্যে সব গোত্রেরই ছাত্র রয়েছে। তালেবানদের মধ্যে আত্মপ্রচারের কোন মোহ নেই। ১৯৯৬ সনে কোন প্রকার পাবলিসিটি ছাড়াই মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তালেবানদের আমীরুল মুমেনীন হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর কোন ছবি কোন পত্র-পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়নি। কোন বিদেশী সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়ে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তথ্যসূত্র ঃ এ, জেড; এম শামসুল আলম

তালেবান আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের প্রাক্কালে আমরা একটি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তা হলো 'তালেবান'। আরবী ভাষায় 'তালেব' অর্থ ছাত্র। ফারসীতেও এরই বহুবচন তালেবান। তালেবান জিহাদ মানে ছাত্র-পরিচালিত আন্দোলন। আফগান জাতি চির স্বাধীন যোদ্ধা জাতি। ইংরেজ রাজত্বকালে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হত না শত চেষ্টা সত্ত্বে তখনও ইংরেজ মহাশক্তি আফগানিস্তানকে পদানত করতে পারেনি। কারণ আফগানরা মজবুতভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাকে। আর অনড় মুসলমানের পরিচয় দেয়। রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুক আফগানিস্তানে চড়াও হওয়ার পরও তারা বশ্যতা স্বীকার করেনি। ইসলামের জিহাদী চেতনা তাদেরকে স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। বহু অর্থ ও স্বার্থ দানের বিনিময়ে কমিউনিস্ট রাশিয়া কতিপয় বশংবদের দ্বারা আফগানিস্তানে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। আর সমাজতন্ত্রের জোয়াল তাদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়। বীর মুজাহিদ আফগান জাতি তা মেনে নেয়নি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তারা তাদের দেশ থেকে লাখ লাখ কমিউনিস্ট সেনা তাড়িয়ে দেয়। দখলদার রুশ সেনাবাহিনী 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' রব তুলে আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যায়। শুরু হয় মুজাহিদ শাসনের নাামে জুলুম অত্যাচারের অন্ধকার যুগ। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুজাহিদদের বিভিন্ন অংশের নেতৃত্ব দেয় আলিমে দীন নয় এমন ব্যক্তিবর্গ। যাদের ইসলামী শাসনের বাস্তব জ্ঞান ছিল না। তারা ইসলামের সার্বিক স্বার্থের উপর স্থান দেয় গোষ্ঠীস্বার্থ ও আঞ্চলিক সরদারীকে। এখানে এসে দোস্তামের মত সমাজবাদী নেতা স্থান করে নেয়। পেছনে তার রুশ আগ্রাসী শক্তি। আর মুখে সে মুসলমান। তার দখলকৃত এলাকায় চালিয়ে যায় স্বৈরশাসন, জোর জুলুমের রাজত্ব। আর তৎকালীন তার প্রতিপক্ষকেও সুযোগ করে দেয় অসহনীয় শাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। চলতে থাকে জুলুমবাজদের অত্যাচার সমান্তরালে জনগণের উপর। পাশবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অনাচার অতিষ্ঠ করে তোলে মহান আফগান জাতিকে। তথাকথিত মুজাহিদ নেতাদের দ্বারা বিশ্বময় কলংকিত হতে থাকে ইসলামের জিহাদ আন্দোলন। এক অস্বস্তিকর পরিবেশ উপহার দেয় মুজাহিদ নেতার। নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে কোন্দল ও হানাহানি জিহাদ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে আফগান জিহাদ আন্দোলনের মূল শক্তি আফগান আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ জনতা সংঘবদ্ধ হন। আর আফগান ছাত্রশক্তি যার বৃহৎ অংশ মাদ্রাসা ছাত্রদের দ্বারা গঠিত, পুনরায় ময়দানে নেমে আসে। তারা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রবর্তনে কৃতকার্য হন। এরূপে ধীরগতিতে অগ্রসর হতে থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। হাতছাড়া হতে থাকে তথাকথিত মুজাহিদ নেতাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকা গড়ে উঠে তালেবানদের দ্বারা গণ সমর্থিত ইসলামী গণপ্রশাসন। দখলে

এসে যায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল রক্তপাত ছাড়াই। লাখ লাখ মানুষ হত্যাকারী নজিবুল্লাহকে যুদ্ধ অপরাধী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয় শরয়ী আদালত। কার্যকর করা হয় তার ও তার সহকারীর মৃত্যুদণ্ড ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে। জনতা উল্লাস প্রকাশ করে আনন্দ মিছিল বের করে। এরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয় জাতীয় বেঈমানদের বিচার। বর্তমানে এরূপ জাতীয় বেঈমানদের মহড়া চলছে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে। আফগানিস্তানের তালেবানদের কৃতিত্ব দেখে ভারত ও রাশিয়া শংকিত। পাছে এ আন্দোলন কাশ্মীরে বা রাশিয়া থেকে সদ্য স্বাধীন অঞ্চলে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশদ্বয়ের জন্য সমস্যা দেখা দেবে বলে তাদের নিশ্চিত ধারণা। অবশ্য এটা নিশ্চিত যেখানে নির্যাতন চলবে সেখানে ইসলামের জিহাদ আন্দোলন ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবেই। এটাই সাচ্চা ইসলামী জিহাদ। সে যাই হোক; সঙ্গত কারণেই কাফির শক্তিগুলো তালেবানদের বিরোধিতা করবে। আর আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদার প্রমাণ দেবে। কাফির নাস্তিক শক্তির বিরোধিতা তালেবান আন্দোলনের বরহক ওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। হক সর্বদাই বাতিলকে আঘাত করে।

তালেবান আন্দোলনের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য হল এটা কাফিরদের প্রবর্তিত রাজনৈতিক কাঠামো অবলম্বনে আরম্ভ করা হয়নি। খালেস ইসলামী বুনিয়াদের উপর এ আন্দোলনের ভিত্তি। এমন কি নাস্তিক রাশিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে যে জিহাদ চলছিল তা পূর্ণ ইসলামী নীতি অবলম্বিত জিহাদ ছিল না। সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনাও ক্রিয়াশীল ছিল। ইসলামী জিহাদ একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে পরিচালিত হয়। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

"লিতাকূনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলয়া" একমাত্র আল্লাহর বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই জিহাদ হয়। এ উদ্দেশ্য একমাত্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই হাসিল হয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে জিহাদ হয় না। জাতিগত পক্ষপাত তথা "আসবিয়্যাহ" হয় যা ইসলামসম্মত নয়। তালেবান আন্দোলন ইসলামী জিহাদের উক্তরূপ খালেস বুনিয়াদের ভিত্তিতে চলছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এখানে বত্যয় ঘটেনি।

আর ইসলামী জিহাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা আমীরুল মুমিনীন এর নির্দেশে পরিচালিত হতে হবে। আর আমীরুল মুমিনীনের একক নেতৃত্বে শুরার পরামর্শে সম্পাদিত হবে। আল্লাহর লাখ লাখ শুকর, এ শর্ত তালেবান আন্দোলনে পুরাপুরি উপস্থিত। আলেম-উলামাদের মাধ্যমে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে একজন আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করে রীতিমত ইসলামী কায়দায় তালেবানদের দ্বারা জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে। আর তাদের দখলে আসা এলাকায় শরীয়তের হুকুম আহকাম বলবৎ করা হয়েছে। তারই বরকতে আফগানিস্তানের

কাবুল রাজধানীসহ তিন চতুর্থাংশ আজ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সময়ের ব্যাপর মাত্র।

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সত্যিকারের ইসলামী বুনিয়াদের উপর বর্তমান বিশ্বে আফগানিস্তানেই ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, আর ফলপ্রসু হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান বিশ্বে কোন মুসলিম দেশে মুসলমানদের নেতৃত্বে কোন আমীরুল মুমিনীনের অস্তিত্ব নেই। অথচ ইসলামী বিধান মতে এক মুহূর্তও আমীরুল মুমিনীনের ইতাআত ও আনুগত্য ছাড়া জীবন যাপনের অবকাশ নেই। খলীফার বায়আত গণ্ডদেশে না থাকলে জাহিলী মউত অনিবার্য হয়ে যায়। এক আমীরুল মুমিনীনের মৃত্যুর পর সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে অন্য আমীরুল মুমিনীন তথা খলিফা নির্বাচিত করা হয়। একজন্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাফনের পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা নির্বাচিত করা হয়। যথাস্থানে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজনে যে কদিন অতিবাহিত হয় তত দিন বিগত খলীফার বায়আতের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয। হযরত ওমরের (রাঃ) শাহাদাতের পর তিনদিন এজন্যই অপেক্ষা করতে হয়। এ প্রয়োজন ব্যতীত বায়আত ব্যতীত কোন মুমিন থাকতে পারে না। এটাই শরীয়তের বিধান। এ দৃষ্টিকোণে তালেবান আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমীরুল মুমেনীন বা খলীফা নির্বাচন করে সমাধা করে দিয়েছে। বীর মুজাহিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উমর মাদ্দাযিল্লুহুল আলীকে আমীরুল মুমিনীন ঘোষণা দিয়েছে। শুরার মাধ্যমে তা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলিম বিশ্বের কর্তব্য হল বিনা বাক্যে নির্বাচিত আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা। আর তার নেতৃত্বে শুরার মাধ্যমে পরিচালিত জিহাদে যোগদান করা । বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন আমীরুল মুমিনীন ঘোষণা দেয়ারও সুযোগ নেই। কারণ একজন আমীরুল মুমিনীনের নাম ঘোষিত হয়ে গেছে। আর বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে। জিহাদ কামিয়াবীর পথে এগোচ্ছে। এখন পিছে ফিরে দেখার বৈধতা নেই। সামনে রয়েছে কাশ্মীরের নির্যাতিত মা-বোন, মজলুম জনতা। যাদেরকে রক্ষা করা কোরআনের নির্দেশ মতে ফরয। (নিসা আঃ ৪ঃ৭৫)

দলভিত্তিক রাজনীতি

জানি না, বিজ্ঞ আলেম সমাজ আমার সাথে একমত হবেন কিনা। প্রচলিত রাজনীতিতে দলভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। এটা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অভিশাপ। যেখানে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ বৈধ করার জন্য একাধিক দল গঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিভাজন বিভক্তিকে আরবীতে 'তাহাযযুব' বলে। যা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আমীরুল মুমিনীনের বিধান

নেই। আমরা অবচেতন অবস্থায় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি। আর পশ্চিমা কাফিরদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলামের আলখেল্লা পরিয়ে বৈধতা দিচ্ছি। আর প্রত্যেক দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করে ইসলামী দল (?) গঠন করেছি ফলে অজান্তে আমীরের বেদআতী পদ্ধতি প্রবর্তন করছি। ভাবছি আমরা আমীরের ইতাআতের দায়িত্ব পালন করছি। এরূপ একাধিক আমীরের প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে সাকীফা বনু মায়েদাই উত্থাপিত হওয়ার পর অগ্রাহ্য হয়ে যায় সাহাবা কেরামের সর্ব সম্মতিক্রমে ইজমায়। শয়তান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের গর্দানে শুধু মিন্না আমীর ওয়া মিনকুম আমীর-এর দ্বৈত ব্যবস্থা নয় তদস্থলে তত ও ততধিক আমীরের শয়তানী ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে বহুধা বিভক্ত করে রেখেছে। আর ওয়া তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআও ওয়ালা তাফাররাকু কুরআনী নির্দেশের বিপরীত চালিত করছে। আমীরুল মুমিনীন আফগানিস্তানের মাওলানা মোঃ উমর কে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বময় মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন। আর শয়তানের চাপিয়ে দেয়া বিভক্তি হতে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পেতে পারেন।

স্মরণীয় যে, আমীরুল মুমিনীনের অবর্তমানে নানা দলে বিভক্ত হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বুখারী শরীফে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাকে আমর ও আলজামাতের পথ আঁকড়ে থাকার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন।

আমি বললাম ঃ মুসলমানদের যদি জামাআত না থাকে, আমীর না থাকে? তিনি (সাঃ) বললেন। তাহলে ওসব দলগুলো হতে আলগা থাকবে। যদি কোন বৃক্ষের মূল কামড়ে ধরেও থাকতে হয়। যতদিন তোমার মৃত্যু না হয় (বুখারী ২ঃ ১০৪৯, অধ্যায়) জামআত না থাকরে কি নির্দেশ।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, জামাআত ও আমীর না থাকলে যাবতীয় দল হতে আলগ অবস্থান নিতে হবে। দলাদলির বিভক্তিতে যোগদান করা যাবে না। তাই বুঝা যায় আমীরুল মুমিনীন না থাকলে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করে কি হবে। যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। দল বিভক্তির পথ ধরা যাবে না। কাজেই প্রচলিত পশ্চিমা ধাঁচের পার্টিবাজি করা যাবে না। বর্তমানে পার্টিবাজির অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা সামনে এনে দিয়েছে তালেবান আন্দোলন।

প্রশ্ন থাকে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে কিরূপে আফগান আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্ব মেনে চলা যাবে? এর উত্তর মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান বিভক্তি কাফির ইংরেজদের সৃষ্টি। বিশ্ব সমরের পর পরাজিত মুসলিম উম্মাহকে নানা আঞ্চলিক জাতীয়তার ব্যানারে বিভক্ত করেছে ইসলামের শত্রুরা। তা চিরদিন মেনে নেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? আপাততঃ শুরা ও আমীরুল মুনিনীনের নির্দেশমত মুসলিম দেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়ে

খেলাফতের ফেডারেশন কায়েম করা যায়। এজন্যে প্রথমে দেশে জিহাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনমত তৈয়ার করে অগ্রসর হতে হবে। তবু বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য স্থাপনের দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। ফেডারেল সরকারের হাতে কি কি ক্ষমতা থাকবে তা শুরার বৈঠকে স্থির করা যাবে। তবে আমীরুল মুমিনীনের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলে ঠটো জগন্নাথ আমীরুল মুমিনীনের কোন ব্যবস্থা ইসলামে নেই। আর এরূপ কেন্দ্রীয় শক্তির অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে ইসলামের শত্রুরা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশ জবর দখল করে রেখেছে।

কোন কোন জামাত মনে করে থাকবে যে, তাদের বিশ্ব আমীর সাহেবের আনুগত্যই হয়তো যথেষ্ট। ভিন্ন আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজন কি? তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ইসলামের আমীরুল মুমিনীন দলগত বা জামাতগত হন না। তিনি হন প্রশাসনিক ক্ষমতার মালিক আমীর। দেশ পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি স্থাপন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ফৌজদারী ও আদালতী কার্য সম্পাদন তথা হদ্দ ও কিসাস বিধানের বাস্তবায়নসহ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। জামাতী আমীর বা দলের প্রধান ব্যক্তির হাতে অনুরূপ এখতিয়ার থাকে না। কাজেই দলগত বা জামাতী আমীরকে সত্যিকারের আমীর বা আমীরুল মুমিনীন বলা যায় না। ফিকহার কিতাবে আমীরুল মুমিনীন বা খলীফার দায়িত্বের ফিরিস্তি বর্ণিত হয়েছে। জামাতী আমীরগণ সে ক্ষমতা প্রয়োগের ধারে কাছেও নেই। এজন্যেই কুফরিস্থানে বসবাসকারী আমীর জিহাদ বিমুখ দল গঠনে ভুল করে যাচ্ছেন। আল্লাহ সবাইকে ভুল পথ হতে বিমুক্ত করুন।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা ছামীরুদ্দীন গাজীপুরীর প্রবন্ধ

তালেবান আন্দোলনের নেপথ্য কথা ও মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের ভাষণ

বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে আফগান জেহাদ এমন এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে যা ইতিহাসের পাতায় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। এই জেহাদের মাধ্যমে গরীব অসহায় আফগানবাসীদের পক্ষে পৃথিবীর সেনা এক পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার বর্বর দখলদারীর অবসানই শুধু সম্ভব হয়নি, নিরস্ত্র মোজাহেদদের সাথে টক্কর দিয়ে লাল সাম্রাজ্যবাদের বিপুল আয়তন সোভিয়েত রাশিয়া তছনছ হয়ে গেছে।

ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী এত বড় একটা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। পেশওয়ারের নিকটবর্তী একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জামে মসজিদের মিম্বর থেকে।

আফগানিস্তানে পরিকল্পিত এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসন জারী হয়েছে। সোভিয়েত লালফৌজ ও স্থানীয় কমিউনিস্টদের বর্বর নির্যাতনে পর্যুদস্ত দ্বীনদার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। এসব দেশত্যাগীদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম উপনীত হয়েছেন পেশওয়ারের নিকটবর্তী দারুল উলূম হাক্কানীয়া মাদরাসায়। এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোহাদ্দেস শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (রাহঃ) তখনও জীবিত, উদ্বাস্তু আফগান আলেমগণের অনেকেই ছিলেন হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের সাগরেদ। তাঁদের মুখে তিনি শুনলেন, কমিউনিস্ট বর্বরতার লোমহর্ষক কিছু কাহিনী। বিশেষতঃ নারী নির্যাতন ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কিছু ঘটনা শ্রবণ করে তিনি দারুণ মর্মাহত হলেন। নির্দেশ দিলেন পরবর্তী জুমার দিনে যেন প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয় মাদরাসার মসজিদ প্রাঙ্গণে। সে জনসমাবেশেই আল্লাহর শের হযরত শায়খুল হাদীস সোভিয়েত পরাশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মোজাহেদ বাহিনী গঠন করতঃ আফগানিস্তানে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। সেদিন থেকেই সূচনা। তারপর জেহাদের এই আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। দীর্ঘ এক যুগব্যাপী প্রলম্বিত জেহাদে প্রায় ষোল লক্ষ মরদে খোদা শহীদ হয়েছেন আফগানিস্তানের মাটিতে। কোন রাষ্ট্র নয়, কোন সংগঠিত সেনাবাহিনী নয়, আধুনিক মারণাস্ত্রের সাথে পরিচিত কোন জনশক্তিও নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ছুটে এসেছে টগবগে তরুণের কাফেলা বস্তুবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর বুকে নতুন করে প্রজ্বলিত ইসলামী জেহাদের নূরানী মশাল লক্ষ্য করে। দূর প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন থেকে শুরু করে আরব আফ্রিকা, ইউরোপ আমেরিকার ঈমানদীপ্ত তরুণেরাও দলে দলে ছুটে এসেছে বিভিন্ন ময়দানে। উল্লেখ্য যে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অধ্যায়নরত বাংলাদেশী তরুণদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও এই জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং এদের মধ্য থেকে অনেকেই শাহাদাতের নজরানা পেশ করে বাংলার মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

দীর্ঘ এক দশকের জেহাদ এবং ষোল লক্ষ প্রাণের নজরানা মুসলিম উম্মাহর একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের নতুন প্রেক্ষাপটই সৃষ্টি করেনি, সোভিয়েত রাশিয়ার বিগত পৌনে এক শতাব্দী কালের নির্যাতিত অবরুদ্ধ ও আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া মুসলমানদের মধ্যে এমন এক জাগরণের সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার তোড়ে মহাশক্তিধর সোভিয়েত রাশিয়া আজ গো-ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত একটি মৃত ঘোড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রধান দুই শত্রুর মধ্যে রাশিয়া জেহাদের ময়দানে যখন পর্যুদস্ত, তখন দ্বিতীয় শয়তান বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে সোয়ার হয় প্রত্যক্ষ জেহাদে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির কাঁধে। রাশিয়ার পলায়নের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠন ও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শয়তানী শক্তির কবল থেকে উদ্ধারকৃত আফগানিস্তানে পূর্ণ ইসলামী খেলাফত কায়েম করার প্রয়োজন ছিল যেখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেখানে 'বড় শয়তান' আমেরিকার প্রকাশ্য প্ররোচনায় শুরু হলো জঘন্য ক্ষমতার লড়াই। এ আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের সুযোগে মোজাহেদদের তাড়ার সামনে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট এজেন্ট এবং নৈরাজ্যবাদী অস্ত্রবাজ শ্রেণীর হাতে সমগ্র আফগান জনগণ জিম্মি হয়ে পড়ে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর বন্দর সর্বত্রই নেমে আসে এক বিভীষিকার কালরাত্রি। ইসলামী জেহাদকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে চিত্রিত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের ইহুদী খৃষ্টানশক্তি এবং ওদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলি বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পরাশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঘোষিত জেহাদের অগ্রসৈনিকরূপে যারা কাজ করেছিলেন, দ্বীনী মাদরাসার সেই ছাত্র-শিক্ষক দখলদার রুশবাহিনীকে সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দেয়ার পরপরই স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসে পঠন পাঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু নৈরাজ্যের দাবানলে ভস্মীভূত জনগণের আহাযারী যখন সকল সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন কান্দাহার এলাকার একটি মাদরাসার চল্লিশ বছর বয়স্ক শিক্ষক মোল্লা মুহাম্মদ ওমর তাঁর কিছু সংখ্যক সহকর্মী এবং ছাত্র সঙ্গে নিয়ে রাজপথে নেমে এলেন। বিবদমান গ্রুপগুলিকে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন যেন অশান্তির পথ ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়। মোল্লা ওমর জেহাদে একটা চোখ হারিয়েছেন। তাঁর প্রধান সহচর একজন যুদ্ধাহত পঙ্গু ব্যক্তি। প্রধান মুখপাত্র মুহাম্মদ এহসান (২৮) সদ্য লেখাপড়া শেষ করেছেন। তবে রাশিয়ার লালফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে তাঁর দুঃসাহসী ভূমিকার কথা অনেকেরই জানা। মোল্লা ওমর এবং তাঁর নিরীহ সঙ্গী সাথীদের এ উদ্যোগ ছিল আফগান জনগণের বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের কথা। তাই অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল জনগণের পক্ষ থেকে। রাস্তায় নামলেন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকগণ, গঠিত হলো জেহাদের নিয়মাবলী অনুসারে 'তালেবান' বিগ্রেড। আবারও চারদিক থেকে এসে জড়ো হলেন আল্লাহর সৈনিকেরা। মামুলী কয়েকটি আক্রমণ প্রতিআক্রমণের পর মুক্ত হয়ে গেল আফগানিস্তানের এককালের রাজধানী শহর কান্দাহার এবং আশপাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। মুক্ত এলাকায় ইসলামী শাসক বা আমীরুল মুমেনীন রূপে নির্বাচিত হলেন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। আলেম, শিক্ষক এবং বিভিন্ন পেশার নির্বাচিত কিছু লোকজন নিয়ে গঠিত হলো

মজলিসে শূরা। মোট একত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত আফগানিস্তানে তালেবানরা প্রথম একটি প্রদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর অন্য প্রদেশের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তালেবান বাহিনীকে আহ্বান করে তাদের এলাকায় নিয়ে গেছে। এভাবেই এখন পর্যন্ত ২৬টি প্রদেশ তালেবানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রাজধানী কাবুল থেকেও বিতাড়িত হয়েছে পরস্পর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পর্যুদস্ত সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

তালেবানরা আফগানিস্তানের বুকে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে তা আধুনিক চিন্তা-চেতনার আলোকে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ইসলামী মৌলবাদে'র আতঙ্কে তটস্থ আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের ইহুদী নাসারা চক্র তালেবানদের নিরস্ত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার পর শেষ পর্যন্ত তালেবান উপদেষ্টা পরিষদের বিশিষ্ট একজন সদস্য পাকিস্তানের মাওলানা সামীউল হকের ভাষায়, এখন ওরা জলাতঙ্কের রোগীর ন্যায় আচরণ করছে। তালেবান প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওরা এখন বিশ্বব্যাপী এমন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে যে, বহির্বিশ্বের মানুষ যেন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, আফগানিস্তানে তালেবানদের নামে জঙ্গলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আমেরিকা তথা ইহুদী-নাসারাদের উচ্ছিষ্টভোগী প্রচার মাধ্যমগুলি একই সুরে কথা বলছে। পাকিস্তান থেকে মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক, আইনজীবী, আলেম এবং বুদ্ধিজীবীগণের সমন্বয়ে গঠিত শতাধিক সদস্যের এক বিরাট প্রতিনিধিদলসহ কান্দাহারে উপনীত হয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে মাওলানা সামীউল হক একথা বলেন। পেশওয়ারের সন্নিকটবর্তী দারুল উলুম হাক্কানীয়ার বর্তমান পরিচালক আফগান জেহাদের প্রথম ঘোষক শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হকের জ্যেষ্ঠপুত্র পাকিস্তান সিনেটের সদস্য মাওলানা সামীউল হক মুসলিম উম্মাহর প্রধান শত্রু আমেরিকাকে লক্ষ্য করে বলেন, তালেবান বিপ্লবের নেতা মোল্লা ওমর একজন গরিব শিক্ষক। চাটাইয়ে বসে তিনি হাদীস পড়ান। যুদ্ধাহত পঙ্গু, এতীম বিধবাদের প্রদত্ত এক টুকরো রুটি সম্বল করে ইনি বর্তমান বিপ্লব সংঘটন করেছেন। অর্থের লোভ বা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এ বিপ্লব লক্ষ্যচ্যুত করা যাবে না। সুতরাং বিরত হও, মধ্য এশিয়া থেকে হাত গুটাও। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার অভিযান আফগানিস্তান থেকেই শুরু হবে।

গত চব্বিশে আগস্ট কান্দাহারে পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিদলের জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে "আমীরুল মুমেনীন" মাওলানা মুহাম্মদ ওমর বলেন, আপনারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদে সক্রিয় সাথী ছিলেন, বর্তমানে নৈরাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাতেও আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। আপনারা জানেন, দুনিয়ার তাবৎ কাফের শক্তি, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের ইহুদী নাসারাদের নিয়ন্ত্রিত

প্রচার মাধ্যমগুলি আমাদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত। ওদের মিথ্যা প্রচারণার কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। ওরা আমাদের জাতশত্রু। আমরা ওদের একটা অভিযোগের জবাব দিতে না দিতেই আরও দশটা অভিযোগ উত্থাপন করে বসবে। ওদের হাতে অচিন্তনীয় শক্তি সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমরাও অসহায় নই। আমাদের জন্য আছে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত। আছে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ঈমানদীপ্ত ভাই-বেরাদর।

কাফের শক্তিগুলি সর্বশক্তি নিয়োগ করে দ্বীনের শক্তিকে নিষ্প্রভ করতে চায়। কখনও অস্ত্রের মাধ্যমে কখনও বা প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যমে, আবার কখনও বা মুসলিম নামধারী কিছু বুদ্ধিজীবীর বিবেক ও ঈমান ক্ষয় করার মাধ্যমে। কিন্তু মরদে মোজাহেদের দৃঢ় সংকল্পের সামনে কোন শয়তানী শক্তিই টিকতে পারে না। ইনশাআল্লাহ তালেবানদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার শক্তিও ওদের হবে না। বিশ্বের সমস্ত ঈমানদার ভাই বোনের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা শয়তানী শক্তির মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হবেন না।

তালেবানরা ক্ষমতা দখলকারী নয়, পূর্ণ খেলাফত প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহর এসব নিবেদিতপ্রাণ বান্দারা স্ব-স্ব কর্মস্থলে ফিরে যাবে। প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়বে কাশ্মীর, চেচনিয়া, আজারবাইজান, বসনিয়া ও ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানদের পাশে। একমাত্র আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নিবন্ধ

তালেবানদের আফগানিস্তান

খোদায়ী প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত গাজী আর রহস্যময় বান্দাদের আবাসভূমি আফগানিস্তানের ইতিহাস এমনই বিস্ময়কর ঘটনায় সজ্জিত যা শুধুমাত্র কর্মী পুরুষদের হাতেই উন্মোচিত হতে পারে। এটি সেসব আত্মসচেতন মানুষের দেশ যারা কখনও দাসত্বের জীবনের সাথে আপোস করেনি, কোন উপনীবেশকে গ্রহণ করে নেয়নি, যাঁরা কোন দিন নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে বিকিয়ে দেয়নি। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে যারা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্চলি গেয়নি কখনো, নিকট অতীতেই সেসব খোদায়ী সৈনিকরা পৃথিবীর ফেরাউন স্বভাব পরাশক্তির উপর মরণাঘাত হেনে আফগান ইতিহাসকে নতুন দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

নিজেদের জেহাদী ধ্বনিতে পর্বৎগাত্রে ফাটল ধরিয়ে দেয় ও মুজাহিদরা আজ অপবাদের করাঘাতে জর্জরিত জ্ঞান করে তারা নাকি আফগানিস্তানকে কিছুই দিতে পারেনি যা তারা আশা করছিল। স্বপ্নভঙ্গের ঐ মুহূর্তে যখন অন্যরা ফায়দা লুটছিল, তখন আরেকবার তারা নিজেদের হিংসা প্রকাশ করছে। এরই প্রেক্ষাপটে

উদ্ভূত তালেবানের নতুন ক্ষমতা শুধু যে, বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে তাই নয়, বরং নিজেদেরকে তারা আফগানিস্তানের সচেতন আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ছেড়েছে। তালেবানের অভ্যুদয় এতই আকস্মিক ও পূর্ণাঙ্গ ছিল যার রহস্যঘনতা আজও উন্মোচিত হয়নি। তাদেরকে জানতে, তাদেরকে চিনতে, তাদেরকে লক্ষ্য করে দেখতে এবং তাদেরকে বুঝবার আগ্রহ এমন যেকোন লোকের অন্তরকে উদ্বেল করে তোলে যারা আফগানিস্তানের কল্যাণ কামনা করে। যারা আফগান জেহাদকে পূর্ণাঙ্গ সফল দেখতে চায়। সুতরাং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান-এর মহাসচিব ও দারুল উলুম হাক্কানিয়া, আকুড়া খটকের অধ্যক্ষ মাওলানা সামীউল হক আমাকে কান্দাহার ও হেরাত সফরের আমন্ত্রণ জানালে আমি একে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করি। কোমরের ব্যথা এবং আফগানিস্তানের অসমতল রাস্তাঘাটের সফর নিরুৎসাহিত করতে থাকলেও আমি আফগান দৃঢ়চিত্ততার ধারণা মনে টেনে এনে উৎসাহিত হয়ে উঠি। মাওলানা সাহেব তাঁর বিরাট ভক্তবাহিনী সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়েন। তাতে তাঁর দলের চার প্রাদেশিক আমীর এবং সওয়াদে আযম আহলে সুন্নত এর নেতা মাওলানা আসফান্দিয়ারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাওলানাদের এই মহান কাফেলায় চার জন সাংবাদিকও ছিলেন। নাওয়ায়ে ওয়াক্তের সুলতান সিকান্দার। এন এন আইর তারেক সামীর, দৈনিক পাকিস্তানের জাহেদ ঝাঙ্গোই এবং আমি ছিলাম। প্রায় আটটি গাড়িতে করে এ বিরাট কাফেলা ২০শে আগস্ট সকাল দশটায় কোয়েটা থেকে চমনের উদ্দেশে যাত্রা করে। এটি পাক আফগান সীমান্তের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগরী গিরিকন্দরে ঘোর পাক খাওয়া ভাল-মন্দ মিলিয়ে একশ কুড়ি কিলোমিটার পথ তিন ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হল। পাকিস্তানী চেকপোস্ট এফ. আই.-এর কর্মকর্তারা যৎ সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করল। মাওলানা সামীউল হকের পাসপোর্ট ভিসার সীলমোহর গোটা কাফেলার সফরের বৈধতা হিসাবে গণ্য করা হল এবং আমরা সবাই তাঁকে ইমাম ধরে আফগানিস্তানে ঢুকে পড়লাম।

কোমান্দানী বওলাক আফগান সীমান্তের প্রথম চেকপোস্ট। পাকিস্তানী ও আফগান চেকপোস্টের মাঝে কান্দাহারের মেয়র ও তালেবান প্রতিনিধিরা আমাদের স্বাগত জানালেন। তাদের সাথে ছিল তাদের নিজেদের গাড়ি। পাকিস্তান থেকে আগত গাড়িগুলো খালি করে আমরা সবাই তালেবানের গাড়িতে চড়ে বসলাম। বওলাক চেকপোস্ট পৌঁছাতেই সচকিত তালেবান জওয়ান পরিচয়পত্র চাইল প্রথম গাড়ির। তার পরে বিনা দ্বিধায় শেকল তুলে দিল। আধুনিক যুগের সমতল সড়কপথ চমন সীমান্তেই শেষ। এখন আমরা যে পাথালী দিঘলী,ভাঙ্গাচুড়া, নদী নালা ও টিলা টঙ্গরে পরিপূর্ণ পথ ধরে এগুচ্ছিলাম, তা প্রায় বাইশ বছর আগে বেশ ভালই ছিল। বেশ প্রশস্ত ও সমতল ছিল।

বওলাকে যে শ্মশ্রুধারী যুবকরা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের কারও সম্পর্কেই কিছু জানা গেল না এরা কারা ছিল। না কোন পরিচয় হল, না কথাবার্তা, না কোন রকম প্রথাগত কোলাকুলি প্রভৃতি। শুধু সালাম দোয়া হল তাদের সাথে। হাত মেলানো আর গাড়িতে বসে রওয়ানা। আমাদের গাড়িটি ছিল শুধু চারজন সাংবাদিকের জন্য নির্দিষ্ট। বওলাক থেকে বেরিয়েই প্রতি দু'এক কিলোমিটার পর পর আমরা দেখতে পেলাম রাস্তার দু'ধারে ভাঙ্গাচুড়া বাড়ি-ঘর ও দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ। আমি আমার পাশে বসা রসিক মেজায ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি? সে পশতু ফার্সি মেলানো উর্দুতে বলল, এটি হল সেই ফটক বা চেকপোস্ট যা বিভিন্ন দল উপদল বানিয়ে রেখেছিল। যাতায়াতকারী গাড়িগুলোকে সেগুলোতে থামিয়ে ফটকের অধিকারী সশস্ত্র দল আরোহীর মান অনুযায়ী কর আদায় করত। যাত্রীদের ঘড়ি, মহিলাদের গহনাপাতি এবং গাড়ির দামী আসবাবপত্র সব ছিনিয়ে নিত ওরা। অধিকাংশ লোক নিজেদের দামী জিনিসপত্র আফগানিস্তানের সর্বশেষ চেকপোস্টে গচ্ছিত রেখে আসত। আমি বওলাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত এ ধরনের ৪৯টি চৌকির চিহ্ন দেখতে পেলাম। পাকিস্তানী কন্সাল জেনারেল জনাব আজীজুর রহমান গুল ও অন্যরা এসব চৌকির কারিন্দাদের যে ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ শোনালেন তা কলমের ভাষায় লেখা সম্ভব নয়। ইসমত মিলিশিয়ার চৌকিগুলো তো এখনও ভয়াবহতার চিহ্ন বয়ে দাঁড়ানো। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, যুবতী মেয়ে আর সুদর্শন বালকদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে। তালেবানরা এসব এলাকা দখল করার সাথে সাথেই সমস্ত চৌকী ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এখন মানবতার মান সম্ভ্রমের এসব বধ্যভূমি বিরান পড়ে আছে। তালেবানরা এ অঞ্চলটি দখল করার পর ইসমত মিলিশিয়ার মনসুর এবং অন্যান্য নরপশুকে বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। তাদেরকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোকে ট্যাঙ্কের উঁচু নলের সাথে লটকে সেগুলোকে কান্দাহার বিমানবন্দরের নিকটবর্তী সড়কে টাঙ্গিয়ে রাখে। এগুলো ছিল সেসব লোকের লাশ যারা শুধু চৌকিতেই নয় সমগ্র কান্দাহারে অত্যাচার উৎপীড়ন আর বর্বরতার তাণ্ডব লীলা চালিয়ে ছিল। চমন ও কান্দাহারের লোকেরা বেশ কিছু দিনধরে বিমানবন্দরে এ শিক্ষণীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। এখন বওলাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত মাত্র দু'টি চৌকি বা চেকপোস্ট। একটি সীমান্তে আরেকটি কান্দাহার শহরের প্রান্তে। কোথাও কোন ট্যাক্স ওসুল করা হয় না; গাড়ি আর গাড়ির আরোহীকে শুধু একবার দেখা হয়।

চমন সীমান্ত পেরিয়ে গাড়ি চলতে লাগল ডান দিকে। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমরা সত্যিই বুঝি একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করলাম। যেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া পড়েনি। যেসব জায়গায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যের আলো পড়েছিল সেখানে ট্রাফিক চলে বা দিকে। গোলামী যুগের এও একটা নিদর্শন।

এটাই অনেক দেশের ঐতিহাসিক পরিচয় হয়ে আছে আজও। সামান্য পর পরই আমাদের সাথে দেখা হতে লাগল পাকিস্তান থেকে আগত ট্রাক। সেগুলোতে আঙ্গুরের পেটি আর মাল্টায় বোঝাই।

তালেবানরা কোথাও কোথাও সড়কের ধারে ইতিমধ্যেই নলকূপ বসিয়ে দিয়েছে। তাতে কৃষি কাজের বিরাট উন্নতি হচ্ছে। অনেক জায়গায় শস্য শ্যামল ফসলের সারি দেখা যাচ্ছে। এসব ক্ষেতে সাধারণতঃ তরমুজ বা গর্মা ও মাল্টার ফসল ধরেছে ইতিমধ্যেই। এ দু'টি ফলই অত্যন্ত সুস্বাদু ও সস্তা সেখানে।

আমাদের মনে তালেবান, তাদের সরকার ব্যবস্থা, তাদের কর্মপন্থা এবং তাদের সরকার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানার আগ্রহ ছিল। আমরা তাই আমাদের ড্রাইভারের উপর ক্রমাগত চানমারি করে চলছিলাম। সেও সাধ্যমত আমাদেরকে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছিল নিঃসঙ্কোচে। সে আমাদের বলল, তালেবান অধিকৃত এলাকায় মর্যাদার পার্থক্য কিংবা পদের কোন বালাই নেই। প্রদেশ পাল হোক আর কোন অফিসের সামান্য কর্মচারী কারো মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। না কোন আড়ম্বর, না প্রটোকল। না সর সর শব্দ, না ভিআই পি কালচার। কথাটা আমাদের কাছে অনেকটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। এটা কেমন করে হতে পারে, গভর্নর, মন্ত্রী-মিনিস্টার, বড় বড় সরকারী আমলা কর্মকর্তা সাধারণ লোকদের মাঝে সাধারণ লোকদেরই মত বসবাস করবে? আমাদের ওখানে তো থানার একজন এস.আই আর তহসীলদারেরও একজন সহকারী থাকে। সহকারী কমিশনার পর্যন্ত নাকে মাছি বসতে দেয় না। যখন খুশী তখনই নিজের অধিকার বলে যেকোন লোকের পিঠ রক্তাক্ত করে দিতে পারে। আমরা নিজেদের মাঝে বললাম, লোকটি গুল মারছে। আসল বিষয়টি কান্দাহার গিয়েই বুঝব। আমি ড্রাইভারকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল, মোল্লা হেদায়েতুল্লাহ। আমি আমাদের গুলবাজ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, হেদায়েতুল্লাহ , তুমি আর কি কর? সে উত্তর দিল, আমি কান্দাহারের ডেপুটি কমিশনার এবং মেয়র। তাঁর কথা শুনে আমরা চোখ ছানাবড়া করে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। আর ডেপুটি কমিশনার ড্রাইবার হেদায়েতুল্লাহ নিবিষ্ট চিত্তে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের গাড়ি যখন কান্দাহারে এসে ঢোকে তখন বেলা পড়ে গেছে, সূর্য তার ঘরে যাবার জন্য পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। দেয়ালের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দেয়াল কোথায়। জায়গায় জায়গায় শুধু আহত,ক্ষত বিক্ষত বুক আর ছিন্ন বস্ত্র কঙ্কাল দাঁড়িয়ে। ছাদগুলো কবেই ভেঙ্গে পড়েছে। সুদৃঢ় পিলারগুলো ভীষণ গোলাবর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ছেদাগুলো বিনিদ্র চোখের মত মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাড়িগুলো তখনও কান্দাহার হেরাত রোডেই ছিল।

এ রাস্তার উভয় পাশে একটি আপদগ্রস্ত নগরীর হতভাগ্য দ্বার প্রাচীর ভাঙ্গাচুড়া দেয়ালগুলোতে অনুতাপের ফলক টাঙ্গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাট-বাজার আর গলি ঘুচি কিন্তু কঠোর প্রাণ আফগানদের জীবন ছিল জাগ্রত। এতে পরিতৃপ্ত, নিশ্চিন্ত জনপদের রূপে লাবণ্য ছিল না সত্য, কিন্তু তারপরেও জীবন শিল্পের উচ্ছলতা অবশ্যই ছিল। অল্প সল্প গাড়ি, সামান্য কিছু মোটর সাইকেল, অনেক বাই সাইকেল এবং অসংখ্য পায়দল লোক ছোট-বড় দোকান, বিনোদন অপেক্ষা বাধ্যবাধকতার বিস্বাদ বেশি। আমাদের ডেপুটি কমিশনার ড্রাইভার বললেন, এই হল কান্দাহার।

আমি ভাবতে লাগলাম, না জানি বুড়ো চোখ এ শহরটির উপর ইতিহাসের মতই নির্মম দৃশ্য দেখে থাকবে। কত শত বিজেতার বর্শাঘাতে না জানি এর বুককে জাঁঝরা করে থাকবে। কান্দাহার আজ অতীত উপাখ্যান থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের নতুন ক্ষত চাটছে। আর্গান্দাব নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমান নগরীটির পত্তন হয়েছিল চতুর্দশ শতকে। তখন থেকেই এটি প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে চলে আসছে। কির্গশ ও নিসবত এর পুরনো নগরীগুলো কান্দাহারের ভেতরে মিশে গেছে। কান্দাহারের বেলায়েত বা প্রদেশটিতে হালমন্দ,তরং আর্গাবান ও আর্গান্দাব নদীর নিম্নাঞ্চল অন্তর্ভূক্ত। এ অঞ্চলটি ঐতিহাসিক দিক থেকে দুর্রানীদের কেন্দ্র ছিল। আমাদেরকে যে প্রাসাদটিতে রাখা হয়েছিল তাকে সম্ভবত বর্তমান আমলের কান্দাহারের সবচাইতে উত্তম আবাস বলা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানে এটি ছিল মধ্যম পর্যায়ের একটি রেস্ট হাউস। একটি বড় হল ঘর, কয়েকটি ছোট বড় কামরা এবং সবার জন্য তিনটি মাত্র বাথরুম। সত্যকথা বলতে গেলে যুদ্ধ জর্জরিত তালেবানের কাছে এর চাইতে অনেক বেশি যাকিছু ছিল, তাহল তাদের ভালবাসা, সীমাহীন নিষ্ঠা এবং কথায় কথায় তাদের হৃদ্যতা। বলা হয়, এ জায়গাটিই এক সময় সর্দার দাউদের বাসস্থান ছিল। তারপর গভর্নর হাউস। কাবুলের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ কান্দাহারে এলে এখানেই অবস্থান করতেন। সমাজতান্ত্রিক আমলের শেষ শাসনকর্তা ডঃ নজিবুল্লাহর জাহাজী সাইজের শেভরলেট গাড়ি ও প্রাসাদের হেমন্তদর্শী লনটিতে আজও বিরাজমান। কাল রঙের ছয় চাকার এ গাড়িটি শুধু নজিবুল্লাহই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও ভাগ্য বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল।

মওলানা সামিউল হক ও সাংবাদিকদের সৌহার্দ্য অধিক বৃদ্ধি পায় এজন্য যে, মওলানা সাহেব কখনো এলমের মহত্ত্ব আর আলেমী ভাবে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে দেননি। তাঁর নিঃশংকোচ ভাব, খোলামেলা আলপচারিতা আমাদের এ সফরকে কখনও ভারি হতে দেয়নি। আর মওলানা সাহেব আমাদের আরামের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। প্রথমে চা, অন্যান্য পানীয় এবং কান্দাহারের সুমিষ্ট ফলের দ্বারা আপ্যায়ন করা হল। তারপরই বিশালদেহী মেযবানদের আগমন শুরু হয়ে

গেল। তালেবান নেতৃত্বের অতি উঁচু পর্যায়ের অধিকারী মওলানা মোহাম্মদ হাসান এলেন যিনি ইতিপূর্বে কান্দাহারের গভর্নর ছিলেন এবং বর্তমানে পাঁচ প্রদেশের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয় গজনী, জাবুল, কান্দাহার বলমন্দ ও আদার্জোগানের গভর্নরগণ তারই আওতায়। তদুপরি উচ্চতর শূরা পরিষদের স্পীকারও বটেন। মওলানা সামীউল হক দলের সবার সাথে মওলানা মোহাম্মদ হাসানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সরল দরবেশ প্রকৃতির এ লোকটির চোখে অসাধারণ দীপ্তি। সংক্ষেপ কথা-বার্তার ভেতর দিয়ে তিনি বললেন, ভায়েরা আমার, আমি অত্যন্ত আনন্দিত, তোমরা পাকিস্তান থেকে আমাদের কথা শুনতে এসেছ। আমরা আর তোমরা দুই নই। আমরা কালও এক ছিলাম, আজও এক এবং ইনশাআল্লাহ আগামীতেও একই থাকব। তোমরা জেহাদেও আমাদের সাথে ছিলে। যেখানে আমাদের রক্ত ঝরেছে, সেখানে তোমাদেরও রক্ত ঝরেছে। আজ আফগানিস্তানে শান্তির প্রয়োজন সংস্কারের প্রয়োজন। আল্লাহর সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যার জন্য জেহাদ করা হয়েছে। তোমরা এখানে যতদিন ইচ্ছা থাক। খোলা মনে ভ্রমণ কর। দেখ। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা কর। তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে তালেবানরা কেমন করে তাদের অধিকৃত প্রদেশগুলোকে শান্তির আশ্রয় বানিয়ে দিয়েছে। পনেরটি প্রদেশ এখন আমাদের অধিকারে। যখন থেকে এখানে তালেবান ইসলামী আন্দোলনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে এ পনেরটি প্রদেশে পনেরটি লোকও নিহত হয়নি। চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, অপহরণ, ছিনতাইর অবসান ঘটেছে। সড়ক ও পথঘাট নিরাপদ। কোন লোক রাতের বেলা যে কোন সময় সোনার চাকা হাওয়ায় ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যাক তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার কেউ নেই। একটা ব্যক্তিগত ঘটনা শোনাই, কিছু দিন আগে আরগান্দা জেলার বনের ভেতর দিয়ে আমার যেতে হচ্ছিল। তাতে কয়েকটি বসতিও ছিল। এশার পর আমি লক্ষ্য করলাম, পাঁচটি মহিলা কোন পুরুষ লোক ছাড়াই এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে যাচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে সেখানেই সেজদায় পড়ে গেলাম। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ নফল পড়লাম। আমি সে জায়গার কথা বলছি যেখানে দিনের বেলায়ও মানুষ পঞ্চাশ ষাট জনের বিরাট কাফেলা ছাড়া চলতে পারত না। যেখানে অপহরণ হত্যা, লুটতরাজ, ব্যাভিচার, গুণ্ডামী, চাঁদাবাজী ও সহিংসতা ছিল সাধারণ ব্যাপার। যেখানে না ছিল কোন আইন, না ছিল শৃংখলা। আসলে এটা আল্লাহর আইনেরই কল্যাণ বলতে হবে যে, এখন আমাদের অধিকৃত পনেরটি প্রদেশের বন-বাদাড়, পাহাড় উপত্যকা, গ্রাম, শহর, রাস্তাঘাট সবই সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটি আমাদের নয়, আল্লাহর বিধানেরই কৃতিত্ব। আজ আমাদের মা-বোনেরা আমাদেরকে দোয়ার উপঢৌকনে ভূষিত করছে যে, তোমরা আমাদেরকে চোখের ঘুম ফিরিয়ে দিয়েছ।

পাশ্চাত্য জগত আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু সেজন্য আমাদের আদৌ কোন পরোয়া নেই। আমরা মানুষের জনপদকে হিংস্র পশুদের পাশবিকতা মুক্ত করে দিয়েছি। কোন মানুষ অবৈধ অস্ত্র রাখতে পারবে না। বিয়ে-শাদী কিংবা কোন আনন্দ-উৎসবে একটি ফায়ারও হতে পারবে না। তোমরা যখন এসেছ, তখন এসব গ্রামও অবশ্যই দেখ। মানুষের সাথে কথা বল। তারা যা কিছু বলে তোমরা সেগুলো নিজের দেশে গিয়ে বল। নিজেদের পত্র-পত্রিকায় লেখ।"

মওলানা মোহাম্মদ হোসেনের কথায় অসাধারণ গতি ছিল। তাঁর প্রতিটি শব্দ ছিল প্রত্যয়দীপ্ত। শান্তি শৃংখলার পুনর্বহাল এবং অপরাধ মুক্ততা নিঃসন্দেহে তালেবানদের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। যেকথা সবাই বলছিল।

মওলানা সামীউল হক যখন তাঁর ভক্ত পরিবেষ্টিত, তখনই এলেন উচ্চতর শূরা পরিষদের সদস্য ও তালেবান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা এহসানুল্লা এহসান। মওলানা সামীউল হকের হাতে চুমো খেলেন এবং কোলাকুলির পর আমাদের সাথে হাত মেলালেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই এলেন হাজী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী। উজ্জ্বল চেহারা, আগুন ঝরা চোখ। রুশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে তিনি একটি পা হারান। মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রেষ্ট হাউসে এলে আমরা কোন সাইরেনের শব্দ শুনতে পাইনি। কোন হৈ হাঙ্গামাও হয়নি। সর সর'র কোন ধাক্কাধাক্কিও না। মাথায় কাল পাগড়ি আর কাঁধে কাল একটি চাদর। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে তাঁর বয়স।

লোকটি কৃত্রিম পায়ের কারণে কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কামরায় ঢুকলে তার আশাপাশে কোন ফ্লাসনকোভধারী রক্ষী ছিল না। সমাবেশের ভেতর থেকে কেউ উঠে বলে দিল, ইনি হলেন হাজী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী, কান্দাহারের গভর্নর এই যা। কান্দাহারের ওয়ালী। গভর্নর মওলানা সামীউল হকের সাথে করমর্দন করলেন, আমাদের সবার সাথেও হাত মেলালেন এবং চুপচাপ বসে পরলেন।

মুহূর্তের জন্য তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৈন্যের কথা ভাবলাম। সহানুভূতি জাগল, হায়রে; প্রাদেশিক গভর্নর! আমার দেশের গভর্নর তথা যেকোন দেশের যেকোন প্রশাসকের ঠাটইতো অন্যরকম বিশাল এলাকা জুড়ে আলীশান প্রাসাদ, শত শত গাড়ির বহর, ইউনিফর্ম পরিহিত সব বাহিনী, হাজার হাজার আমলা-কর্মচারী, ব্যক্তিগত স্টাফ-সদ্য প্রস্তুত হেলিকপ্টার এবং বিশেষ বমান। আর যখন তিনি নিজের প্রশাসনিক কাজে বের হন, তখন তাঁর অগ্রপশ্চাত, ডানে-বায়ে দাঁড়িয়ে যায় দেহরক্ষীরা। এক দিকে, সাইরেনের দিগন্তব্যাপী চিৎকার আমাদের গভর্নরদের সাড়ম্বর পদার্পণের কথা ঘোষণা করতে থাকে। কোটি কোটি টাকার ফাণ্ড তাঁর হাতের মুঠোয়। যে কোন সমাবেশে তাঁর আসন

সবাইকে ছাপিয়ে, ভাবভঙ্গিতেই থাকে দম্ভ-অহংকার। অথচ মোল্লা মোহাম্মদ হাসান তাদের তুলনায় গভর্নরের মাথার কলঙ্ক। আমরা দীর্ঘক্ষণ দেখতে থাকলাম। দেখতে দেখতে আমার সামনে তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত উঁচু হতে লাগল, এমনি উঁচু, আমার পক্ষে তাঁর মুখের দিকে তাকানোই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হতে লাগল, অন্যান্য দেশের বহু গভর্নরকে একসাথ করলেও তাঁর পায়ের তলা পর্যন্ত পৌছাবে না।

আমরা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানীর সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা-বার্তা বলতে লাগলাম। তিনি বললেন, প্রথমে আমি সরকারী কোষাগারের সামান্য একজন কর্মকর্তা ছিলাম। তারপর আমাকে পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারপর এই তো মাস দেড়েক আগে মওলানা মোহাম্মদ হোসাইনের পদোন্নতির পর কান্দাহারের উচ্চতর শূরা পরিষদ আমাকে কান্দাহারের গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি এ দায়িত্বের চাপে এখন হিমশিম খাচ্ছি। আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হল শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করা, যাতে জনগণ শান্তিতে ঘুমাতে পারে সে ব্যবস্থা করা। আল্লাহর মেহেরবানীতে এতে আমরা সফল হয়েছি। আমরা ইসলামী আইন মোতাবেক আদালত প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি। জেলা পর্যায়ের কাজী আদালতকে বলা হয় 'এবতেদায়িয়্যাহ' (প্রাথমিক আদালত)। কেউ প্রাথমিক আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে প্রাদেশিক পর্যায়ের আপীল আদালতে যেতে পারে। তাকে বলা হয় 'মুরাফেয়াহ'। সেখানেও আশ্বস্ত না হলে সুপ্রিম কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে তাকে বলা হয় 'তমীয'। এই তমীয তথা সুপ্রিম আদালতে কোন বাহাস বিতর্ক হয় না। কাউকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হয় না। এ আদালত শুধু রেকর্ড পত্র পুঙ্খনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে। মুরাফেয়াহর রায়ে কোথাও কোন দোষত্রুটি দেখা গেলে তা চিহ্নিত করে পুনর্বিবেচনার জন্য মুরাফেয়ায় ফেরৎ পাঠায়। এখানে যদিও সাধারণ কোন উকীল-ব্যারিস্টারের ব্যবস্থা নেই; বাদী-বিবাদী নিজেরাই কাজীর দরবারে যেতে চাইলে তাতে কোন বাধাও নেই। বিচার বিভাগের এ সমস্ত পর্যায় পার হবার পরই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি বললেন, আমাদের পুলিশ ব্যবস্থাও যথেষ্ট কার্যকর। "কোমান্ডানে আমানিয়্যাহ" অর্থাৎ, থানা যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে। এর ব্যবস্থাপনা তালেবানের হাতে ন্যস্ত। তাদের কোন নির্ধারিত ইউনিফর্ম বা পোশাক না থাকলেও বিশেষ কার্ড রয়েছে। আমাদের তালেবানরা উর্দী পড়তে পছন্দ করে না। আমরা যে সাফল্যের সাথে অস্ত্র ফেরৎ নিতে পেরেছি তার দৃষ্টান্ত বিরল। তালেবানরা পাড়ায় পাড়ায়,গ্রামে গ্রামে গিয়েছে। লোকেরা ইচ্ছা করে অস্ত্র এনে জমা দিয়েছে। কারণ, আমাদের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। হয়তোবা কারো কারো কাছে এখনও অস্ত্র রয়ে গেছে। সেগুলো ফেরৎ নেয়ার জন্য আমাদের গোপন পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা কারও বাড়িতে ঢুকে অস্ত্র নিয়ে আসিনি। গোপন পুলিশ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেলে জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি আমিরুল মু'মেনীনের নোটিশে নিয়ে আসে। আমাদের প্রধান বিচারপতি হলেন মওলানা খলিলুল্লাহ ফিরোজী। আমাদের এখানে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন বেতন নির্ধারিত নেই। তাদের আপন আত্মীয়-স্বজন, ভাই ছেলেপেলে শ্রম-মজুরী খাটে, আর তাতেই নির্বাহ হয়ে যায়। আমীরুল মু'মেনীন যখনই প্রয়োজন মনে করেন, তখন বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগার থেকে ভাতা স্বরূপ কিছু দিয়ে দেন। আমার জন্য তিন চার জন কর্মচারী, একটি অফিস আর একটি গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। মোল্লা মোহাম্মদ হাসান কথা শেষ করলেন।

রাত গভীর হতে যাচ্ছিল। কান্দাহারের চোখ ঘুমে ঢুল ঢুলু। আমার সাংবাদিক বন্ধুরাও উদ্বিগ্নবোধ করছিলেন- কেমন করে খবরগুলো পাঠানো যায় নিজেদের বিভাগে। মওলানা সামীউল হকের বিশেষ সহকারী প্রাণবন্ত যুবক মওলানা ইউসুফ ততক্ষণে আমাদের বিশেষ সহকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, মওলানা সাহেব ততক্ষণে তালেবানদের মধ্য থেকে সহকারীদের এক বিরাট বাহিনী পেয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকজন মন্ত্রী তো ইতিমধ্যেই মওলানা সাহেবের সেবায় নিয়োজিত ছিলেনই। আমরা মওলানা ইউসুফের সাথে কান্দাহার রেডিও স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। তালেবানরা সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আমাদের কয়েকবার নিরীক্ষণ করল। এটি ছিল আট তলা বিশিষ্ট একটি ভবন। কান্দাহার হোটেলের নতুন ব্লক। এখনও নির্মাণ শেষ হতে পারেনি। ভবনটির জায়গায় জায়গায় গোলাগুলির দাগ। প্রায় সবগুলো কক্ষই অনেকটা ভূতগ্রস্তের মত দেখাচ্ছিল। এরই তিনটি কক্ষ ছিল রেডিও কান্দাহারের সাকুল্য সম্পত্তি। এ রেডিওটি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সোয়া তিন ঘণ্টা সজাগ থাকে। সকাল সাতটা থেকে সোয়া আটটা আর সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত। এ সময় সংক্ষিপ্ত সংবাদ বুলেটিন, তেলাওয়াত, তফসীর, হাদীস নিষিদ্ধ। মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক রেডিও কর্তৃপক্ষের ডি. জি। এ রেডিওর সাকুল্য স্টাফ সংখ্যা পচিশ জন। এদের মধ্যে কোন মহিলা নেই। তাছাড়া এ রেডিও থেকে কোন মহিলা কণ্ঠও শোনা যায় না। সুতরাং রাতের প্রথম প্রহরেই রেডিওটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা অবশ্য তখনো দু' তিনটি বাতি জ্বলছিল। মৃতপ্রায়। কর্মকর্তারা জানাল, ফোন যেহেতু নষ্ট হয়ে আছে তাই ফ্যাক্সের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মওলানা সামীউল হক ছোট্ট একটি ফ্যাক্স মেশিন আসার সময় ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ফোন পাওয়া না যাওয়ায় তাতেও প্রাণ ছিল না। আমাদের সাথে তালেবানদের সরকারী নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও রেডিও ভবনে কয়েকজন 'অপরিচিত' লোককে এত রাতে দেখে রেডিওর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকগুলো যথেষ্ট সতর্ক বলে মনে হচ্ছিল। জানা গেল এ ভবনটিতে টেলিভিশন

কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অনুসন্ধিৎসা চাঙ্গা হয়ে উঠল। টি.ভি. স্টুডিও দেখার আগ্রহ বেড়ে গেল। জানা গেল, টি.ভির মেশিনপত্র থাকলেও সদর দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। অনেক দিন ধরে কোন প্রোগ্রামই হচ্ছে না সেখানে।

উপায়ন্তর না দেখে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা খবরের পোটলা হাতে রেস্ট হাউসে ফিরে এল। ততক্ষণে সেখানে উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তাদের আনাগোনা ও ব্যস্থতা বেড়ে গেছে। খাবারের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। মন্ত্রীরা বাসন কোসন বয়ে নিয়ে আসছেন। সরকার প্রধান হাত ধোয়াচ্ছেন। গভর্নর সাহেব তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের ডেপুটি কমিশনার ড্রাইভার ভাতের বড় বড় থালা নিয়ে আসছেন।

এসব দেখে আরেকবার বিস্ময়ের শিশির ঝরতে লাগল। জানা গেল চার সদস্যবিশিষ্ট সাংবাদিক দলের থাকার ব্যবস্থা করেছেন পাকিস্তানের কন্সোলেট জেনারেল। আমাদের রেস্ট হাউস থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে দু'টি সুসজ্জিত আরামদায়ক কক্ষ আমাদের জন্য নির্দ্ধারণ করা হযেছিল। জনাব আজীজুর রহমান গুল কান্দাহারে পাকিস্তানের কন্সাল জেনারেল। সুদর্শন, প্রাণবন্তু, সদাচারী লোক তিনি। তাঁর কর্মচারীরা আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সারা দিনের পরিশ্রমে আমরা সবাই ছিলাম অবসাদগ্রস্থ। কয়েক মুহূর্তেই আমরা সবাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়ে কান্দাহার আর পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে বহু বহু দূরে চলে গেলাম।

জনাব আজিজুর রহমান গুলের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা চলল। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার পুনপ্রতিষ্ঠা, অস্ত্র প্রত্যার্পণ এবং পথঘাটের নিরাপত্তা বিধানে তালেবানদের সফলতার কথা জানালেন। তিনি বললেন, তালিবানপূর্ব প্রশাসনের কঠোরতর স্বেচ্ছাচার মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়েছিল। এমন কি সাধারণ জনগণ তখন নিজেদের ঘরের ভেতরেও নিরাপদ ছিল না। অনৈতিকতা ও সামাজিক অপরাধ আশংকাজনক আকার ধারণ করেছিল। পাশাপাশি অবৈধ ব্যবসায়েরও অবাদ ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ছিল।

আমাদের প্রটোকল কর্মকর্তা মওলানা ইউসুফ শাহ ইতিমধ্যেই গাড়ী নিয়ে চলে এলেন। রেস্ট হাউস তেমনি প্রাণচঞ্চল। মওলানা সামীউল হক মুখ্য মেহ্মান হিসেবে কেন্দ্রীয় আসনে বিরাজমান। উপস্থিত তালেবানরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা মোহাম্মদ হাসান রহমানী, সর্বোচ্চ শূরা পরিষদের সিনিয়র সদস্য এহসানুল্লাহ এহসান, পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ গাওস আখন্দ, পাঁচ প্রদেশের প্রশাসক প্রধান মাওলানা মোহাম্মদ সাহেবের দরবারে এসে হাজির হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে আমরাও ভক্ত

মুরীদানের মতই দেয়াল সংলগ্ন একটি সোফায় বসে পড়লাম। কক্ষের প্রশস্ত মেঝেতে কার্পেট বিছানো ছিল। তাতে মওলানার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা স্থান করে নিয়েছেন আগে থেকেই। এমনি সময় খবর এল, আমীরুল মোমেনীন তশরীফ আনছেন। আমাদের অন্তরে তখন আফগানিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা অধ্যুষিত প্রদেশসমূহের একচ্ছত্র অধিপতির আড়ম্বর ও মহিমা চাড়া দিতে লাগল।

দীর্ঘকাল থেকে আফগানিস্তান উনত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত। কিছুদিন আগে দু'টি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হওয়ায় সে সংখ্যা এখন একত্রিশে পৌছে গেছে। প্রচলিত ২৯ প্রদেশের ১৫টি এখন তালেবানদের অধিকারে। সেগুলো হল কান্দাহার, বালমদে, হেরাত, জাবুল, আওয়ারগান, পাকতিয়া, লোগার, গজনী, ময়নন শহর, খোস্ত, পাক্তিয়া, ফার্হ বদ্গীস, নীমরোয এবং গৌর এসব প্রদেশগুলোতে এখন তালেবানদের কলেমা তাইয়্যেবা খচিত পতাকা উড়ছে। প্রত্যেক প্রদেশের একেক জন গভর্নর রয়েছেন। তারা প্রাদেশিক শূরা পরিষদের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন। গভর্নরের জন্য এখনও ওয়ালী পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। এই পনেরটি প্রদেশের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তিনটি ইউনিটে আ'লা তথা আঞ্চলিক প্রধান। পনের প্রদেশের গভর্নর ও তিন ইউনিট প্রধানরা পদাধিকার বলে উচ্চতর শূরা পরিষদের সদস্য। কান্দাহার হল এই পনের প্রদেশের কেন্দ্রীয় রাজধানী। এখানেই বসেন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং তিন ইউনিটের প্রধানগণ। উচ্চতর শূরা পরিষদ হল ক্ষমতার সর্বোচ্চ উৎস। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর উচ্চতর শূরা পরিষদের প্রধান এবং আমীরুল মুমেনীন। মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের অঙ্গুলি হেলন পাঁচ প্রদেশের শুধু আইন, বিধান বা অর্ডিনান্সই নয়, পুরোপুরি সংবিধান হিসাবে গণ্য।

অধিকার ও শাসন ক্ষমতার এহেন সুউচ্চ মসনদে আসীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দের জাঁকজমক সম্পর্কে চিন্তা করার কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই হল ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন এক মৌম্য-যুবক। সাড়ে ছ'ফুট প্রায় লম্বা, ঘন কাল দাড়ি, মিলিশিয়া রঙের লম্বা কোর্তা, পায়ের গিট ছুঁই ছুঁই শালোয়ার, কাল পাগড়ি, গাঢ় সবুজ রঙের ওয়াচকোট। কাল রঙের বিরাট চাদর কাঁধে, পায়ে এক জোড়া সাধারণ চপ্পল। চালে দৃঢ়তা, ভঙ্গিতে অপরাজেয় পারঙ্গমতার ছাপ। একজন বলে উঠল, আমীরুল মুমেনীন এসে গেছেন। উপস্থিত সবাই তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেছেন। কয়েকজন চৌকশ তরুণ আমীরুল মুমনীনের সাথে। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ মওলানা সামীউল হকের সাথে কোলাকুলি করার পর কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের সাথেও হাত মেলালেন। তারপর মওলানা সামীউল হকের বা পাশে বসে পড়লেন। পনের প্রদেশের একচ্ছত্র অধিপতির আগমনের পূর্বেও কোন গগনবিদারী ধ্বনি উঠল না, প্রটোকলের বাসাড়ম্বর শুরু

হলো না, সড়কে কোন পাহারা বসানো হল না। না সাইরেন বাজল, না যানবাহনের গতি স্তব্ধ হল, নাইবা জীবনযাত্রার কোন হেরফের। ছত্রিশ বর্ষীয় আমীরুল মুমেনীন তাঁর বাসস্থান থেকে এমনিভাবে রেস্ট হাউস পর্যন্ত পৌছলেন যেমন করে অলি গলির সাধারণ মানুষরা কোন মুসাফির খানায় তাদের মেহমানদের সাথে দেখা করতে চলে যায়।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ দীর্ঘ দিন ধরে কান্দাহার ও কোয়েটার ধর্মীয় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। আফগানিস্তানে জেহাদ শুরু হয়ে গেলে মোল্লা ওমর লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক দিন মওলভী মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদীর ইসলামী বিপ্লবের আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন সেক্টরে রুশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকেন। তারপর বুরহান উদ্দীন রব্বানীর সাথে যোগাযোগ হলে জমিয়তে ইসলামীর প্লাটফর্মে থেকে জেহাদে অংশ নেনএবং একজন সাহসী ও নির্ভিক মুজাহিদ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এ জেহাদেই তাঁর ডান চোখটি বিসর্জন দেন। তারপর এক সময় মুজাহেদীন নেতাদের পারস্পরিক টানা পেড়েনে যুব শ্রেণীর মুজাহেদদের স্বপ্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিজের মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন যারা আফগান জেহাদকে ফলপ্রসু দেখার প্রত্যাশী ছিল। সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদীয়মান এ শক্তি সম্পর্কে নানা রকম মতামত রয়েছে। অনেকে এদেরকে স্বয়ং পরিচালিত বলে ধারণা করে আবার অনেকে বলে এদের সঠিক পরিচর্যা হয়েছে এবং এখনও এদের পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে। তালেবানের সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাকুক, বর্তমানে এরা আফগানিস্তানের এমন এক শক্তি যাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া এ শক্তির প্রেরণা আমাদের সামনেই বিরাজমান ছিল। মোল্লা ওমর যেমনি স্বপ্লভাষী তেমনি স্বপ্ন মিশুক। অধিক মেলামেশা কিংবা লম্বা আলাপ আলোচনা তাঁর স্বভাব নয়। আমরাও তেমনি শুনে আসছিলাম, তাঁর সাথে আদৌ দেখা হয় কি না! আবার এক সময় গুজব রটিয়ে দেয়া হয়, মওলানা সামীউল হক তাঁর দু' একজন সঙ্গী সাথী ও সাংবাদিকদের নিয়ে আমীরুল মুমেনীনের সাথে দেখা করতে যাবেন। আবার জানা গেল, না মোল্লা ওমর নিজেই আসবেন মওলানা সামীউল হকের সাথে সাক্ষাত করতে। আল্লাহর এই রহস্যময় বান্দাকে এতটা কাছে থেকে দেখে আমাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তো বেড়ে যাবার কথাই ছিল স্বয়ং তালেবানদের চেহারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মওলানা সামীউল হক হামদ সানা (আল্লাহর প্রশংসা ও নবীজীর প্রতি দরূদ পাঠ করার) পর বললেন, আমাদের মনে আপনাদের দেখার অদম্য বাসনা ছিল। আমি আমার সাথী ওলামায়ে কেরাম এবং পাকিস্তানের নামকরা সাংবাদিকদের এই সংক্ষিপ্ত টীম আপনাদের এ দেশটি দেখতে এসেছি। আপনারা যে সংগ্রাম

করেছেন তার কোন তুলনা নেই। আপনাদের ত্যাগ, আপনাদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ স্বর্ণযুগের মুসলমানদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আফগান জেহাদের সাফল্যের পর মুসলিম উম্মাহ এর ফলাফলের অপেক্ষা করছে। জেহাদের সফলতার কাম্য ছিল আফগানিস্তানে একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগান জনগণের ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আওতায় নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু আফসোস! পনের লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের পরেও সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আমার অন্তর এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে রক্তের অশ্রু বর্ষণ করছিল। দারুল উলুম হাক্কানিয়া আফগান জেহাদে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। এ দারুল উলুমই প্রথম সারির মুজাহেদ কমান্ডার ও নেতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের ছাত্ররা এ জেহাদকে নিজের বুকের রক্তে সিক্ত করেছে। এখনও আমার সামনে অনেকগুলো মুখ রয়েছে যারা দারুল উলুম হাক্কানিয়া থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। স্বয়ং কান্দাহারের বর্তমান গভর্নর মোল্লা মোহাম্মদ রহমানী দারুল উলুম হাক্কানিয়ারই ছাত্র ছিলেন। জেহাদ ও মুজাহিদদের সাথে আমাদের বন্ধন অত্যন্ত নিবিড়। আকুড়া খটকের দারুল উলুম হাক্কানিয়াকে বলা হয় আফগান জেহাদের ঘাঁটি। রুশদের পরাজয়ের পর নেতৃবর্গের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও আহত হচ্ছে। আমাদের স্বপ্নও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও এসব বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেছি। মিঞা নওয়াজ শরীফের আমলে ইসলামাবাদে মুজাহেদীন নেতাদের মাঝে যে সমঝোতা হয় তাতে এ অধমেরও ভূমিকা ছিল। রাত আড়াইটার সময় আফগান মুজাহেদদের এসব নেতা যখন কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আমিও তাদের সাথে ছিলাম। সেখানে বাদশা ফাহাদের উপস্থিতিতে ইসলাম ও আফগানিস্তানের জন্য পারস্পরিক ঐকবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন সমঝোতা, কোন অঙ্গীকারই গৃহযুদ্ধের দুয়ার বন্ধ করতে পারেনি। তারপর আমরা এমনও খবর পাচ্ছি, আফগানিস্তানের বিভিন্নস্থানে কম্যুনিস্টদের কিছু কিছু তল্পিবাহক এবং বিক্ষিপ্ত জঙ্গী দল আজও অরাজকতা বিস্তার করছে। সাধারণ নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এমনি পরিস্থিতিতে তালেবানরা নতুন এক উদ্দীপনা এবং নতুন প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে এলে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করি। আমাদের সাহস বেড়ে যায়। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, আজ আফগানিস্তানের বৃহত্তর অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের সফর এখনও অনেক দীর্ঘ। আপনাদের লক্ষ্য অনেক দূরে। আপনাদেরকে সমগ্র আফগানিস্তানে শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করতে এখনও অনেক ত্যাগ-কুরবানী দিতে হবে। বর্তমান এ যুগটি হল মিডিয়ার (প্রচার মাধ্যমের) যুগ। আপনাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগত তাদের এ মিডিয়া অস্ত্র

ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। আপনাদেরকে পাশ্চাত্য অপপ্রচারের কঠোর জবাব দিতে হবে। মহিলাদেরকে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হবে। আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আপনাদেরকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমার অন্তরের কামনা, তালেবানরা যেন গৃহযুদ্ধের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়। তারা যেন জ্বলন্ত আগুন নেভাতে পারে। আমি কাবুলে অবস্থিত রাব্বানী, সাইয়্যাফ, হেকমতিয়ার ও আহমদ মাসুদের প্রতি আবেদন জানাই, তাঁর যেন তালেবানদেরকে শত্রু মনে না করেন। এঁরা তো তাঁদেরই সন্তান। কাল অবধি তাঁরা তো তাঁদেরই নির্দেশে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। একইভাবে আমি তালেবানদেরকেও বলব, তাদের লক্ষ্য রাব্বানী, হেকমতিয়ার ও আহমদ শাহ মাসুদ নন। বন্দুকের যেসব গুলি ইসলামের শত্রুদের জন্য তৈরি হয়েছে। তা যেন পরস্পরের বুককে ভেদ না করে। উদ্দেশ্য যদি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য যদি আফগানিস্তানের পুনর্নির্মান হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য যদি সত্যিকারের একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, তাহলে পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিবেশকে শেষ করতে হবে। আমি আপনাদের সামনে হাত জোড় করে বলছি, পারস্পরিক বিরোধ অবসানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করুন। আমি প্রয়োজন বোধে কাবুলে গিয়ে রাব্বানী হেকমতিয়ারদেরও পায়ে ধরব যাতে তারা নিজেদের তোপ কামানের নলকে শীতল হতে দেন। পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে আপনাদের সাথি ছিল। আর আজ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু-কিশোর আপনাদের গৃহযুদ্ধের জন্য দুঃখিত। আল্লাহ আপনাদের সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে আফগান জেহাদের প্রকৃত ফসল আফগান জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মওলানা সামীউল হকের এ ছিল এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ। ফাঁকে ফাঁকে মওলানার পশতু ভাষণের উর্দু তরজমাও করা হতে থাকে। মওলানা সাহেবের পর সওয়াদে আযম আহলে সুন্নত জামাতের সাধারণ সম্পাদক মওলানা ইসফান্দিয়ার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সবার সমৃদ্ধি কামনা করেন।

মওলানা সামীউল হকের ভাষণের পর আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দকে তাঁর ভাষণ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি নিজের আসনে বসে বসেই নিতান্ত ধার-গম্ভীর কিন্তু অত্যন্ত প্রত্যয়পূর্ণ, প্রভাবপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমার দ্বীনী ভায়েরা! আমি আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আপনারা, দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে এখানে পদার্পণ করেছেন। আপনারা জেহাদের প্রথম দিন থেকেই আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের জেহাদে পাকিস্তানী ভাইয়েরা বিশেষ করে আলেম সমাজের সহযোগিতার কথা আমরা কেমন করে ভুলতে পারি? আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার সবই বলতে গেলে

আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতারই সুফল আমরা রাশিয়াকে পরাজিত করেছি। আপনারা আমাদেরকে অস্ত্র দিয়েছেন। আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। আপনাদের এই আচরণ আমাদের পরবর্তী বংশধররাও মনে রাখবে। আজ আপনারা আমাদেরকে এই আচরণ আমাদের বাড়িতে তাশরীফ এনেছেন। আমাদের চরম নিঃস্বতার দরুন আমরা আপনাদের যোগ্য আথিতেয়তা পর্যন্ত করতে পারছি না। ভাইয়েরা আমার! আপনারা জানেন, আমাদের জেহাদ এখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আমরা যেসব এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছি তাতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। সারা বিশ্বের কাফের ও বেদ্বীন রাজনীতিক আর অপশক্তিগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রোগাগাণ্ডায় লিপ্ত রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে তাদের মিশন ও অভিযান অভ্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা না পারছি দেশে দেশে দূত পাঠাতে, না আমাদের কাছে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে মিথ্যা প্রচারণার উত্তর দিতে পারি। পাশ্চাত্যের হাতে বিরাট বিরাট উপায় উপকরণ রয়েছে। সমস্ত বাতিল শক্তি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানেই ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টা চলবে, পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, তার বিরুদ্ধে জোর প্রোপাগাণ্ডা চালাবে। আমরা কতজনের মুখ বন্ধ করব? কতজনের জবাব দেব? রাশিয়া এককথা বলছে তো আমেরিকা আরেক কথা বলছে। আমরা একজনের জবাব দিলে অন্যজন দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং আমরা সাধ্যমত উত্তর অবশ্যই দেব। আল্লাহ ছাড়া কারও কোন পরোয়া আমরা করি না। মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হলে চলবে না। কারণ, ইসলাম বলে, মুর্খরা উল্টোসিধা কথা বলতে শুরু করলে সালাম দিয়ে কেটে পড়বে। সমস্ত অপশক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে পৃথিবীর কোথাও মহানবীর শরীয়ত প্রবর্তিত হতে না পারে। আর আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর অপপ্রচারের জঞ্জালে না জড়িয়ে আল্লাহর দ্বীন জারি করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। আমরা জানি, এ পথ বড় কঠিন পথ। আমরা পৃথিবীর রাজনীতিতে জড়িয়ে একে আরও বেশি কঠিন করতে চাই না। আমাদের উত্তর হল আমাদের কর্ম। কাজের মাধ্যমে উত্তর দেয়া মৌখিক উত্তর অপেক্ষা উত্তম। আমাদের কাজ সবার সামনে। যার ইচ্ছা এখানে এসে দেখে যেতে পারে। তা মুসলমান হোক কি অমুসলমান। আমরা আপনাদের কাছ থেকে সে সহযোগিতাই কামনা করি, সে পৃষ্ঠপোষকতাই কামনা করি যা আপনারা আফগান জেহাদের সময় থেকে করে আসছেন। শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকটি মুসলমানেরই কর্তব্য। আপনারা অতীতেও আমাদের ব্যথা উপলব্ধি করেছেন, আজও অনুভব করছেন। আমাদেরকে সাহায্য করুন, আমাদের সাথে থাকুন। আল্লাহ আপনাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে কল্যাণ দান করুন।"

এটি একজন শাসনকর্তার ভাষণ ছিল না যা ব্যুরোক্রেটসরা তৈরি করে থাকে। যাকে পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে ওজনদার ও বিশ্বাসযোগ্য বানানো হয়।

যার খুঁটিনাটি চোখা করার জন্য কলা-কুশলী নিয়োগ করা হয়। এ ছিল একজন পবিত্র ও নির্মল প্রাণ মানুষের অন্তরনিঃসৃত সরল সহজ আবেদন। কানের জন্য হালকা-পাতলা, অন্তরের জন্য প্রভাতী বায়ু, মনের জন্য চিন্তার খোরাক। আমি সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, তালেবানপ্রধান তাঁর প্রতিপক্ষের ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। প্রফেসার বোরহানুদ্দীন রাব্বানী, গুলবুদ্দীন হিকমতিয়ার, আহমদ শাহ মাসুদ, রসূল সাইয়াফ এবং কাবুল সরকারের কোন একজন প্রতিনিধিরও কোন সমালোচনার কোন নামগন্ধও নেই। হয়তো অল্প কথায় অনেক বেশি বক্ত মোল্লা ওমরের। কিন্তু তাঁর তুনে প্রতিপক্ষের জন্য কোন তীর ছিলই না। আমাদেরকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল, আমীরুল মু'মেনীনের সাথে কোন প্রশ্নোত্তর হবে না। কিছুক্ষণ পর মোল্লা ওমর দোয়া করার জন্য হাত তুললেন এবং সেভাবেই বিদায় নিলেন যেভাবে এসেছিলেন। না চলল টেপরেকর্ডার, না ফুটল ক্যামেরার ফুলঝুরি, না-ই হল টিভির জন্য চিত্রায়িত। সহজ সরল সাদামাটা বৈঠক নিতান্তই স্বল্প কারের ছিল কিন্তু এর সৌরভ ছিল দীর্ঘ মেয়াদী।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল আহমদ শাহ আবদালীর মাজারে। আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন আফগান ইতিহাসের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর মজার যুদ্ধ বিভীষিকার পরেও পরিপূর্ণ জৌলুসের সাথে সমাহিত ব্যক্তিত্বের মহিমা ঘোষণা করছিল। অতীত মহত্ত্বের উপাখ্যান শোনাচ্ছিল।

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় ইরানের সাফতী সম্রাজ্যের পতন শুরু হলে আফগানিস্তানের উপরও তার প্রভাব শিথিল হয়ে পড়ে। ইরানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গটি কান্দাহারেই জ্বলে উঠে। প্রথম মীর ওয়ায়েস নামক এক হুতকী নেতা ১৮০৮ সালে ইরানী গভর্নরকে হত্যা করে প্রদেশটিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। মীর ওয়ায়েসের পুত্র মাহমুদ নিকের ক্ষমতার বাইরে পা বাড়াতে চেষ্টা করলে শুধু তারই ক্ষমতা দুর্বল হয়নি, বরং যারা আফগানিস্তান জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃংখলা পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরই মধ্যে একাধিক যুদ্ধবাজ আফগান নিজেদের ভাগ্য রচনার প্রয়াস চালায়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সফলতা আসে শুধু আফগান গোত্রের নাদের শাহের ভাগে। পরে তিনি একের পর এক আঘাত হেনে ১৭৩০ সালে আফগানিস্তানকে ইরানের অধিকার থেকে মুক্ত করে নেন। দেখতে দেখতে নাদের শাহের শাসন কান্দাহার, হেরাত ও কাবুল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৭৩৯ সালে নাদের শাহের পা দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৭৪৭ সালে নাদের শাহ নিজেরই সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনানায়কের হাতে নিহত হন। তাঁর সেনাবাহিনীর আফগান সৈনিকরা নূর মোহাম্মদ গুলজাই ও আহমদ খান আবদালীর নেতৃত্বে সেনানিবাস থেকে ফিরে চলে আসে। তখন এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য কান্দাহারে আফগান সর্দারদের

কবিলা জিরগা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমাগত আট দিনের দীর্ঘ বাহাস-বিতর্কের পর নবীন যুবক আহমদ খান দূররানীকে সর্বসম্মতিক্রমে আফগানিস্তানের বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। এ যুবকই ইতিহাসে আহমদ শাহ আবদালী নামে খ্যাতি লাভ করেন। ইনিই ১৭৬১ সালে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদেরকে পরাজিত করে মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনর্বহাল করে কান্দাহারে ফিরে আসেন। আহমদ শাহ আবদালীর অসমসাসী মাতা যারগুনা আন্নাকেই ইতিহাসে একজন মহিয়সী মহিলা হিসাবে স্মরণ করা হয়। তিনি নিজের সন্তানদের ব্যাপারে এতই গর্বিতা ছিলেন যে, কান্দাহারে মারাঠাদের হাতে আহমদ শাহ আবদালীর মার খাবার গুজব ছড়িয়ে পড়লে যরগুনা আন্না বলে উঠলেন অসম্ভব। আমার পুত্র মরে যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের মাঠে পশ্চাদপদ হতে পারে না। আফগানরা আহমদ শাহকে জাতির পিতা এবং 'আহমদ শাহ বাবা' নামে স্মরণ করে থাকে।

আহমদ শাহ আবদালীর মাযার নিঃসন্দেহে তার মর্যাদা অনুযায়ী বিরাট আয়তনের সুউচ্চ, সুরম্য ও কারুকার্যে সুশোভিত আড়ম্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মুসলিম সভ্যতা ও নির্মাণ শিল্পের এক অপূর্ব কীর্তি। মাযারের দেয়ালে নাসতা'লীফ অক্ষরে বহু ফার্সী শে'র ক্ষোদাই করা হয়েছে।

আহমদ শাহ আবদালীর মাযারের পাশেই রয়েছে জাহের শাহর আমলের এক মহাপ্রাসাদ। এর ভেতরে সুরক্ষিত রয়েছে মহানবী (সাঃ)-এর সে পবিত্র খেরকাহ যেটি তিনি হযরত ওয়ায়েস করণীকে দান করেছিলেন। ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী এ খেরকাহটি কয়েক মাধ্যম ঘুরে বাগদাদ থেকে বলখ, তারপর বদখশান প্রদেশের জুযগানে স্থানান্তরিত হয়। আহমদ শাহ আবদালী ১১০৯ খৃষ্টাব্দে বিপুল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভরে এই খেরকাহ মোবারক জুযগান থেকে কান্দাহারে নিয়ে আসেন। এ খেরাকাহ মোবারক একের পর এক করে তিনটি তালাবদ্ধ সিন্দুকে বন্ধ থাকে। বাদশাহ জাহের শাহর আমলে খেরকাহ মোবারকের জন্য এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় এবং সেটি মসজিদ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। মহানবী (সাঃ)-এর এ খেরকাহ সম্পর্কে মিঞা ফকীরুল্লাহ শিকারপুরীর লেখায় বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কান্দাহারে তালেবানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর মোল্লা ওমর আখন্দ উচ্চতর শূরা পরিষদের অনুমতিক্রমে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে সে সিন্দুকটি খোলেন এবং খেরকাহ মোবারকের যেয়ারত করেন। কান্দাহারের লোকেরা দীর্ঘ সত্তর বছর পর এ সৌভাগ্য লাভে গৌরবান্বিত হয়। নফল ও জোহর নামায আদায় করার সময় অধিকাংশ লোকের চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। মাওলানা সামীউল হকের চোখে মুখে এমনি পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা যাচ্ছিল যেমনটি বিশাল যুদ্ধ বিজয়ের পর সাধারণত পরিলক্ষিত হয়।

মাওলানা হাজী মোহাম্মদ গওস আখন্দ একাধিক জেহাদী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি তালেবান ইসলামী আন্দোলনের উচ্চতর নীতি নির্ধারকমণ্ডলীর সদস্য। আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মওলানা হাজী মোহাম্মদ গওস আখন্দকে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। তিনি তথাকথিত কূটনীতির ভাষা জানেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সহজ সরল, সত্য কথাই তিনি বলতে পারেন। তার সাথে আমাদের যেসব কথাবার্তা হয় তাতে তালেবান আন্দোলন ও তাদের চিন্তা চেতনার বেশ কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এগুলো তালেবানের দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্নঃ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রধান, তালেবানদের আন্দোলন হঠাৎ করেই শুরু হল এবং দেখতে দেখতেই আফগানিস্তানের দুই তৃতীয়াংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলল প্রকৃতপক্ষে আপনারদেরকে সংগঠিত কে করল?

উত্তরঃ তালেবানরা আফগানিস্তানে অপরিচিত ভুইফোঁড় কোন গোষ্ঠি নয়। তারাই তো আফগান জেহাদে লড়েছে এবং নিজেদের অভুতপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে রুশদেরকে পরাজিত করে। আমরা সবাই এ মাটিরই সন্তান। আমরা মুজাহিদ এবং মুজাহেদেরই সন্তান। আমাদের সবাই কোন না কোন মুজাহিদ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি নিজে হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী (ইসলামী বিপ্লবের আন্দোলন)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। মওলভী মোহাম্মদ ইউনুস খালেসের নেতৃত্বাধীন হেযবে ইসলামীর সাথেও ছিলাম। এসব জেহাদী সংগঠনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। জেহাদের পর আমাদের যুবশ্রেণীর মনে এমন ধারণা জন্ম নিতে লাগল যে, আমাদের নেতৃবর্গ জনগণের কুরবানীকে নষ্ট করে দিলেন। আট-ন' বছর ধরে দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদাপদ ভোগ করা লোকদের জন্য বিপদের এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা আর অশান্তি বাড়তেই থাকল। তখন আমরা পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগলাম। এবং নিজেদের পৃথক পথ বেছে নেয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। এ পর্যায়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখন্দ এগিয়ে এলেন। বিভিন্ন সংগঠনের যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদেরকে সংগঠিত করলেন এবং একই প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করালেন।

প্রশ্নঃ আপনারা নিতান্ত দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেছেন; এর প্রশিক্ষণ কে দিল? ব্যবস্থা করল কারা?

উত্তর ঃ আমরা তো চৌদ্দ বছর রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি; আমাদের আর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনই ছিল কি?

প্রশ্ন ঃ আপনাদের হাতে এ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এলো কোথেকে?

উত্তর ঃ অস্ত্রশস্ত্রও আমাদের কাছে পূর্ব থেকেই মজুদ রয়েছে। আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কমাণ্ডার ছিলেন। তাদের আওতায় সবরকম অস্ত্রশস্ত্রই ছিল। এই

আমাকেই ধরুন না, এক হাজার ক্লাশমকোব আমারই কন্ট্রোলে ছিল। আমার সংগঠনের কাছে ছিল সাতাশটি বিমান, আটটি ট্যাঙ্ক, বেশ কয়েকটি এন্টি ইয়ারক্রাফট গানস, রকেট ও স্টিঙ্গার মিসাইল। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কারো কাছে হাত পাতার প্রয়োজন আগেও ছিল না, এখনও নেই।

প্রশ্ন ঃ কোন বহির্দেশীয় প্রতিনিধি এখানে সফর করেছেন কি?

উত্তর ঃ তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠার পর বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি এখানে এসেছেন। তাদের মধ্যে পাকিস্তান, ইরান, তুর্কি, সউদী আরব, তুর্কমেনিস্তান, আমেরিকা, জার্মানী, সংযুক্ত আরব আমিরাত, রাশিয়া, মুতামারে আলমে ইসলাম, জাতিসংঘ ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নঃ এরা কোন কোন প্রদেশ সফর করেছেন?

উত্তর ঃ বেশির ভাগ কান্দাহারেই থাকেন। আবার অনেকে হেরাত এবং গজনীতেও যান।

প্রশ্ন ঃ এসব প্রতিনিধি কোন পর্যায়ের ছিলেন?

উত্তর ঃ এরা মন্ত্রী কিংবা উপরের পর্যায়ের লোক ছিলেন না। তবে মাঝামাঝি পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও দূত পর্যায়ের প্রতিনিধি ছিলেন।

প্রশ্নঃ সর্বাপেক্ষা বেশি সফর কোন দেশের প্রতিনিধিরা করেছেন?

উত্তর ঃ সবচেয়ে বেশি সফর করেন পাকিস্তান ও ইরান ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দেশ, যাদের সাথে আমাদের সীমান্ত মেলানো। এ দু'টি দেশের প্রতিনিধিরাই এখানে বেশি আসেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কাছ থেকে ইরানের আশা ভরসা কতখানি?

উত্তর ঃ ইরানের আশঙ্কা, হয়তো আমরা আইএস আইর কিংবা অন্য কারও ইঙ্গিতে তাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। এ আশঙ্কার ভিত্তিতেই রাশিয়া, ইরান ও ভারত আমাদের বিরুদ্ধে একটি ব্লক তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ পরিস্কার। আমরা ইরানসহ সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতীম ইসলামী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কামনা করি। আমাদের পক্ষ থেকে এমন কোন কিছু ঘটবে না যাতে ইরানের কষ্ট হতে পারে।

প্রশ্নঃ বর্তমানে আফগানিস্তানে কয়েকটি সমপর্যায়ের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পাকিস্তানকে আপনারা কোন ব্লকের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আপনারা ভাল করেই জানেন, পাকিস্তান কোন ব্লকে রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়, গত মাসে ভারত ও পাকিস্তানে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা এখানকার সফর করে গেছেন। আসলেও কি তাই?

উত্তর ঃ এখানে কোন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আসেননি। বহুদিন আগে আমেরিকার একজন ২য় সেক্রেটারী এসেছিলেন।

প্রশ্নঃ আমেরিকার সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?

উত্তর ঃ আমেরিকা মুসলমানদের বন্ধু নয়। কিন্তু মুসলমান কখনও অকারণে কারও শত্রু হয় না। আমরা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের সাথেই সুসম্পর্ক কামনা করি। তবে শর্ত হল কোন দেশই আমাদের মতবাদের উপর কোন আক্রমণ চালাবে না। আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকার সাথেও সুসম্পর্ক কামনা করি।

প্রশ্নঃ আপনারাও কি কোন বাইরের দেশ সফর করেছেন?

উত্তর ঃ জী-হ্যাঁ, আমি নিজেই তুর্কি, সউদী আরব, আমেরিকা ও জার্মানী সফর করেছি।

প্রশ্ন ঃ এসব সফরের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর ঃ এসব দেশে প্রচুর সংখ্যক আফগান লোক বসাবাস করে। একটি উদ্দেশ্য তো ছিল তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সেসব দেশের সরকারকে তালেবানদের সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা যাতে আমাদের বিরুদ্ধে চালানো নেতিবাচক অপপ্রচারণার প্রতিক্রিয়ার অবসান হতে পারে।

প্রশ্নঃ কার আমন্ত্রণে আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ পনের কুড়ি বছর যাবৎ সেদেশে বসবাসকারী আফগানদের আমন্ত্রণে।

প্রশ্ন ঃ দায়িত্বশীল কোন মার্কিন কর্মকর্তার সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কোন কোন নেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাদেরকে তালেবান প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহিত করেছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে যেসব প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেগুলো যে নিতান্তই ভিত্তিহীন আমি তাদেরকে সে কথা বলেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার জার্মানী সফরের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল?

উত্তর ঃ এ কাহিনী কিছুটা দীর্ঘ। আসলে একজন জার্মান উপদেষ্টা এখানে আসেন এবং তালেবানদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের অবস্থা জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের একটি লোককে সাথে নিয়ে কয়েকদিন ধরে এদিক সেদিককার জনপদগুলোতে ঘোরাফেরা করেন। একদিন আমার সাথে তার দেখা হলে বলেন, আমিতো জার্মানী এবং ইসলামাবাদে নানা রকম কথাবার্তা শুনেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, তালেবানরা দাড়ি ছাড়া লোককে নাকি সহ্যই করতে পারে না। কারও চুল লম্বা দেখলে ধরে ধরে কেটে দেয়। সাধারণ ভুল ভ্রান্তির জন্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে গর্দান উড়িয়ে দেয়। কোন মহিলা ঘর থেকে বেরুতেই পারে না। কিন্তু এসে তো আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখছি। না আছে কোন বিশৃঙ্খলা, না চুরি ডাকাতি। এত দিনেও নাকি এখানে একটি

অপরাধও সংঘটিত হয়নি। অথচ জার্মানিতে অপরাধপ্রবণতার অবসানকল্পে আধুনিকতম ব্যবস্থা এবং কার্যকর হাতিয়ার প্রয়োগ এবং পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও মুহূর্তেই চুরি-ডাকাতি হয়েই যায়, হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। মনে হয় যেন বন্য আইন প্রচলিত। আপনি আমাদের দেশে আসুন, আমাদের কর্মকর্তাদের বলুন, কেমন করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানিতে এক লক্ষেরও অধিক আফগান বসবাস করছে।

আমি জার্মান উপদেষ্টার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নেই এবং আমার তিনজন দায়িত্বশীল সাথীসহ জার্মানি সফর করি। সেখানকার কর্মকর্তারা অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে আমাদের স্বাগত জানান। প্রথমে আমরা সেখানকার আফগান ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তালেবান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। আমি বিশ্লেষণ করলে তাদের সংশয়ের অবসান ঘটে। আমাদের আগে রাব্বানীর কিছু প্রতিনিধিও সেখানে গিয়েছিলেন। তারা আমাদের ব্যাপারে কিছু ক্যাসেটও নাকি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। জার্মান টেলিভিশন উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করে। এটি অত্যন্ত সফল সফর ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তো ক্যামেরায় ছবি তোলার বিরুদ্ধে। তাহলে টিভির জন্য ভিডিও ফিল্ম বৈধ হবে কেমন করে?

উত্তর ঃ পরামর্শ পরিষদ টিভির মাধ্যমে বার্তা প্রচারের বিরোধী নয়। টেলিভিশনের তুলনা হল একটি ছুরির মত। এতে আপনি আলু পেঁয়াজ, ফল-ফলারিও কাটতে পারেন, আবার কারো গলাও কাটতে পারেন।

প্রশ্নঃ বর্তমানে কোন কোন ইসলামী দেশ আপনাদের সাহায্য সহায়তা করছে?

উত্তর ঃ সমগ্র ইসলামী বিশ্ব এবং বহির্বিশ্বও প্রকাশ্যভাবে আমাদের নৈতিক সাহায্য করছে। সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বীনদার নাগরিকবৃন্দ আমাদের সাথে রয়েছেন। কারণ, তারা সবাই আফগানিস্তানে দাঙ্গা-ফাসাদ ও অশান্তির অবসান কামনা করেন।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়, উসামা বিন্ লাদেন ইদানিং এখানে অবস্থান করছেন। কথাটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ আমরাও তাই শুনেছি যে, তিনি এখন আফগানিস্তানে আছেন। তবে তিনি তালেবান অধিকৃত এলাকায় নেই। হয়তো কাবুলে থাকতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আপনারা পাকিস্তানকে বলছেন না কেন যাতে তারা রব্বানী সরকারের সাথে একটা মিটমাট করে দেয়?

উত্তর ঃ আমাদের কারও সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কাজেই ব্যক্তিগত মিটমাটেরও প্রয়োজন নেই। আমরা তো বিরাট এক লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছি। জেহাদের রূহ অনুযায়ী আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রব্বানী এবং তার মিত্ররা আমাদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেছেন। দু'টি দল যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়, তখন মিটমাট আর আলোচনার কথা যারা বলে তাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। অবশ্য পাকিস্তান এবং অন্যান্য বন্ধুদের কারও কথার অপেক্ষা না করে নিজ দায়িত্বে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ এমন কোন প্রয়াস চালানো হলে আপনারা বিরোধিতা করবেন না তো?

উত্তর ঃ আমরা এ ধরনের প্রয়াসকে স্বাগত জানাব।

প্রশ্ন ঃ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আপনারা এখনো পৃথিবীর প্রতি আবেদন জানাননি কেন?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে কয়েকটি দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু আমরা সে আবেদন জানাব না। তাতে আফগানিস্তানের বিভক্তির পথ সুগম হয়ে যাবে। আর আমরা তা কখনও হতে দেব না আমরা ক্ষমতার লোভী নই।

প্রশ্ন ঃ কোন বহিঃশক্তি যদি কাবুল আক্রমণ করে রব্বানী সরকারকে শেষ করে দিতে চায় তাহলে আপনারা এমন শক্তির সমর্থন করবেন কি?

উত্তর ঃ কক্ষনো নয়। কাবুল রব্বানী, দোস্তাম কিংবা হেকমতিয়ারের নয়; আমাদের সবার। আফগানিস্তান আমাদের সবার। যদি এ ধরনের কোন বহিঃশক্তি কাবুল আক্রমণ করে বসে, তাহলে আমরা রব্বানী ও হেকমতিয়ারের সাথে মিলেমিশে তাদের মোকাবেলা করব।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কা করেন কি?

উত্তর ঃ ইরানী সীমান্তের দিক থেকে আমাদের আশঙ্কা থাকে। ইতিমধ্যে দু' একটা চেষ্টাও হয়েছে। যাহোক, আমরা পুরোপুরি সতর্কও বটে। আমরা নিজেরা আগ্রাসন চালাব না, কিন্তু আগ্রাসনের দাঁতভাঙ্গা জবাব অবশ্যই দেব।

প্রশ্ন ঃ রব্বানীর সাথে দ্বন্দ্বের অবসানের কি উপায়?

উত্তর ঃ উপায় আর কি, সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে ফায়সালা করে নিলেই হল। তালেবান দুই তৃতীয়াংশের দখলে আছে। গোটা আফগান জাতি তাদের সাথে রয়েছে। মানুষ তালেবানকে ভালবাসে। যদি জাতির এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে পাঁচ পাঁচ শ' মুরব্বী একত্রিত করা হোক। এভাবে পনের হাজারের এক বিরাট শক্তি সংহত হয়ে যাবে। তারা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কাবুল নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবেন। তারপর সমস্ত দল উপদল এই গ্র্যান্ড শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন সর্বসম্মত ফর্মূলা নির্ণয় করতে পরে যাতে সুদৃঢ় ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মোহাম্মদ জহীরুল হকের তর্জমাকৃত নিবন্ধ।

আলেকজান্ডার থেকে তালেবান

হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই আফগানিস্তান বীর পদচারণার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। বিশ্বের প্রাচীন প্রায় সকল সভ্যতাই ছিল কৃষি ভিত্তিক। নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই সাধারণত সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী রাজ্য গড়ে উঠত। নীল নদ স্নাত মিসর উপত্যকা, ফোরাত তীরের ব্যবিলন, সিন্ধু গংগা অববাহিকার সম্পদরাজি দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষদের প্রলুব্ধ করত। ভারত উপমহাদেশ ছিল প্রাচীনকালের ভূস্বর্গ। এখানকার সম্পদের লোভে দূর-দূরান্তের বীর পুরুষেরা আকর্ষিত হত। সুদূর পশ্চিম থেকে স্থল পথে যারা এসেছিলেন তাঁদেরকে আফগানিস্তান অতিক্রম করেই ভারতে প্রবেশ করতে হয়েছে।

আফগানিস্তানের বহু রাজা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পারস্য রাজা দারিয়াস (খৃঃপূঃ ৫০০)-এর সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহামতি আলেকজান্ডারের (খৃঃ পূঃ ৩৩১-৩২৩) বহু স্মৃতি আফগান জনমনে এখনও বিরাজমান। সম্রাট অশোক (খৃঃ পূঃ ২৫০), সম্রাট কনিস্ক (খৃঃ পূঃ ৫০) আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন।

গজনীর সুলতান মাহমুদ। (৯৭১-১০৩০ খৃঃ) ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। দিগ্বিজয়ী মঙ্গোল বীর চেংঙ্গিস খান। (১১৬৭-১২২৭ খৃঃ), তাঁর বংশধর তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৪ খৃঃ) বার বার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করেছে। কাবুল সুলতান শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী ত্বরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খৃঃ) পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খৃঃ) কাবুল ও হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশ থেকেই ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তুর্কী বংশোদ্ভুত নাদির কুলি বেগের জন্ম খোরাসানে (১৬৮৮-১৭৪৭)। তিনি পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস তৃতীয়কে অপসারণ করে নাদির শাহ নাম ধারণ করে পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৩৬)। সমগ্র কান্দাহার নিজ রাজ্যভুক্ত করে ১৭৩৯ সালে দিল্লী জয় করেন। আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী (১৭২৭-১৭৭৩ খৃঃ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) মারাঠাদেরকে পরাজিত করে ভারত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে আফগানিস্তানের বড় রাজা ছিলেন সর্দার পায়েন্দা খানের পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮৩৪-১৮৬৩ খৃঃ) তাঁর প্রপৌত্র হাবিবুল্লাহ খান (১৯০১-১৯১৯ খৃঃ) মোটামুটি খ্যাতিসম্পন্ন আমীর ছিলেন। হাবিবুল্লাহ খানের পুত্র আমীর আমানুল্লাহ (১৯১১-১৯২৯ খৃঃ) কামাল আতাতুর্কের অনুসরণে আফগানিস্তানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে রাজ্যচ্যুত হন।

ইসলামের নাম ভাংগিয়ে এক দস্যু সর্দার বাচ্ছাই সাবেকো অল্প কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তাঁর আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাকে অপসারণ করে সর্দার পায়েন্দা খানের এক অধঃস্তন বংশধর নাদির শাহ (১৯২৩-১৯৩৩ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নাদির শাহের পুত্র জহির শাহ ১৯৩৩ হতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর আফগানিস্তানের বাদশাহ ছিলেন। ১৭ জুলাই ১৯৭৩ জহির শাহের পিতৃব্য জেনারেল দাউদ খান একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাদশাহ জহির শাহকে অপসারণ করে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল দাউদ খান আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। দাউদ খান কমিউনিস্টদের প্রতি নমনীয় এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারই প্রশ্রয়ে কমিউনিস্টরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে।

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী জেনারেল দাউদ খানকে অপসারণ করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল দাউদ খান সপরিবারে নিহত হন। জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

নূর মোহাম্মদ তারাকীর সমর্থক কমিউনিস্টদের ২টি গ্রুপ ছিলঃ (১) সোভিয়েত ঘেঁষা পারচাম পার্টি এবং (২) চীন ঘেঁষা খাল্‌ক পার্টি। পারচাম পার্টি আদর্শগতভাবে অধিকতর কমিউনিস্ট এবং খাল্‌ক পার্টি ছিল কিছুটা জাতীয়তাবাদী।

প্রায় দেড় বছরের মাথায় ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর উপ-প্রধানমন্ত্রী হাফিজ উল্লাহ আমিন জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকীকে অপসারণ করে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফসল তিনি ৩ মাসের বেশী ভোগ করতে পারেননি।

সেনাবাহিনীতে দাউদ খানের আমল থেকেই সোভিয়েত সমর্থকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পারচাম পন্থী সেনা কর্মকর্তারা মনে করেন, হাফিজ উল্লাহ আমিনের নীতি ছিল মার্কিন ঘেঁষা।

সোভিয়েত পন্থী পারচাম পার্টির সমর্থনপুষ্ট বাবরাক কারমাল হাফিজ উল্লাহ আমিনকে অপসারণ করে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন।

বাবরাক কারমাল (১৯৭৯-১৯৮৬ খৃঃ) সোভিয়েত রাশিয়ার অনুগ্রহপুষ্ট এজেন্ট হিসেবেই সাত বছর বিরাজ করেন এবং তারই আহবানে বা সমর্থনে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে নূর মোহাম্মদ তারাকীর আমলে আফগান সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি নামে সোভিয়েত

রাশিয়া ও আফগানের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে ছিল। তারই আওতায় সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করে।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বছর সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগান জনগণের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনেভা চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৮ খৃস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ ছিল সোভিয়েতরাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান।

১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পরেও ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কাবুলে ক্ষমতাসীন থাকেন। ডঃ নজিবুল্লাহ এক সময় আফগান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। মুজাহিদদের গেরিলা অভিযান দমনে ব্যর্থ বাবরাক কারমালের প্রতি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বস্তুত সোভিয়েত কর্তৃপক্ষই ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে বাবরাক কারমালকে অপসারণের মাধ্যমে ডঃ নজিবুল্লাহকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন।

ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনকাল পর্যন্ত ৬ বছর অধিষ্ঠিত করে।

১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল কমিউনিস্ট ডঃ নজিবুল্লাহর উৎখাত তথা মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের পর হতে ১৯৯৬ খৃস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সাড়ে চার বছর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী এবং অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন রব্বানী কাবুলে ক্ষমতাসীন ছিলেন।

১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ডঃ নজিবুল্লাহর পতনের পর ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ (খৃঃ) সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর পর ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোরহানুদ্দিন রব্বানী প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন এবং সেনাবাহিনী প্রধান আহমদ শাহ মাসুদ তাজিক বংশোদ্ভূত। হিজব-ই-ইসলামী প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার পশতু গোত্রভুক্ত।

আহমদ শাহ মাসুদ মনোনীত হন রব্বানী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আহমদ শাহ মাসুদ এবং হেকমতিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে তেমন ভাল ছিল না। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ছিলেন রক্ষণশীল এবং আহমদ শাহ ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিশীল।

মন্ত্রী সভায় আহমদ শাহ মাসুদের অন্তর্ভূক্তিতে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু তার আপত্তি গৃহীত না হওয়ায় ১৯৯৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক মাসের মাথায় হেজব-ই-ইসলামী দলের গুলবুদ্দিন

হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

১৯৯৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে তালেবানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে আসেন। কিন্তু ৪ মাসের মধ্যেই তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের পর তাকে কাবুল ত্যাগ করতে হয়।

১৯৯৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে আফগানিস্তানের ১০টি প্রধান মুজাহিদ দল একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৩ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রব্বানীর পদত্যাগ করার কথা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি তা করেননি। ১৯৯৩ খৃস্টাব্দের শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে একটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাও সম্ভব হয়নি।

১৯৯৪ খৃস্টাব্দে তিউনিসিয়ার মাহামুদ মিস্তারীর নেতৃত্বে জাতিসংঘ আফগানিস্তানে এক মিশন পাঠায়। এই মিশনের লক্ষ্য ছিল, বিবাদমান মুজাহিদদের ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা; কিন্তু তিনি তার মিশনের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন।

১৯৯৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তালেবান মুজাহিদরা কাবুল আক্রমণ করে। প্রথমে তারা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের অধিকৃত অঞ্চল দখল করে নেয়।

কাবুলের দক্ষিণে অবস্থিত হেকমতিয়ারের ঘাঁটি দখল করা সম্ভব হলেও তালেবানগণ ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে কাবুল দখল করতে পারেনি। তখন তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৯৯৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেরাত দখল করে নেয়। আগে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তারা কান্দাহার দখল করে। তালেবান নেতা মোহাম্মদ ওমরের বাড়ী কান্দাহারে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ তারা জালালাবাদ দখল করে নেয়।

১৯৯৬ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে তালেবানগণ দ্বিতীয়বারের মতো কাবুল অবরোধ করে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ তালেবানদের নিকট জালালাবাদের পতনের পর তালেবানগণ কাবুলের পূর্বে শারবির দিকে ৭০ কিলোমিটার অগ্রসর হতে থাকে। শারবি ছিল প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার সমর্থকদের হাতে। ২৫ সেপ্টেম্বর অনেকটা বিনা যুদ্ধেই শারবির পতন হলে হেকমতিয়ারের সৈন্যরা যুদ্ধ না করে তালেবানদের সঙ্গে যোগ দেন।

শারবি শহরের পতনের পরেই তালেবানগণ কাবুলের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেন। কাবুলের সরকারী বাহিনী ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো, তালেবানগণ চারদিক থেকে কাবুল শহরকে প্রায় ঘিরে ফেলেছিলেন। ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তারা কাবুলের দক্ষিণে হেকমতিয়ারের ঘাঁটি দখল করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে

জালালাবাদ দখলের পর তালেবান জালালাবাদ হতে অগ্রসর হয়ে কাবুল শহরের উত্তর দিকে অবস্থান নেন। তাজিক নেতা আহমদ শাহ মাসুদ মনে করলেন যে, উত্তর দিকের রাস্তা তালেবানদের হাতে চলে গেলে তার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঞ্চশীর উপত্যকায় পিছু হটা সম্ভব হবে না। পাঞ্চশীর উপত্যকাই হলো তার ক্ষমতার ভিত্তি।

আহমদ শাহ মাসুদ তালেবানদের বিজয় অবশ্যাম্ভাবী মনে করে অযথা রক্তপাত না করে যত বেশী সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে পড়ার চিন্তায় থাকেন। মাসুদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঞ্চশীর উপত্যকায় চলে গেলে রব্বানীদের পক্ষে কাবুলে অবস্থান করা সম্ভব নয়। ফলে অনেকটা বিনা যুদ্ধেই ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দে কাবুল তালেবানদের হাতে এসে যায়।

তালেবানগণ সরকার পরিচালনার জন্যে যে জাতীয় কমিটি গঠন করে তার সদস্য সংখ্যা হলো ৬ জন। তারা হলেনঃ

১। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, আমিরুল মুমেনীন, ২। হাজী মোহাম্মদ হাসান, কান্দাহার প্রদেশের প্রধান নির্বাহী। (৩) মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক, তালেবান সামরিক বিষয়ক প্রধান (৪) উজবেক নেতা মৌলভী গিয়াসউদ্দিন, ফারিয়ার প্রদেশের প্রধান (৫) মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল, তালেবান নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান (৬) মোল্লা মোহাম্মদ গাউস, পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান।

তালেবানদের বর্তমান সংখ্যা ১৫ হাজারের মতো। বাহিনী হিসেবে এরা তেমন একটা বড় কিছু নয়; তবে তাঁদের আছে এখলাস খোদাভীরুতা এবং প্রচার বিমুখতা। তালেবানদের শিক্ষক এবং মূল নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বয়স চল্লিশের নিচে। কারো কারো মতে, তাঁর বয়স ৩২ বছর (সাপ্তাহিক টাইম, ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৬ খৃঃ) তাঁর কোন বক্তব্য বা ছবি পাশ্চাত্যের কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সূত্র ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত গ্রন্থ

তালিবান ইসলামী আন্দোলনঃ উত্থানের নেপথ্য কথা

হক ও বাতিলের সংঘাত চিরাচরিত। হক সর্বদা বিজয় লাভ করে, আর বাতিল পরাভূত হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি সিংহ শার্দুল-এর দেশ বলে পরিচিত আফগানিস্তানে। পাকিস্তান, ইরান, তুর্ক-মেনিস্তান, উজবেকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত এই দেশে ১৯৭৩ সাল থেকে গোলযোগ লেগেই আছে। ১৯৭৩ সালে দেশের স্থবির অর্থনীতির কারণে বাদশাহ জহির শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর প্রেসিডেন্ট দাউদকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন নূর মোহাম্মদ তারাকি। তারাকির পারচাম পার্টি সোভিয়েত পন্থী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৮ সালে এক রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাফিজুল্লাহ আমিন ক্ষমতা দখল করে। এরপর আরেকটি সামরিক অভ্যুস্থানে হাফিজুল্লাহ আসীসকে হত্যা করে কট্টর কম্যুনিস্ট

—৫

নেতা বারযাক মারমাল ক্ষমতা দখল করে এবং লক্ষাধিক রাশিয়ান সৈন্য আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। এ পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম একপ্রকার খালি হাতেই প্রতিরোধযুদ্ধে নেমে পড়ে। ৩০ লক্ষ লোক পাকিস্তানে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করে। শুরু হয় কম্যুনিস্টদের কবল থেকে দেশ রক্ষা করার সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক (রহঃ) পুরাপুরি মুজাহিদদের সহযোগিতা করেন। সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম নওজোয়ানরা ছুটে আসে আফগান ভাইদের রক্ষার্থে। ৭টি মুজাহিদ গ্রুপের সমন্বয়ে চলে তুমুল সংঘর্ষ। ১৯৮৫ সালে লক্ষাধিক রুশ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুজাহিদদের দমন করতে ব্যর্থ হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কারমালকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে ডঃ নজিবুল্লাহকে ক্ষমতায় বসায়। অবশেষে মিখাইল গর্ভাচেভ দেশ দখলের মোহ ত্যাগ করে বললেন, আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে ভুল করেছি। ১৯৮৮ সালে তিনি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ১৪ হাজার সৈন্য হারিয়ে ১৯৮৯ সালের ১৫ এপ্রিল মুজাহিদরা কাবুল দখল করে নেয়। এরপর সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান রশিদ দোস্তাম ডঃ নজিবুল্লাহর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহমদ শাহ মাসউদ ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেহেতু নজিবুল্লাহর বাহিনী আহমদ শাহ মাসউদ এর কাছে শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করেছে তাই তাকে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়েছে। এদিকে হেকমতিয়ার এর মত হচ্ছে দীর্ঘ ১৪ বছর যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম, যারা আমাদের হাজার হাজার লোককে হত্যা করল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করলো তাদেরকে ক্ষমা করা যায় না। এ নিয়ে মতবিরোধ চলতে চলতে এক পর্যায়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও অন্যান্য জোট বুরহানুদ্দিন রাব্বানীকে উৎখাতের অভিযান শুরু করে এবং প্রতিদিন লড়াই চলতে থাকে। কাবুলের উপর রকেটবর্ষণ হতে থাকে। নিরীহ লোকজন হতাহত হয়। সকলের হাতে অস্ত্র থাকায় চুরি ডাকাতি, রাহাজানি বৃদ্ধি পায়। এমনকি নারী নির্যাতনের মত ঘটনাও ঘটতে থাকে। মানুষ দারুণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা দান করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, কিন্তু কাবুলের ইসলামী সরকার এগুলো দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আফগানিস্তানের জিহাদকে নিয়ে যারা গর্ব করতো তারা ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে হতভম্ব হয়ে পড়ল। বিভিন্ন দেশের মুজাহেদীন যারা শাহাদাতবরণ করে আফগানিস্তানের জমিনে শুয়ে আছেন, তাদের রুহগুলো তড়পাতে লাগল। ইসলামের দুশমনরা বিভিন্ন রং লাগিয়ে জিহাদকে বদনাম করতে লাগল। তখন মোল্লা ওমরসহ ১৫জন উলামায়ে কেরাম কান্দাহারের এক জায়গায় একত্রিত হলেন। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন কর্মপন্থার উপর সূদীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শ করলেন যে, এ মুহূর্তে কি করা যায়। কি করে আফগানিস্তানের জিহাদের

ফসল দুনিয়ার মানুষকে দেখানো যায়। কি করে ইসলামী হুকুমতের সঠিক নমুনা পৃথিবীর সামনে পেশ করা যায়। উল্লেখ্য, পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশেই ইসলামী হুকুমতের সঠিক নমুনা নেই। তবে আংশিক ও ছিটেফোটা নমুনা রয়েছে বটে।

যদি ইসলামী দুনিয়ার ক্ষমতাসীনরা, উলামায়ে কেরাম, কওম ও মিল্লাতের কর্ণধাররা পাশ্চাত্যের প্রোপাগাণ্ডার শিকার না হয়ে ইসলামী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তালিবানদের আন্দোলনকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তবে তাদের সামনে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এক নমুনা এসে যাবে। সাদাসিদা জীবন-যাপন, অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ফুটে উঠবে। আমীর ফকির, ধনী গরীব, রাজা-প্রজা, বিচারক বিচারপ্রার্থী, অত্যাচারী অত্যাচারিত সকলে নামাযের মত একই কাতারে দণ্ডায়মান। বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকের উপর অসীম ভরসা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করায় তালিবানরা যে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করেছে তা সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর বিজয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে পাকিস্তানের আইএফ আর, আর আমেরিকার মদদপুষ্ট এজেন্ট এর কাজ বলে অপপ্রচার চলছে। আমীরুল মুমেনীন মাওলানা মোল্লা ওমর বলেন, কোন ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের পরওয়া না করে আমরা শরীয়তের হুকুম চালু করে যাচ্ছি। শরীয়তের কোন বিষয়ে আমরা কোনরূপ আপোষ করতে রাজী নই। টিভি ভিসিআর আর সিনেমা আমাদের এখানে নিষিদ্ধ। আমাদের এখানে বিশৃংখলা করার অনুমতি নেই। আমেরিকা বা পশ্চিমা ইসলামের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের সামনে রয়েছে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সুন্নত। তিনি বলেছিলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করবে, আমার তরবারী তাদের ফয়সালা করবে। যেসব নেতারা তাদের নিজের দেশেই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী দেশ চালাতে চায় না, তারা কিভাবে তালিবানদের সাহায্য করবে? মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য সহযোগিতা আসবে হয়তো তাদের নিজের স্বার্থ বা আমেরিকা বা তাদের দোসরদের ইশারা ইঙ্গিতে। তাদের সাহায্য না আসাই প্রমাণ করছে তালিবানরা 'সাচ্চা' মুসলমান ও এখনো 'সঠিক পথে' আছে।

আফগানিস্তানের দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধ মুসলমানদের অন্তরে জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা পুলকিত করেছিল। আল্লাহপাকের কালেমার ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করার নিমিত্তে জান উৎসর্গ করার উন্মাদনায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা আফগান ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানকে কাঁপিয়ে ছিল। কাবল দখলের পর তারা খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ খুশি বেশীদিন স্থায়ী হল না। তাদের খুশি ভূলুণ্ঠিত হল। যে সমস্ত মুজাহিদ কমাণ্ডার

১৪ বছর রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। যারা একদিন মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত রক্ষার জন্য ঈমানকে সংরক্ষণের জন্য জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছিল তারাই আবার ক্ষমতার লিপ্সায় একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে গেল। একে অপরের ঘর বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে লাগল। কাবুলসহ সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এহেন অবস্থা জাহেলিয়াত যুগের গোত্রগত যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। ইসলামী বিশ্ব রক্তাশ্রু প্রবাহিত করল। কোরআন পাকের নির্দেশ অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে সন্ধির প্রচেষ্টা চলল। খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা আফগানিস্তানের সকল নেতাদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফে জমা করে একটা অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করালেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম, পরিহাস, অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষরকারীগণের অনেক নেতা দেশে ফিরার পূর্বেই দুশমনদের চক্রান্তের স্বীকার হয়। গৃহযুদ্ধের দামামা আবার বেঁজে উঠে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মত আঞ্চলিকতা ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বের চিত্র আফগানিস্তানের জমিনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষমতার লিপ্সা সকলকে অন্ধ করে দেয়। বায়তুল্লাহ শরীফের অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি তাদের উপর নেমে আসে। আফগাস্তিানের কোন জায়গায় জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকল না। প্রত্যেক জায়গায় এক একজন গোত্রপতি হিংস্র জানোয়ারের আকৃতি ধারণ করলো। ক্ষমতার দাম্ভিকতা ছাড়া তাদের কিছুই ছিল না। দীর্ঘ ১৪ বছরের যুদ্ধে এবং তার পূর্ববর্তী সময় ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ছিল না। বেসরকারীভাবে উলামায়ে কেরাম কিছুটা দীন শিক্ষা চালু রেখেছিলেন যুদ্ধের সময় তাও সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শুরুর সময় যে ছেলেটির বয়স ৮/৯ বছর, যুদ্ধ শেষে তার বয়স ২২/২৩ বছর হয়েছিল, এরা সকলেই প্রায় অশিক্ষিত, হাতে ভারী ভারী অস্ত্র। এগুলোকে সঠিক পথে আনা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। জনগণ অত্যাচারিত হচ্ছিল। ডাকাতরা মুজাহিদ নাম ধারণ করে ডাকাতি রাহাজানিতে লিপ্ত ছিল। হারাম মাল উপার্জনকে ভাল মনে করতে লাগল। চেকপোষ্টের নাম করে লুট-পাটের কারখানা খুলে দিল। গণিমতের মাল মনে করে ঘরকে উজাড় করতে লাগল। মোটকথা এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, তাতে লজ্জায় মুসলমানদের মাথানত হয়ে আসে। পবিত্র মক্কা-মদীনায় আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য দোয়া বন্ধ করে দেয়া হল। আফগান মুজাহিদদের নাম শুনলে লোকেরা ছি-ছি করত। আফগানিস্তানের অন্যান্য নেতা যেমন মাওলানা ইউনুছ খালেদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী, মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানী, মাওলানা আরছালান খান রাহমানী। যারা আফগান জিহাদের ময়দানকে গরম করেছিল, গৃহযুদ্ধের বদনাম থেকে বাঁচার জন্য চুপচাপ যার যার এলাকায় বসেছিল। গৃহযুদ্ধে আফগান জিহাদের ফসল নষ্ট হতে দেখে বিশ্বের মুসলমানদের অন্তর যেভাবে কাতরাচ্ছিল, কিছু

মুজাহেদীন এ কেরাম এর অন্তরও তড়পাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সামনে কোন রাস্তা খোলা ছিল না। মজলুমের ফরিয়াদ আসমানে পৌঁছে গেল। কতিপয় উলামায়ে কেরাম একত্রিত হলেন। মোল্লা ওমর ১৫জন সাথী নিয়ে পরামর্শ করলেন এ মুহূর্তে কি করা যায়। মাত্র ১৫ জনে কি করা যাবে। বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমাতাধররা অধিষ্ঠিত। কিভাবে তারা এসব আবর্জনা জঞ্জালকে সাফ করবেন। মোল্লা ওমর বললেন, ফিৎসা ফাসাদকে দূর করার জন্য জিহাদ শুরু করা যাক। জিহাদ শুরু হলে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে যাবে। তখন হক বাতিলের উপর বিজয় লাভ করবে। রাশিয়ার বর্বর বাহিনীর সাথেও কতিপয় উলামায়ে কেরাম সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করেছিলেন। কোন অস্ত্র ও শক্তি ছাড়া যেভাবে আল্লাহ পাক তখন আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এখনও যদি আমরা এখলাসের সাথে তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করে দেশে ইসলামী শরীয়ত চালু করার, দেশের মধ্যে জুলুম নির্যাতন বন্ধ করার, মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত রক্ষা করার জন্য জিহাদ শুরু করি; আর যদি পুরোপুরি সুন্নতের অনুসারী হতে পারি, তবে অবশ্যই আল্লাহপাক আমাদের সাহায্য করবেন। একজন সন্দেহ প্রকাশ করল, এভাবে তো আরো একটি গৃহযুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিবে। মোল্লা ওমর বললেন, আমরা গৃহযুদ্ধ করবো না। আমরা শুধুমাত্র যুদ্ধবাজ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। আমাদের গুলির নিশানা হবে জালেম শক্তি ও বিশৃংখলাকারী দলগুলো। আমরা মুসলমানদের জান-মালের হিফাজত করবো, আমরা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী নেতৃবর্গ ও সাধারণ লোককে এক কাতারে দাঁড় করাবো। আমরা শাসক হবো না, স্বেচ্ছাসেবক হয়ে লোকদের খেদমত করবো। আমরাঁ আফগানিস্তানের জমিনে একটি উত্তম উপমা। ইসলামী হুকুমত কায়েম করবো। আমরা একটি দক্ষ স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলবো এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কোন দলের নেতৃত্বে এ জিহাদ চলবে। তিনি বললেন, কোন দলের নেতৃত্বে বা অধীনস্থ হয়ে নয়। কেননা প্রত্যেক দলের একটা গঠনতন্ত্র আছে, তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ আছে। সবকিছু বিবেচনা করে তাদের আগে বাড়তে হয় সিদ্ধান্ত স্থির করতে। আফগানিস্তানের সকল দলগুলো তাদের সম্মান হারিয়ে ফেলেছে। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বাদ দিয়ে জুলুম-এর পথ বেছে নিয়েছে, বায়তুল্লাহ শরীফে অঙ্গীকার করার পরও তা ভঙ্গ করায় কেউ তাদেরকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন দলের অধীনে কাজ করি তবে মানুষের সন্দেহ বেড়ে যাবে। এখন কিভাবে কাজ করা যায়, কোথা থেকে শুরু করা যায়, কি নামে করা যায়। তিনি বললেন, নামের বা জামাত গঠনের কি প্রয়োজন। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করে দেই, আল্লাহ পাকের রহমতে ইনশাআল্লাহ রাস্তা খুলে যাবে। আমরা আলেম ও তালেব এ ইলমরা জিহাদ শুরু করেছিলাম কিন্তু কোন সংগঠন ছিল না। প্রত্যেকেই নিজে নিজে অস্ত্র হাতে তুলে

নিয়ে জিহাদ করেছে। নামের জন্য, ক্ষমতার জন্য, পরে সংগঠনের নামকরণ হয়েছে। চাঁদা উসুল করার জন্য নামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজ থেকে ১৮ বছর পূর্বে আমরা আবার ফিরে যেতে চাই। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় জিহাদের ডাক দিয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। আমরা তালেব এ ইলম। তালিবান আমাদের গর্ব, এটাই আমাদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। আমরা তালেব ইলম হয়েছি, তালেব এ ইলম হয়েই জীবন-যাপন করব। তালেব ই ইলম হয়ে, শহীদ হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হব। এটাই তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত। মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা মোল্লা ওমর দীর্ঘ ১৪ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পুনরায় শিক্ষকতার জীবণে ফিরে যান। তিনি কাউকে চিনেন না, কোন সরকারী কর্মকর্তা হননি। কোন নামকরা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেননি। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছেন, আল্লাহ পাকই তাকে ছওয়াব দান করবেন। তিনি পাকিস্তানের কোন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেননি বা আমেরিকার কোন দূত বা সরকারের সাথে যোগাযোগ করেননি। যদি এরূপ জুলুম ও গৃহযুদ্ধ না হত, লোকদের বেইজ্জতী করা না হত, মানুষের জান-মাল লুট করা না হত, তবে মোল্লা ওমর একজন অপরিচিত মুজাহিদের এর মত দুনিয়া থেকে চলে যেতেন। আফগানিস্তানের লাখো শহীদের মত তার নামও কেউ জানতো না। কিন্তু জুলুম ও অত্যাচারে মোল্লা ওমরকে অপরিচিত থেকে পরিচিতিতে আসতে হল। তাকে তালিবানদের পরিচালক বানানো হল। জিহাদ জায়েজ করার নিমিত্তে পুনরায় কান্দাহারের উলামায়ে কিরাম তাকে আমিরুল মুমেনিন ঘোষণা দিলেন। কেননা, আমিরুল মুমেনিন ব্যতীত জিহাদের গুরুত্ব নেই। তালিবানরা আমেরিকা বা পাকিস্তানের এজেন্ট নয় বা পাকিস্তানের পুতুল সরকারও নয়; বরং দেওবন্দী হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্কিত খোদার পথে জীবন উৎসর্গকারী কিছু জানবাজ মুজাহিদ। আল্লাহ পাকের উপর ভরসাই তাদের একমাত্র সম্বল। নবী করীম (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ, ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর ফিকাহ চালু করা ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ও মুজতাহেদীন-এ কিরামের সম্মান ও তাদের অনুসৃত পথে চলা তাদের অভিপ্রায়। রাজা প্রজা আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, এই ছিল তাদের কাম্য। জান উৎসর্গকারী কাফেলা 'তালিবান' রূপে আত্মপ্রকাশ করে জিহাদের আওয়াজ বুলন্দ করলে, লোকেরা তাদেরকে মুক্তির দূত মনে করে তাদের ধন সম্পদ ও অস্ত্রাদি তালিবানদের হাতে সমর্পন করল। তালিবানরা তাদের ধন সম্পদ ফেরত দিয়ে বললেন, এই অর্থ সম্পদ মুজাহিদদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমাদের অর্থের প্রয়োজন নেই। অস্ত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী। অর্থ সম্পদ নিজ হাতে রেখে অস্ত্রাদি তালিবানদের বায়তুল মালে জমা করে দিল। এগুলো আমাদের কাছে আমানত স্বরূপ। আমরা যদি আপনাদের জান-মাল

ইজ্জতের হিফাজত করতে সক্ষম হই তবে হাতিয়ার আমাদের কাছে থাকবে। আর যদি না পারি তবে আপনাদের হাতিয়ার আপনাদের কাছে ফেরত দেয়া হবে। যাতে আপনারা নিজেদের জানমাল নিজেরা হিফাজত করতে পারেন। আজ থেকে আপনাদের জান মাল ইজ্জত হিফাজতের দায়িত্ব আমাদের। কান্দাহারের এক প্রান্তে যখন শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন অন্যান্য এলাকার লোকজন দলে দলে তালিবানদের পতাকা তলে সমবেত হতে লাগল। বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাতিয়ার জমা করে ইসলামী শাসনের মধ্যে আসতে আহ্বান করা হল। চুরি-ডাকাতি রাহাজানি করতে নিষেধ করা হল। যে কান্দাহার চুরি, ডাকাতি, মাস্তানী, সন্ত্রাসীর আখড়ায় পরিণত হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় সেই কান্দাহার ইসলামী শরীয়ত কায়েমের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হল। ১৯৯৪ সালে তালিবানদের এই আওয়াজ যখন কান্দাহার থেকে উচ্চারিত হল, তখন বিভিন্ন স্থানের উলামায়ে কিরাম 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দিতে লাগলেন, আফগানিস্তানের বিভিন্ন কমাণ্ডাররা তাদের অস্ত্র ও সৈন্যদেরকে তালিবানদের হাতে সমর্পন করলেন। এভাবে তালিবান ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে, রাজধানী কাবুলসহ ২২টি প্রদেশ তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইসলামী আইন চালু করেছে। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বীকার না হলে অচিরেই বাকি ৮টি প্রদেশও তালিবানদের হস্তগত হবে ইনশাআল্লাহ। সমস্ত মুসলমানদেরকে তালিবানদের জন্য দোয়া ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে, আল্লাহপাক আমাদের সহায় হোন।

তালিবান সম্পর্কে নাস্তিক্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের অমার্জনীয় আস্ফালন

সম্প্রতি তালিবান মিলিশিয়া বাহিনী কাবুল দখল করে। বর্তমানে তারা আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে। আফগানিস্তানের ৮০% এলাকাব্যাপী তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা হাতে নিয়েই তালিবানরা আফগানিস্তানে ইসলামী শরীয়া আইন চালুর কথা ঘোষণা দিয়েছে। দেশকে নিখুঁত ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে আইন প্রয়োগ করতেও সক্ষম হয়েছে। ব্যাভিচার ও ধর্ষণে বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপ , (২) চুরি-ডাকাতিতে হাত-পা কর্তন, (৩) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পড়া, (৪) নামাযের সময় হলে নিকটতম মসজিদে গাড়ী থামানো এবং সকল মুসলমানের নামায আদায় করা, (৫) মহিলাদেরকে পর্দার সাথে চলাফেলা করা, (৬) দাড়ি কর্তন না করাসহ বেশ ক'টি ইসলামী নীতিমালার নির্দেশ দিয়েছে নতুন তালিবান সরকার।

সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের কাছে তালিবানদের এ অগ্রযাত্রা বেশ আনন্দের কারণ হয়েছে। তাই সারা বিশ্বের নজর এখন তালিবানদের দিকে। কি হচ্ছে ও কি

ঘটছে কাবুলে? কেমন করছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার? প্রতিদিনের পত্রিকায় সকলের নজর এখন সেদিকেই। এর যথেষ্ট কারণও আছে।

প্রথমতঃ পশ্চিমাদের সেবাদাস তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় মৌলবাদী মোল্লারা এখন আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই মোল্লাদেরকে ওরা খুব ভয় পায়। দ্বিতীয়তঃ তালিবানরা ক্ষমতা দখল করে ইসলামের পক্ষে এ পর্যন্ত যে কাজগুলো করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীকে; বিশেষত সাবেক কমিউনিস্ট সরকারের শেষ রাষ্ট্রনায়ক নজীবুল্লাহকে হত্যা করে। পৃথিবীর যেকোন দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর যেমন গণতান্ত্রিক রীতি অনুরূপ, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনও বৈপ্লবিক নীতিমালার একটি। আফগানিস্তানে তালিবানরা তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। দেশের ৮০% এলাকা নিয়ন্ত্রণও করছে তারা। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ সশস্ত্র বিপ্লবে কাবুলে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং তালিবান মিলিশিয়া বাহিনী কাবুল দখলের পর কোন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হবার পর প্রতিপক্ষের ধন-সম্পদ ও সমর্থকদের নিরাপত্তা থাকে না। কিন্তু তালিবানদের কাবুল বিজয়ে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ কারণেই তালিবানদের উপস্থিতিকে দেশের জনসাধারণ স্বাগত জানাচ্ছে। তালিবানদেরকে দেয়া দেশের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনকে সম্ভবত উপেক্ষা করার মত বিবেকহীনতা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না। তাই যুক্তরাষ্ট্র বলছে, 'আফগানিস্তানের সতর বছরের আত্মকলহ দমনে তালিবানরাই সক্ষম। অথবা এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক একটি চাল। সে যাক, আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করা খুবই কঠিন বলে আমরা মনে করি। কারণ জাতিসংঘে যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব রয়েছে, গোটা নেতৃত্বকেই আমরা ইসলাম বিদ্বেষী বলে মনে করি। আল কোরআনের ভাষায় ইয়াহুদ ও খৃস্টান জাতি কোনদিন মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না, বরং ওদেরকে আপন মনে করতেও পবিত্র কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর ও ফিলিস্তীনে ওদের তথাকথিত মানবাধিকার লংঘিত হয় না, যেহেতু ওইসব দেশে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। আর আফগানিস্তানে তালিবানদের ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা ওদের সহ্য হয় না। ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আইন মহিলাদের পর্দার নির্দেশ ওদের ভাষায় নারী নির্যাতন ও অধিকার লংঘন। তাই যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে মুসলিম নিধন সংঘ যেসব সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারী সংকেত দিচ্ছে। এটা দেবেই। কারণ এটা তাদের হীন পরিকল্পনার মূল কর্মসূচী। এতে বিশ্ব মুসলিমের বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। আমরা বরং বিস্মিত হচ্ছি এ জন্যে যে, তালিবানদের ক্ষমতা দখলের পর থেকে বাংলাদেশের দু'একটি জাতীয় পত্রিকায় পশ্চিমাদের সেবাদাস তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আফগানিস্তান সম্পর্কে প্রকাশিত মনগড়া বিবৃতি দেখে।

তাদের এসব বিবৃতি বা প্রতিবেদন পড়লে মনে হয়, আফগানিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত রাব্বানী সরকার থেকেও তারা দেশটির জন্য অধিকতর দুঃখবোধ করছেন। তারা তালিবান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। মিথ্যা প্রচারণা এত অধিকহারে চালাচ্ছেন, মনে হচ্ছে ইসলামের শত্রু কোন গোপন চক্রের ইংগিত ইশারায় বর্তমান আফগান সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা তাদের হীন উদ্দেশ্য, যাতে বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি না দিতে পারে এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যেন ইসলামী শাসন সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, নাস্তিক মুরতাদ চক্র ইসলামকে বড়ই ভয় পায়। ইসলামী আইন কানুন তাদের জীবনের চরম শত্রু। কারণ তাদের চক্ষের সামনে দি স্যাটানিক ভার্সেসের লেখক সালমান রুশদীর জীবন যাপনের ঘটনাবলী ভাস্বর হয়ে আছে। তাদের দলেরই একজন কুখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের পরিণতিও তারা অবলোকন করছে। তারা মনে করে, মাত্র একটি কওমী মাদ্রাসার গোটিকয়েক মোল্লা অতি অল্প সময়ে আফগানিস্তানের মত দেশের ক্ষমতা দখল করতঃ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে বের করে এনে মহা উৎপীড়ক সাবেক কমিউনিস্ট শাসক নজিবুল্লাহকে ফাঁসি দিয়ে দিল। আর সারা বিশ্ব হা করে তাকিয়ে রইল। এ ঘটনা থেকে বাংলাদেশের মৌলবাদী কওমী মোল্লারাও যদি শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি তারা এ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং সংগঠিত হতে শুরু করে, তবে এই ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশের হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ মোল্লাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী গণবিপ্লবের ধাক্কায় একদিন নজিবুল্লাহর মত অপমানজনক খেসারত তাদেরকেও দিতে হয়, তাইতো কুখ্যাত একজন নাস্তিক লেখক আফগানিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-যা গত ৯ অক্টোবর ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে- এখন সারাবিশ্বে মুসলিম জগতের ৪৭টি রাজ্যে ইউরোপীয় ধর্মধ্বজীদের মত ইসলামী শাস্ত্রীদের প্রভাব রাহুর মত। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ প্রতিহত করতে সর্বত্র অর্থোডক্স ও মৌলবাদীরা উঠে পড়ে লেগেছে। সে জন্যই তিউনিসিয়ায়, সৌদিতে, ইরানে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এবং ইন্দোনেশিয়া অবধি সর্বত্র এই শাস্ত্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। তালিবান এই দূরাত্মাদের একটি প্রবল দল। তাদের প্রভাব কিছুদিন টিকবে বটে; কিন্তু কাল বিরোধী বলে শিগগিরই বিলুপ্ত হবে। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। সুধী পাঠক! এখানে একটি কথা খুবই লক্ষণীয় যে, আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার ও উদ্দেশমূলক বিবৃতি ও নিবন্ধ তৈরিতে বাংলাদেশের সেসব বুদ্ধিজীবীরাই তৎপর; যারা বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানে বিসমিল্লাহ সহ্য করতে পারছে না। যারা আল্লাহ শব্দের উচ্চারণে ধর্ম নিরপেক্ষতা হননের গন্ধ পান। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীকে পুনরায় সংশোধন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অগনিশি মন্ত্রনা দিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয়

শিক্ষানীতি থেকে ইসলাম ধর্মকে বাদ দেয়ার এবং ডঃ কুদরতে খোদা প্রস্তাবিত ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যারা বর্তমান সরকারের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন।

বলাবাহুল্য, ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের একটি শক্তিশালী চক্র অত্যন্ত নিপুণতার সাথে বাংলাদেশেও ইসলামের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। ওরা ইসলামী মূল্যবোধকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রে ইসলামের উত্থান ও অগ্রযাত্রাকে তারা বড় ভয় পায়।

কিন্তু আমাদের আরো অধিকতর বিস্মিত করেছে; আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী কথিত ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরানের ভূমিকা। কারণ বলা হয়ে থাকে ইরান একটি ইসলামী রাষ্ট্র, সেই দেশে নাকি কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রবর্তন করা হয়েছে অনেক আগে। সেই দেশের মহিলাগণও ইসলামী আইনের কারণে কঠোর পর্দা মেনে চলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আফগানিস্তানে তালিবানদের ক্ষমতা দখল ও কতিপয় ইসলামী নীতিমালা ঘোষিত হবার পর ইরান এর কঠোর সমালোচনা করেছে। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র যাতে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ইরান অব্যাহত উপদেশ দিচ্ছে বলেও পত্রিকায় প্রকাশ।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে একশ্রেণীর ইসলামপন্থীরা ইরানের ইসলাম নিয়ে আস্ফালন করেন, ইরানের ইসলাম নিয়ে বাংলাদেশের তথাকথিত উদারপন্থী, নামজাদা অনেক সুন্নি আলেমও নির্দ্বিধায় ইসলামী বিপ্লব আখ্যায়িত করেন। গত বছর অক্টোবর মাসে ইরানী প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর বাংলাদেশ সফর প্রাক্কালে শীয়া-সুন্নী এক ও অভিন্ন শ্লোগানে বিমোহিত হয়েছিলেন অনেক সরলমনা সুন্নী মুসলমান। ইরানী দূতাবাসে একজন সুন্নী আলেমের পেছনে রাফসানজানীর নামায আদায় করাকে অনেকেই তখন দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, শীয়া-সুন্নীদের মধ্যে শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও মৌলিক ক্ষেত্রে কোন তফাত নেই এবং ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে আন্তর্জাতিক অংগনে ইসলামের সকল সম্প্রদায় এক হয়ে কাজ করতে হবে। সেসব উদারপন্থী শীয়া প্রেমিক ইসলামপন্থীদের নিকট আজ আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আফগানিস্তানের তালিবান ইসলামী সরকারকে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কেন স্বীকৃতি দিচ্ছে না। কেন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমর্থনদানে বাধা দিচ্ছে। কেন রাব্বানী সরকারকে তালিবানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। তাহলে কি তারা তালিবান ঘোষিত সুন্নী ইসলামী নীতিমালার বিরোধী? এ পর্যন্ত তালিবানরা যতটা আইন প্রয়োগ করেছে, কোনটাই তো কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নয়। তবে কেন ইরানের এ অনাকাংখিত আস্ফালন? তালিবানদের ক্ষমতা দখলে তাদের উদ্বেগের কারণ কি? সুন্নীদের নেতৃত্বে একটি হকপন্থী ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থানেই কি এইসব শীয়া নেতাদের উদ্বেগের কারণ?

প্রিয় পাঠক! মূল কারণ হচ্ছে, ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নামে শীয়া বিপ্লব হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ১২ নং ধারানুযায়ী তাদের হুকুমত একটি ইস্না আশারিয়া শীয়ারাষ্ট্র। এবং আফগানিস্তানের তালিবানরা হচ্ছে নির্ভেজাল সুন্নী এবং তারা নিখুঁত ইসলামী নীতি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত মুসলমান। সুতরাং এখানেই তফাৎ এবং এটাই তালিবানদের অপ্রিয়তার মূল কারণ। শীয়া কোনদিন সুন্নীদের বন্ধু ছিল না, হতে পারে না। সুন্নীদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের ঘরে শীয়াদের জন্ম। ইস্না আশারিয়াদের কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে সমগ্র বিশ্বের হককানী উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা প্রতীয়মান হবে যে, এই শীয়ারাই দীর্ঘ ১৩শ' বছর ধরে মুসলমানদের অকল্পনীয় ক্ষতি সাধন করে আসছে। চেংগিস খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে মুসলমানদের ক্ষমতা কেড়ে নিল এবং অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করে বাগদাদের তদানীন্তন বিশ্বের বৃহত্তর গ্রন্থাগার ধ্বংস করে ফেলল; উপরন্তু হাজার হাজার হকপন্থী সুন্নী আলেমকে নির্বিচারে হত্যা করল; তখন সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে চেংগিস খানের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিল ইরানের এই শীয়া সম্প্রদায়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বৃটিশ উপনিবেশিকদের পক্ষে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ডেকে এনেছিল আরেক শীয়া, মীর জাফর আলী। আবু মুসলিম খুরাসানী নামক আরেক শীয়া প্রশাসক কেবল খোরাসানেই ছয় লক্ষ খাঁটি মুসলমানকে কতল করেছিল। কারামাতীর শীয়ারা হরম শরীফ আক্রমণ করে হরমের ভেতরে অসংখ্য খুন-খারাবীর মাধ্যমে পবিত্র (হাযরে আসওয়াদ) কালো, পাথর ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ ইতিহাস তো পাঠক মাত্রই জানেন। (মুনাইয়াতুল আদাব পৃঃ ২৮)

অতীতে সুন্নীদের বিরুদ্ধে এসব কর্মকাণ্ড শীয়ারাই করেছে। সুতরাং শীয়ারা কখনও সুন্নীদের বন্ধু হতে পারে না। কাজেই নীতিগত প্রশ্নে শীয়া-সুন্নী সম্প্রীতি নয়, শীয়া-সুন্নী আদর্শগত বিরোধ, এটাই বাস্তবতা যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই এবং এ কারণেই আজ ইরানী শীয়ারা আফগানিস্তানের পূর্ণ ঈমানদার তালিবান সরকারকে বরদাশত করতে পারছে না।

প্রিয় পাঠক! শীয়াদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ইতিহাস বা তাদের আকিদার বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান '৯৫ সালের নভেম্বর ৩০ সংখ্যায় আমি বিস্তারিত লিখেছি।

এখানে আমি বলতে চাই, আমরা যেভাবে ইয়াহুদ খৃষ্টানদেরকে আমাদের শত্রুরূপে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে ওদের সেবাদাসচক্র তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও আমরা জানার চেষ্টা করি। অনুরূপ শীয়াদেরকে ও সুন্নী মুসলমানদের চিরশত্রু হিসেবে গণ্য করতে শিখি। শীয়াদের তাকিয়ানীতির ছদ্মাবরণে ওদের মুখরোচক সম্প্রীতির শ্লোগানে আত্মহারা হয়ে ইসলামী নেতৃত্বের যেসব কর্ণধার মাঝেমধ্যেই ওদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে

ফেলেন, তাদের সম্পর্কেও আমরা সচেতন থাকি। অবশেষে বলতে চাই, সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তালিবানরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে কিনা তা আমরা জানি না। বহুমুখী ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে তারা চূড়ান্ত সফলতা অর্জন নাও করতে পারে। তবে তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তাদের সমর্থন করি। আর আসুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমরা বিশ্ব মানচিত্রে একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রের উপমা স্থাপনে সফল হওয়ায় তালিবানদের জন্যে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করি।

নিবন্ধকার ঃ মুফতী মাওলানা আরিফ বিল্লাহ

তালেবানদের ফতহে মুবীন বা বিজয় সম্মেলন

আফগান জেহাদ ও তালেবান আন্দোলনের মূল উৎসস্থল পেশোয়ারের নিকটবর্তী দারুল উলুম হাক্কানিয়ায় বিগত ১৬ অক্টোবর তালেবান ইসলামী মিলিশিয়ার কাবুল অধিকার উপলক্ষে 'ফতহে মুবীন' মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফতহে মুবীন বা আল্লাহ প্রদত্ত বিজয় অনুষ্ঠানের মূল আহ্বায়ক, তালেবান আন্দোলনের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা সমীউল হক পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল। ফলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বহু বিশিষ্ট আলেম, মোজাহেদ নেতৃবৃন্দ এবং তালেবান কমাণ্ডারগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও তথ্য মাধ্যমসমূহের প্রতিনিধিগণও এ সম্মেলনে বিপুলভাবে শরীক হন।

সম্মেলনে মাওলানা সামীউল হক দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তালেবান আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পটভূমি ব্যাখ্যা করে মাওলানা সামীউল হক বলেন,

ঃ আমি আজ এই মহান সম্মেলনের প্লাটফরম থেকে দুনিয়ার সবগুলি মুসলিম দেশকে আফগানিস্তানের তালেবান ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর লক্ষ লক্ষ শহীদের খুন ও গাজীর ত্যাগ-কুরবানী এবং অগণিত মজলুমের অশ্রুজলে একটি খাঁটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং নব প্রতিষ্ঠিত এই ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হবে দুনিয়ার একশ' ত্রিশ কোটি মুসলমানের ঈমানী উত্তাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

আজ পাশ্চাত্যজগত এবং তাদের তল্পীবাহকদের সর্বাপেক্ষা বড় মাথাব্যথা হচ্ছে, "তালেবানরা মেয়েদের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে।" আসলে এটা একটা হীন ও নেতিবাচক প্রপাগাণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। কাবুল দখল করার পর আইন-শৃঙ্খলা পুরাপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য শুধু মেয়েদের নয়, শিশুদেরকেও স্কুলে যাওয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, শিশু ও মেয়েদের চিরতরে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

তালেবানরা মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চায় না। তবে এটাও চায় না যে, কমিউনিস্ট শাসনের কালো অধ্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার নামে যে উচ্ছৃংখলতা শিক্ষা দেয়া হতো, সেই বেলেল্লাপনা তালেবান ইসলামী সরকার কোন অবস্থাতেই অব্যাহত থাকতে দেবে না। অচিরেই ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা হবে এবং মেয়েদের জন্যও সেই শিক্ষার দ্বার অবারিত করা হবে।

চাকুরির ক্ষেত্রে যে সব মহিলা কর্মরত আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে.একই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির আগ পর্যন্ত তাঁদেরকে চাকরিস্থলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁরা আপাতত, বাড়িতে বসেই মাস শেষে বেতন পাবেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁদেরকে শরীয়ত অনুমোদিত কর্মে নিয়োজিত করা হবে।

আমার নিকট ফরাসী রাষ্ট্রদূত এসে বললেন, তালেবানরা মেয়েদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে কেন? আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ফরাসী বিপ্লবের আগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, বিপ্লবী সরকার কি হুবহু তাই বজায় রেখেছিল, না আমুল সংস্কার করা হয়েছিল?

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

আজ সমগ্র দুনিয়ার ইহুদী ও ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠী শুধু এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তালেবান ইসলামী সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। অথচ, আফগানিস্তানে এখন এর অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অগণিত সমস্যা মুখব্যদান করে পড়ে আছে। ষোল বছরের জেহাদ এবং তারপর রব্বানী হেকমতিয়ার আত্মঘাতি লড়াইয়ে আফগানিস্তান সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। দেশীয় পুনর্গঠনই এখন সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও দ্রব্যমূল্য এখনও অচিন্তনীয় পর্যায়ের আকাশ ছোঁয়া। এসব সমস্যার কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করছে না। ওরা শুধু মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনই দেখতে পাচ্ছে। ওদের আর্তচিৎকার শুনে মনে হয় আফগানিস্তানের বীর মুজাহিদদের দ্বারা একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এরা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওরা বোঝে যে, কল্যাণকর বিপ্লবের গতি কোথাও থমকে দাঁড়ায় না। আফগানিস্তানে তালেবান ইসলামী শক্তির অভ্যুত্থান সুসংহত হয়ে গেলে সমগ্র এশিয়ায় এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সমগ্র দুনিয়ার মজলুম মুসলমানদের চেতনা উত্তপ্ত হবে। সমগ্র দুনিয়াতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। আজ যদি মুসলিম সরকারগুলি আমেরিকার গোলামীর রশি গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামী তালেবানদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে না আসে, তবে মুসলিম জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

আল্লাহর মদদ সমাগত! এই বিপ্লবের গতিরোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নিবন্ধ

তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ হতে বৎসরাধিককাল হেরাতের শাসনভার তালেবানদের হাতে ছিল। ইতিমধ্যে অশান্ত আফগানিস্তানের চার ভাগের তিন ভাগ স্থানে তালেবানরা শাসন ও কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন বদনাম শুনা যায়নি। তালেবানগণ ১৯৯৬-এর ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করার পর সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইসলাম বিরোধী শিবিরগুলো একজোট হয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লেগেছে। তারা তালেবানদের তিল পরিমাণ ত্রুটিকে আধুনিক প্রচার মাধ্যমে পাহাড়ে পরিণত করে দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির প্রাণান্তকর অপয়াসে লিপ্ত আছে। যে, কোন তুচ্ছ ঘটনাকেও ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমসমূহ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রচার করে যাচ্ছে।

টিয়া পাখী পোষা, তাস খেলা, দাবা খেলা, ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধকরণ

তালেবানগণ টিয়া পাখী পালন, দাবা খেলা, তাস খেলা এবং ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধ করেছে এমন খবরও বহুল প্রচারিত এবং ইহুদী মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যম প্রচার করছে (সাপ্তাহিক নিউজ উইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬, পৃঃ ১৩) মনে হয় তাদের পত্রপত্রিকায় লেখার মতো এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভাব ঘটেছে।

ঘুড়ি উড়াতে যেয়ে বহু শিশু ছাদের উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। যেখানে এমনটি ঘটে সেখানে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য হলেও তা বন্ধ রাখা হয়। নিউজ উইক আরো লিখেছে তালেবানগণ সিনেমা দেখা, গান বাজনা, ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাতে কি হয়েছে? কে না জনে যে, যাদের করার মতো কোন কাজ থাকে না তারাই কেবল এ ধরনের আকাম-কুকর্মে সময় নষ্ট করতে পারেন।

মুসলিম দেশের হাক্কানী ওলামায়ে কেরাম ধূমপান, দাবা খেলা, গান-বাজনা, ইত্যাদি হালাল মনে করেন না। টেলিভিশনে সিনেমা দেখা আমাদের বাংলাদেশের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যঘেঁষা বহু মুসলিম দেশের ওলামায়ে কেরামের মতে হারাম। অত্যন্ত উদারপন্থী ওলামাদের মতেও বর্তমান পদ্ধতির ডিস এন্টিনার মাধ্যমে টেলিভিশনে প্রচারিত নোংরা অনুষ্ঠান ও সিনেমা অবশ্যই হারাম।

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনৈক পরিচালক কুড়াল দিয়ে তার বাড়ীর রেডিওগুলো ভেঙ্গে গেছেন। তার তিন ছেলে হাফেজ। অন্য কাউকে দিয়ে দিলেন না কেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছেন যে, 'যা আমার ছেলে-মেয়ের জন্য খারাপ, তা আমি অন্যকে দিতে পারি না।'

একজন যুগ্ম সচিবকে জানি, যিনি বাড়ীর টেলিভিশন সরিয়ে দিয়েছেন। টেলিভিশনে তো কোরআন তেলাওয়াত হয়, আযান দেয়া হয়, ইসলামী প্রোগ্রাম হয় বলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন গাভীর এক বাট হতে দুধ, আর এক বাট হতে রক্ত অন্য বাট হতে পুঁজ এবং মধু বের হয় আপনি এমন গাভীর দুধ খাবেন কিনা? ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাবলীগের তিন চিল্লা দিলে আমাদের দেশের বয়স্ক ইংরেজী শিক্ষিত একজন মানুষের মধ্যে যদি এরূপ পরিবর্তন হয়, মরণপণ জেহাদে অবতীর্ণ হলে ২৫-এর কোটার টগবগে যুবক মাদ্রাসা ছাত্রদের মানসিক পরিবর্তন কতটুকু হবে তা ভেবে দেখতে হয়।

তালেবানগণ যা করে তার অপপ্রচার হয় বেশি। তালেবানগণ অতি উৎসাহের বসে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু একজন ধূমপায়ীর গায়ে হাত তুলেছে বলে কোন পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম খবর দিতে পারেনি। কাবুলের যে কোন দোকানে প্রকাশ্যভাবে সিগারেট বিক্রি হয়, তবে তালেবানদের ঘোষণার ফলে ধূমপায়ীরা একটু সংযত হয়েছে।

ডঃ নজিবুল্লাহর ফাঁসি ঃ ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল আফগান মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের পর ডঃ নজিবুল্লাহ কাবুলস্থ জাতিসংঘ ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘ ভবনে অবস্থান করে আসছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খৃঃ তালেবান বাহিনীর নিকট কাবুলের পতনের পর তালেবানগণ ডঃ নজিবুল্লাহ এবং তার ভাই শাহপুর আহমদ জাইকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সম্মুখে আরিয়ানা স্কোয়ারের একটি ট্রাফিক লাইট পোস্টের সাথে ফাঁসি দেন এবং তাদের কৃত অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত দেখে মজলুম কাবুলবাসী যাতে তৃপ্ত হয় সেজন্য তাদের লাশ দু'তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়।

কাবুলের প্রধান সড়ক আরিয়ানা স্কোয়ারে হাজার হাজার আফগান বিদেশ প্রভুদের পদলেহী ডঃ নজিবুল্লাহর ও তাঁর সহযোগীর ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থা অবলোকন করেন।

তালেবান কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং ধর্মীয় নেতাগণ ডঃ নজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করেন তার মধ্যে ছিল খুন, জনগণের অধিকার হরণ এবং জনগণের ইসলামী চেতনা উপেক্ষা করে বিরোধী কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তন। উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট শাসনকালে কম বেশী ১৫ লাখ আফগান মুসলমান শহীদ হয়।

ডঃ নজিবুল্লাহ অবশ্যই মানুষ ছিলেন। তাঁর ফাঁসিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেকেই শোকাভিভূত। নজিবুল্লাহ এবং তাঁর ভাই শাহপুর আহমদ জাই এবং তাঁদের দেহরক্ষী হাবশীর মৃত্যুতে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে কিনা তা বিচার্য। কিন্তু নজিবুল্লাহর কারণে যে আফগানিস্তানের ১৫ লাখ লোক নিহত হলো, তারা

মনে হয় পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের মুখোশধারীদের দৃষ্টিতে মানুষ ছিল না। কারণ তারা ছিল মুসলমান এবং ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

তালেবানগণ যে কট্টর ইসলামপন্থী তা জাতিসংঘের জানা ছিল। ১৯৯২ খৃঃ থেকে ডঃ নজিবুল্লাহ জাতিসংঘ ভবনে তাদের অতিথি ছিলেন। ইচ্ছা থাকলে জাতিসংঘ যে কোন সময় তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারতেন।

তরুণ তালেবানরা নজিবুল্লাহকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে পারেন এটা অনুমান করা জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের জন্য কষ্টকর ছিল না। তালেবান যে ইরানীদের চেয়েও কঠোর মনোভাবাপন্ন তা ১৯৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে তালেবান বাহিনী কর্তৃক হেরাত দখলের পরেই ছিল সুস্পষ্ট। ডঃ নজিবুল্লাহকে যখন জাতিসংঘের ভবন থেকে বের করে নেয়া হয়, তখন জাতিসংঘের দপ্তরের কেউ অন্তত মৌখিকভাবে বাধা দিয়েছিলেন বা ছাড়ার অনুরোধ করেছিলেন এমন কোন খবরও পত্র পত্রিকায় দেখা যায়নি। ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন প্রকৃতভাবে নিষ্ঠুর চরিত্রের। তাঁকে যারা জানে তার প্রতি সহানুভূতি কম লোকেরই ছিল। কাবুলে জাতিসংঘ দূত মিঃ নরবার্ট হিলকে উপরোক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ঃ ১৯৭৯ খৃঃ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ১৭ বছর কাবুলের জনগণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নিদ্রা যেতে পারেনি। যে কোন সময় তাদের উপর রকেট সেল, গোলাগুলি বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো।

১৯৯২ খৃঃ কাবুল কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ৩০ হাজার মানুষ কাবুলে নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ধারা তালেবান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদুরিত হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ১২ লাখ লোক। সে সময় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের কাবুলে থাকতে ভয়ভীতি ছিল না।

তালেবান বাহিনী ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভয়ে ও বিদ্বেষবশে কাবুল ত্যাগ করেছে। এখন কাবুলে আন্তর্জাতিক সংস্থার লোক নাই বললেই চলে।

তালেবান কর্তৃক কাবুল মুক্ত হবার পর এখন অন্ততঃ মানুষ রকেট, মিসাইল ও গোলাগুলির ভীতি মুক্ত হয়ে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারে। তালেবানদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিকতর, রাস্তাঘাট নিরাপদ।

তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পূর্বে রাস্তায় কয়েক মাইল পর পরই থাকতো চাঁদাবাজদের টোল আদায়ের ফাঁড়ি। বুলডাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ৩ ঘণ্টার মটর ভ্রমণ পথ। এই ৩ ঘণ্টা চলার পথে ছিল ৪২টি চাঁদা আদায়ের বোকি কেন্দ্র। (The Economist. Qctober 5, 1996).

তালেবানদের হাতে কাবুল শহরের কোন একটি মানুষ গুরুতর আহত হয়নি (টাইম ইন্টারন্যাশনাল, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬) নজিবুল্লাহ, তাঁর ভাই, দুই দেহরক্ষী ছাড়া অন্য কোন মানুষের মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয়নি। রাজধানী কাবুলের ভিন্ন তালেবানদের হাতে অন্য কোন একটি শহর পতনের পর সেখানে বিজয় পরবর্তী কোনরূপ অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ মানুষের উপর কোন জুলুম হয়নি। কোন দ্রব্যসামগ্রী তালেবানদের প্রয়োজনে লুণ্ঠিত্ হয়নি, যা হয়ে থাকে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে যে কোন সময়ে বিজয়ীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর। বসনিয়া, গ্রোজনী ও ফিলিস্তিনে যা ঘটেছে তার ১% ও তালেবান অধিকৃত আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়নি। তবুও পাশ্চাত্যের বিশ্বমানবাধিকার লংঘিত হওয়ায় (?) ক্ষুব্ধ'।

তালেবানগণ কাবুল বা অন্য কোন প্রাদেশিক শহরের জনতাকে মেরে পিটিয়ে ঘরছাড়া করেনি, বরং তাদের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর জনসাধারণকে নিজ নিজ শহরে থাকতে অনুরোধ করেছেন। (সাপ্তাহিক নিউজ উইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬) তালেবানদের আগমনের পূর্বে যে কাবুল নগরীতে কোন শান্তি ছিল না, সেই কাবুল নগরী এখন শান্ত; জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে প্রশান্তি। তবুও পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবাধিকারওয়ালাদের নিকট কাবুল বসবাসের অনুপযুক্ত। কারণ তালেবানদের হৃদয়ে আছে ইসলামী চেতনা। দেহে ইসলামী পোশাক। মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের যুবক যুবতী, বুড়া বুড়িরা পর্যন্ত উরু দেখিয়ে চলাফেরা করে। ফ্রান্সের মতো সভ্য দেশে তারা শিশু মেয়েদের মাথায় রুমাল দেয়া সহ্য করতে পারে না। এটা হলো তাদের সহনশীলতার নমুনা।

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুফল কাবুলের বাজার তথা দ্রব্য সামগ্রীতে প্রতিদিনই প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। বাজারে এখন বেশি মানুষ দেখা যায়। জিনিসপত্রের বেচা-কেনা এখন অনেক বেড়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ একটি রুটির মূল্য ছিল ১,০০০ আফগানিয়া (৭সেন্ট) ২য় সপ্তাহে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫০০ আফগানিয়ায় (নিউজ উইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬, পৃঃ ১৪)।

তালেবানদের জনপ্রিয়তার বড় কারণ হলো তাদের ন্যায় বিচার। তারা যেখানেই যান, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন। কতকগুলো শাস্তি তারা প্রকাশ্যে দিয়ে থাকেন। বিবাহিত ব্যভিচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আইন করা হয়েছে, কিন্তু কোন শহরে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়েনি। চুরির জন্য হাত কাটার বিধান করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো হাত কাটার আদেশ হয়নি।

এক বছর পূর্বে তালেবানদের হাতে হেরাতের পতন হয়েছে। দু'বছর আগে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তালেবানগণ কান্দাহার দখল করেন। কিন্তু কোন ইসলামী বিধান অপপ্রয়োগের খবর পাওয়া যায়নি। ব্যভিচারের শাস্তি হত্যা এবং

চুরির শাস্তি হাত কাটার বিধান সৌদি আরবে কয়েক যুগ থেকে চলে আসছে। কিন্তু মৌলবাদের অপবাদ দিয়ে এভাবে তাদেরকে কলংকিত করা হয় না।

নারী অধিকার ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ কাবুল পতনের পর তিনটি বেপর্দা মেয়েকে তালেবানরা ঠেলা দিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী পত্রিকাগুলোতে খবর বের হয়েছে মেয়েদের লাঠি পেটা করেছে। সেরূপ মেয়েদের সংখ্যা সারা কাবুলে হলো মাত্র ৩ জন।

তালেবানরা মেয়েদের শালীন পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানকার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ চাদর ব্যবহার করছে, কেউ ব্যবহার করছে বোরকা। যদিও মহিলাদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণে বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাবুল রেডিও থেকে এটাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন কর্মজীবী মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি।

আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহিলাদের মধ্যে যারা অফিস করতে পারছেন না তাদেরকেও বেতন দেয়া হবে এবং বেতন বাড়ীতে পৌছে দেয়া হবে। ইসলামের দুশমনদের নিকট ধর্ষণ বা হত্যা মানবতা বিরোধী কাজ নয়, কিন্তু নারীদের ইজ্জত ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্মানজনক ব্যবস্থা করা তাদের নিকট মানবতা বিরোধী কাজ। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আনবিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের বৃহৎ নগরী নিউইয়র্ক বা লন্ডনের প্রকাশ্য রাস্তায় নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল ঘটনা ঘটে, তার একটিও তালেবান অধ্যুষিত এলাকায় ঘটেনি।

আফগানিস্তানে নারীদের অধিকারের কথা বলে পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষ। নারীদের প্রতি পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষদের দৃষ্টি ভঙ্গি কি? পরিবারে আয় বৃদ্ধির জন্যে বিবাহিত ভদ্র মহিলারাও স্বামী ভিন্ন অন্যদেরকে দেহ দান করে। পড়া লেখার খরচ আদায় করার জন্যে ১৮% কন্যার তাদের নিজের জন্মদাতা পিতাকে দেহদান করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৫ সালের ৩৪৭ পৃষ্ঠার অপরাধপরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫ সালে ভায়লেন্ট অপরাধ হয়েছে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একটি, হত্যা সংঘটিত হয়েছে মিনিটে একটি এবং নারী ধর্ষণ হয়েছে প্রতি ৫ মিনিটে একটি (দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট, ঢাকা, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬)। নারী অধিকার যে পাশ্চাত্যে এই মানের, তারা নারী অধিকার হরণের অজুহাতে তালেবানদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে।

তালেবান নীতিঃ তালেবানদের বয়স গড়ে ২৫-এর কোটায়। তাদের সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় হতে পারেনি। তালেবানদের সরকার প্রধান যে কে তা ঘোষিত হয়নি। তাদের নেতা মোহাম্মদ ওমর এটা সকলের জানা। আপাততঃ তিনিই তাদের আমিরুল মুমেনীন।

তালেবানরা কি করে এতো অল্প সময়ে অনেকটা বিনা বাধায় আফগানিস্তানের তিন চতুর্থাংশ এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল? তালেবানরা জোর করে এসব এলাকা দখল করেননি। স্থানীয় লোকেরা তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের বিরোধী অস্ত্রধারীরা জনতার রুদ্ররোষে পতিত হওয়ার ভয়ে তালেবানদের পথ ছেড়ে তাদের জন্য নিরাপদ স্থানে চলে গেছে।

কোন এলাকা দখলের পরই তালেবানগণ সেখানে একটা মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শুরাতে তালেবানদের ছাড়া রয়েছে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং গোত্রের প্রধানগণ। যারা যুদ্ধের পর তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারাও এ শুরার অন্তর্ভূক্ত হয়। এ শুরাই এখন এলাকার শাসন পরিচালনা করে।

দুনিয়ার কোন তথাকথিত সভ্য দেশে সরকার বা সরকার প্রধান না থাকলে এবং তরুণদের হাতে অস্ত্র থাকলে, তারা কি ধরনের লুট, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে; তা শুধু কল্পনা করে দেখতে হয়।

সূত্র ঃ এ.জেড.এম শামসুল আলমের গ্রন্থ

তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে এক ভক্ত মুসাফির

আফগানিস্তান নামটি যখনই শুনতে পেতাম তখনই মনের ভিতর কেমন একটা আগ্রহ আর কৌতুহল জন্মে উঠতো। বারবার ইচ্ছা হতো ছুটে যাই আফগানের মাটিতে। এই আফগানের মাটি যেন রঞ্জিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্তে। হারিয়েছে কত মা তার আদরের সন্তানকে, স্ত্রী হারীয়েছে স্বামীকে, বোন হারিয়েছে ভাইকে, ভাইহারা বোনের কান্না, সন্তানহারা মায়ের কান্না আফগানের আকাশ বাতাস একাকার করে তুলে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধকালীণ সময়ে হাজারো মা বোন ইজ্জত হারিয়েছে। ভায়ের সামনে বোনকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে হাজারো। এই জালিমদের নির্যাতনে আফগানের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। এগিয়ে এলো এক ঝাঁক মুজাহিদ। লক্ষ লক্ষ আফগান বীর সন্তান বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলো ইসলামের বিজয়। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানীতে আফগানের মাটি শত্রুমুক্ত হলো, ছিনিয়ে আনল তারা স্বাধীনতা। উড়ল বিজয়ের নিশান।

আফগান স্বাধীন হওয়ার পর সকল মুজাহিদ দলের সমন্বয়ে গঠিত হলো মন্ত্রী পরিষদ। দিন চললো ভালোই। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের ইশারায় এক মুসলমান আর এক মুসলমানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবেলা ময়দানে অবতীর্ণ হল। কায়েম করল এলাকাভিত্তিক সরকার। কিছুটা এমন 'জোর যার মুল্লুক তার'। এক এক কমান্ডার তার নিজ নিজ নিয়ন্ত্রিত এলাকতে ইচ্ছা মত শাসন

কায়েম করল। জুলুম নির্যাতন আবার বেড়ে গেল। চুরি, ডাকাতি, জিনা, ধর্ষণ আবার বেড়ে গেল আশংকাজনিতভাবে এক এক কমান্ডারের সহযোগীরা সাধারণ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিন খেলা শুরু করলো।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আফগান মজলুমদের দোয়া কবুল করলেন, এগিয়ে এলেন মোল্লা ওমর নামে আল্লাহর এক বান্দা। মাত্র দুই বছর পূর্বে মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে মোল্লা ওমর অন্যায়ের প্রতিবাদ, বাতিলের প্রতিরোধে এগয়ে আসেন। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে কাবুলসহ সমগ্র আফগানিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ এলাকা (২২টি প্রদেশ) নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সেখানে জারী করলেন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। ইচ্ছা করত একবার এই আফগানের মাটিতে গিয়ে আল্লাহর এই খাস বান্দার চেহারাটা দেখার। অবশেষে আল্লাহ সুযোগ করে দিলেন।

ঈদ উপলক্ষে ১০ দিনের দীর্ঘ ছুটি। অবকাশ যাপনের মানসে কোথাও যাবো ভাবছিলাম। পাঞ্জাবী এক বন্ধু পরামর্শ দিল আফগানে যাওয়ার এবং সে নিজেও আফগানিস্তান সফরের জন্য তৈরী হল। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে১৭.৪.৯৭ ইং রোজ বুধবার সফরের প্রোগ্রাম ঠিক হলো। চারজন সাথীর এক ক্ষুদে কাফেলা নিায়ে বিকাল ৪টায় করাচী থেকে বাসে চড়ে কোয়েটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রোগ্রাম এমনভাবে ঠিক হল যে, বেলুচিস্তানের কোয়েটা পর্যন্ত আমরা বাসে যাব, কোয়েটা তালেবান হাবেলী থেকে তালেবানদের গাড়ি আমাদের কান্দাহারে নিয়ে যাবে। ১৭.৪ তারিখ সকাল ৭ টার দিকে আমাদের জানানো হল বিশেষ কারণবশত আজ গাড়ি আসতে পারেনি, অন্য একটি গাড়িতে আমাদের পাকিস্তান সীমান্তে পৌছানোর ব্যবস্থা হল। ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পাকিস্তান সীমান্ত শেষ। আফগান সীমান্ত শুরু। বলদাক নামক স্থানে আমরা পৌছে ২০০/ পাকিস্তানী রুপি দিয়ে পেলাম ১১,১৩,৬০/ আফগানী মুদ্রা।

সকাল এগারোটা বেজে গেছে তখনও নাস্তা করা হয়নি। কিছুটা ক্ষুধা অনুভব করলাম। চার সাথী ৩০,০০০/ আফগানী দিয়ে হাল্কা নাস্তা করে নিলাম। একটি বড় রুটি ৪০০০ আফগানি, একটি চা তিন হাজার আফগানী, এরপর পাঁচ লক্ষ আফগানী দিয়ে একটি গাড়ী ভাড়া করে আমরা কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তার অবস্থা খুবই নাজুক। ড্রাইভারের কাছে জানতে পারলাম সমস্ত মাইন পোতা ছিল। রাস্তা খোদাই করে তালেবানরা মাইন তুলেছে কিন্তু এখনও রাস্তা মেরামতের কাজে হাত দিতে পারেনি। রাস্তার দু পাশে এখনও মাইন পোতা তাই কাঁটাতারের বেড়া দেয়া এবং লেখা আছে 'বিপজ্জক এলাকা'। গ্রামগুলোর দিকে তাকালে বুঝা যায় এর উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। কোন ঘর-বাড়ি এমন নেই যাতে বুলেট বা রকেটের আঘাত নেই। অধিকাংশ ঘর বাড়ি মাটির সাথে একাকার।

নওজোয়ান ড্রাইভারের কাছে প্রশ্ন করলাম তোমার বাড়ি কোন এলাকায় এবং এই যুদ্ধে তোমার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। বেচারা পশতুভাষী, তার ভাষা বুঝার উপায় নেই। উর্দু বুঝতে পারে অল্প কিন্তু বলতে পারে না। ভাগ্যিস আমাদের ক্ষুদ্র কাফেলার পাঞ্জাবী বন্ধু চার বছর যুদ্ধে ছিল। আফগানের পশতু ভাষা তার মোটামুটি বলতে পারে– সেই উর্দুতে অনুবাদ করে শোনালো। তার বাড়ি কান্দাহার। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সে নিজে তিন বছর জিহাদে শরীক ছিল। কিন্তু তার রক্তের দাগ মুছতে না মুছতে আবার নিজেদের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে সে শরীক হয়নি। তালেবান বিরোধীদের জুলুমের বর্ণনা দিয়ে বলল যে, সে তালেবানদের ভালবাসে এবং তালেবানের কামিয়াবী সে চায়। তালেবানদের ভালবাসার অপরাধে তার উপর বয়ে গেছে এক ঝড়। তার স্ত্রীকে তালেবান বিরোধীরা তুলে নিয়েছে। তার কোন খোঁজ আজও সে জানে না। সে বললো, আমি দোয়া করি আল্লাহ তালেবানদের কামিয়াব করুন।

পথে তালেবান পাহারা খুব কড়া। সব গাড়ি নিজ নিজ ডান দিক দিয়ে চলাচল করে। নামাযের সময় গাড়ি থামিয়ে নামায আদায় করা হলো। আমরাও যোহরের নামায আদায় করলাম। বিকাল তিনটায় আমরা কান্দাহারে পৌছলাম। সরাসরি গেলাম দারুল খেলাফত। যেখান থেকে তালেবান হুকুমত পরিচালিত হয়। ওখানে পরিচয় হল আমিরুল মুমেনিনের বিশেষ উপদেষ্টা মৌলভী ওকীল আহমাদের সাথে। মাল-পত্র রেখে আমরা পাশের মসজিদে গেলাম। যেখান নবী করীম (সাঃ)-এর জুব্বা মোবারক রাখা আছে। জিয়ারত নসীব হল। আসরের আযান হল। নামায আদায় করে দারুল খেলাফতে এলাম। মৌলভী ওকীল আহমদ সাহেব আমাদের তালেবান হেড কোয়াটার হোটেল কান্দাহারে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। রাস্তায় দেখতে পেলাম তালেবান নওজোয়ানরা গাড়ী নিয়ে টহল দিচ্ছে। আমাদের দেখে তারা জানতে চাইল কোথায় যাবেন, আমরা তাদের জানানোর পর তারা তাদের গাড়ীতে তুলে নিল এবং হোটেল কান্দাহারে তালেবান হেড কোয়ার্টারে পৌছে দিল।

এই হোটেল কান্দাহার কোন এক সময় বিলাস বহুল হোটেল ছিল, কিন্তু এখন তার আর সেই অবস্থা নেই। বোমা আর রকেট মেরে পুরো হোটেল ভবনের চেহারা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। তারপর হোটেলটি যখন তালেবানদের অধীনে আসে, শুরু হয় আরেক দফা হামলা। দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই, তিনতলা বিশিষ্ট এই হোটেলটি দেখলে মনে হবে তার শরীরে শুধু ইটই আছে। এই হোটেল কান্দাহারই প্রধান হেড কোয়াটার, সামনে কান্দাহার রেডিও সেন্টার।

আমরা প্রথমে দেখা করলাম তালেবান কমান্ডার মাওঃ রাশেদ-এর সাথে, তিনি বেতার বার্তা বিভাগের প্রধান, তখন তিনি ওয়ার্লেসের মাধ্যমে কাবুলে

কোন বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। আমরা রুমে প্রবেশ করার এক দুই মিনিটের ভেতর কথা শেষ করে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হলো। বয়স ৩৫ এর কাছাকাছি হাসিখুশী মানুষ। উনি আমাদের থাকার জন্য দুই তালেবান সাথী দিয়ে পাঠালেন। আমাদের জন্য একটি রুম দেয়া হল। মাগরিবের নামায আদায় করার পর আমরা বেশ কিছু সাথী এক কমান্ডরের কাছ থেকে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনছিলাম। এরই মধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন তালিবানদের মুখপাত্র (জরবে মুমেন) এর কান্দাহার প্রতিনিধি মৌলভী আহমাদ খালেদ আশরা। আহমাদ খালেদ এর আগমনে আরো খুশী হলাম, তার কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম। আমরা উনার মাধ্যমে পরিচিত হলাম উজিরে খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ জাহেরের সাথে।

এশার নামাযের পূর্বে আমাদের ডাক পড়ল রাত্রে খাওয়ার জন্য। পাশে এক কামরায় দস্তরখানা বিছানো হয়েছে। ২০, ২৫ জনের মত সাথীকে সাথে খানা খেতে বসলাম। আমাদের সাথে শরীক হয়েছেন পাঁচজন তালেবান কমান্ডার। যাদের মধ্যে দুইজন সদ্য রণাঙ্গন থেকে আসা। উনাদের কাছ থেকে খাওয়ার মাঝে ময়দানের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম। রুটি আর গরুর পায়া দিয়ে তৈরী এক প্রকার নিহারী। একটি রুটি দুই জনে পেট পুরে খাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলা হয়নি, আফগানে এখন খাবারের যথেষ্ট অভাব। যে সমস্ত এলাকাতে খাবার উৎপাদান হয় সেগুলো দোস্তম বা মাসুদশাহর দখলে। তাই তালেবান নিয়ন্ত্রীত এলাকাতে খাবারের অভাব দেখা দেয়। এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম।

আজ ঈদের দিন, বিদেশের মাটিতে ঈদ। এই ঈদের নামাজকে উদ্দেশ্য করেই আমাদের আফগান আসা। ফজরের নামাজ পড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে তালেবান কমান্ডারসহ আরো কিছু সাথী। একশত গজের মধ্যেই খাদ্য মন্ত্রণালয়। ওজারাতে খোরাকি। সেখানে আমরা কিছু তালেবান নেতাদের সাথে পরিচিত হলাম। উজিরে খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ জাহের সাহেব এখানে ছিলেন, উনার সাথ যেহেতু আমাদের গত কালই পরিচয় হয়েছে। ভেবেছিলাম উনার খিদমতে হাজির হয়ে আমি সালাম দিব কিন্তু পারলাম না। তিনিই আগে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মন্ত্রণালয়ের দফতরে কোন চেয়ার টেবিল নেই। দেখে মনে হয় ইসলামী যুগের কোন মন্ত্রণালয়। ঐ পরিবেশে ধনী গরীবের কোন ব্যবধান নেই। সবার জন্য দরজা উন্মুক্ত। মেঝেতে বিছানা পাতা, এখানে সবাই বসে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নিজেও। কান্দাহারে একটিই ঈদের জামাত হয় এবং নামাযের ইমামতি করেন আমিরুল মুমেনিন মোল্লা মোঃ ওমর। ঈদগাহ এখান থেকে প্রায়

এক মাইল দূলে। আমরা ভেবেছিলাম ঈদগাহে নিজেরাই যাবো কিন্তু উজিরে খোরাকী মৌলভী আবদুল্লাহ সাহেব আমাদেরকে তার নিজের গাড়িতে উঠালেন। সকাল ৭.৩০ মিঃ আমরা ঈদগাহ ময়দানে পৌছলাম। উজিরের গাড়ি হিসেবে রাস্তায় তার আলাদা কোন সুবিধা নেই। রাস্তার মোড়ে মোড় ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ল। ড্রাইভার একবার চেয়েছিল ঝামেলা এড়িয়ে বেড়িয়ে যাবে কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ ঘুরে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়ালেন এবং গাড়ি আটকে দিলেন।

শত শত তালেবানের কড়া পাহারায় তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত এক দিকে খোলা কান্দাহারের একমাত্র ঈদগাহ। সকাল সাড়ে সাতটায় পৌছে দেখি লক্ষাধিক লোকের সমাগম তখন ঘটে গেছে। বাস ট্রাক, ঘোড়ার গাড়ি, গাধা আর উটের পিঠে চড়ে মুসল্লিরা ঈদগাহের দিকে আসছে। ৮টা থেকে বয়ান শুরু হলো। কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা হাসান এর বদৌলতে প্রথম কাতারে বসার সুযোগ পেলাম। মোট চারজন বক্তা বয়ান রাখলেন। যাদের মধ্যে মোল্লা জালালউদ্দীন (পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী), মোল্লা হাসান (গর্ভনর কান্দাহার), মোল্লা নাজির (প্রধান বিচারপতি) মোল্লা মোঃ ওয়াকিল (আমিরুল মুমেনিনের বিশেষ উপদেষ্টা)। সকলেই পশতু ভাষায় বয়ান রাখলেন। মাঝে মাঝে 'জরবে মুমেন'-এর প্রধান প্রতিনিধি আহমদ খালেদ আমাদের উর্দুতে তরজমা করে শুনালেন। খোলা আকাশের নীচে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগন। রোধ আর গরমে বেশীক্ষণ অবস্থান করা সত্যিই খুব কঠিন। তারপরও মানুষের মধ্যে একটা খুশির জোয়ার।

হঠাৎ দেখা গেল পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়ির একটা বহর আসছে। সকলের মধ্যে খুশির মাত্রা বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে গাড়ির বহরটি কাছে চলে এল। সামনে পুলিশের গাড়ি। সাদা পোশাক পরা পুলিশ বাশি বাজিয়ে রাস্তা পরিস্কার করতে করতে ছুটে আসছে। তারপর তালেবানদের ৫/৬টি জীব, তার পিছনে আমিরুল মুমেনীন মোল্লা মোঃ ওমরের গাড়ি। আমরা সকলেই পলকহীন দৃষ্টিতে আমিরুল মুমেনীনকে দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। ভাবছি তিনি দেখতে কেমন হবেন, কি পোশাক পরিধান করবেন, এই ধরনের চিন্তা মাথায় খেলছিল। সকলে গাড়ি থেকে নামলেন। আমার কৌতুহলী দৃষ্টি আমীরুল মুমেনীনকে খুঁজছিল ? আহমদ খালেদ ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আপনার সামানের কাতারে যিনি বসলেন ইনিই আমিরুল মুমেনীন। ইতিহাসে আমিরুল মুমেনীন শব্দটি পেয়েছি; কিন্তু বাস্তবে একজন সত্যিকার আমীরকে দেখার সুযোগ হয়নি। এ যুগে আমীরুল মুমেনীন হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা মোল্লা ওমরের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিদ্যমান।

নিতান্তই সাধারণ বেশভুষা। বাদামী রঙের পায়জামা পাঞ্জাবী একটি চাদর ঘাড়ে, মাথায় কালো পাগড়ী, দীর্ঘদেহী, মাঝারি স্বাস্থ্য। ডান চোখটি অন্ধ। দৃষ্টি নীচের দিকে। তাকবীরে তাকবীরে কান্দাহারের আকাশ পাতাল কেপে উঠলো। খুশিতে মানুষ পাগরের মতো হয়ে উঠলো। অনেক কষ্টে পরিবেশ শান্ত হলে।

সাড়ে দশটায় নামাযে দাঁড়ালেন মোল্লা ওমর (আমিরুল মুমেনীন), নামাযের ইমামতি করলেন। নামায শেষে আমিরুল মুমেনীন করাচীর বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া মাদানীকে খুৎবা পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমেই বলেছি প্রচণ্ড গরমে শরীরে কাপড় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। আমিরুল মুমীনিন আসার ১০ মিঃ পর আকাশে মেঘমালারা ছায়া বিস্তার করে দিল এবং ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হল। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কোনো অসুবিধা হয়নি।

নামায শেষে আমিরুল মুমেনীনকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। কিন্তু তেমন কোন ফায়দা হলো না। মানুব জীবন বাজি রেখে হলেও আমিরুল মুমেনীন মোল্লা ওমরকে দেখতে চায়। নামাযের পর আমিরুল মুমেনীনকে বহনকারী গাড়িসহ যখন গাড়ির বহরটি ময়দান ত্যাগ করছিল হাজার হাজার মানুষ আমিরুল মুমেনীন এর গাড়ির পিছনে দৌড়াতে থাকে। শত বাধার দেয়াল টপকেও আমিরুল মুমেনকে দেখতে চায়। কান্দাহারবাসী যেন হারতে চায়না এই মহান বীর সন্তান মোল্লা ওমরকে।

দীর্ঘ ১৪ বছর যুদ্ধের পর আজ কান্দাহার তথা আফগানবাসী মন খুলে হাসছে। ইচ্ছা মত চলতে পারছে। নেই কোথাও কোন বাধা। নেই চাঁদাবাজী। নির্যাতনের সেই স্টিম রোলাও আজ নেই। ইসলামের পতাকাতলে সকলে সমবেত। বিরাজ করছে অনাবীল শান্তি। শহীদের মা এক সন্তান হারিয়ে পেয়েছে হাজার হাজার বীর তালেবান। এদের দেখলেই সন্তানহারা মা তার সন্তানের দুঃখ ভুলতে পারছে। আল্লাহ হাজার হাজার তালেবান জানবাজদের ত্যাগ ও কুরবানী কবুল করুন। আমরা তালেবান নেতাদের সাথে মিলিত হ়াম। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মোল্লা হাসান গভর্ণর, কান্দাহার, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মোল্লা গাউস, প্রধান বিচারপতি মাওলানা নাছির।

নামায শেষ হওয়ার পর আমাদের উজিরে খোরাকী নিজ গাড়িতে করে তালিবান হেড কোয়াটারে নিয়ে আসলেন। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু তালেবান সাথী নিয় বের হলাম। এক জায়গায় কিছু লোকের সাথে পরিচয় হল যারা রাশিয়ার সৈন্য ছিল। আফগানে তারা যুদ্ধ করতে এসেছিল। কিন্তু যুদ্ধে মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। মুজাহিদদের ব্যবহার দেখে তারা মুসলমান এবং বর্তমানে আফগানে শাদী করে সেখানেই জীবন যাপন করছে। এদের একজন মেজর করফ। বর্তমান নাম আঃ রহমান। সে আমাদের জানালো যে, আমরা এখন তালেবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করছি তালেবান বিরোধীদের সাথে। ববি নামের এক তরুণ সৈন্য জানালো (বর্তমান নাম, হোযাইফা) আমি জীবনে যা হারিয়েছি, পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সব চেয়ে বড় পাওয়া আমি এখন মুসলমান।

নারী-পুরুষ, যুবক, তরুণ, মজদূর, কৃষক সকলেই তালেবান শাসনে খুশি। তারা বলল তালেবানরা দেরী করে ফেলেছে। আরো আগেই তাদের উচিত ছিল আমাদের দায়িত্ব নেয়া। কান্দাহারে এখন কোন বিল্ডিং নেই যার গায়ে বুলেটের আঘাত নেই। ভিসিআর, ডিশ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাস্তায় বেপর্দা মহিলাদের দেখা যায় না। পর্দার সাথে সেদেশের নারীরা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।

বিকাল ৬টায় আমরা আমিরুল মুমেনীনের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দোয়ার আবেদন করে উনার খেদমত থেকে বিদায় নিলাম। তিন দিন পর আমরা করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তালেবান একটি গাড়ি আমাদের বাস ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কমান্ডার তারেক আামাদের বিদায় জানালেন। আমরা আফগান সীমান্ত পর্যন্ত একটি ট্যাক্সি করে রওনা হলাম। খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চলছে। দেখে আসা স্মৃতিগুলোর ভাবনায় ডুবে গেলাম। হঠাৎ ড্রাইভারের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। ড্রাইভার জানতে চাইল কোথেকে এসছি এবং কি জন্য এসেছি। আমরা জানালাম, করাচী থেকে এসেছি। আফগান মুসলমানদের অবস্থা দেখার জন্য। সে প্রশ্ন করল, জিহাদে শরীক হয়েছি কি না এবং এসেই চলে যাচ্ছি কেন? তার প্রশ্নে কোন উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বললাম আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমরা জানতে চাইলাম সে শরীক হয়েছে কিনা? সে জানালো, আমি নিজে জিহাদে শরীক হয়েছি এবং আমার ডান হাত শহীদ হয়েছে। আমরা এতক্ষণ খেয়ালই করিনি যে, তার ডান হাতটি নেই। সে আরো জানালো, একই জিহাদে তার আপন দুই ভাই শহীদ হয়েছে। তিনটি পরিবার এখন তার উপর নির্ভরশীল। তাই গাড়ি নিয়ে তাকে রাস্তায় নামতে হয়েছে। তিন ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে আমরা আফগান সীমান্ত বরাবর চলে এলাম। ভাড়া চুকিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমাদের কোরবানী কবুল করুন এবং আমাদেরকেও তওফিক দান করুন। সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ রিয়াজ উদ্দীন খানের নিবন্ধ

নির্ভেজাল ইসলামী শক্তির বিস্ময়কর উত্থান, সমগ্র আফগানিস্তানে তালিবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা মোবারক হোক

সুদীর্গ ১৪ বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও নজীরবিহীন সাহসী প্রতিরোধ লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় ও স্বাধীনতা আফগান মুসলিম জাতির শত বছরের সেরা প্রাপ্তি। বিশ্বের অন্যতম এবং বৃহৎ পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে পর্যুদস্ত করে আফগান মুজাহিদরা এ শতকের শ্রেষ্ঠ সমরশক্তি হিসেবে, সঞ্জীবিত জাতি রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এ অন্যায় ও পাশবিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায় সোভিয়েত সাম্রাজ্য। লণ্ডভণ্ড হয়ে হয়ে যায় তাদের শখের সৌধ। "ক্রেমলিন"। দীর্ঘ ৭০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায় ৬টি মুসলিম মধ্য এশিয়ার রাজ্য। নতুন সাজে সজ্জিত হয় বিপ্লবী চেচেন যোদ্ধারা।

প্রদর্শনকরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অনুপম দেশপ্রেম ও আগ্রাসন বিরোধী কঠোর কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রাম।

বিজয়ী আফগানিস্তানে নতুন সরকার কায়েম হলেও বহিঃশক্তির কূটনৈতিক চাল আর পুরনো কমিউনিস্ট জেনারেলদের সংঘাতমূলক কার্যক্রমের দরুন সেখানে স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চলছে একের পর এক লড়াই। মানুষ হয়ে উঠে নিরাপত্তাহীন ও হতাশ। এক সময় জেগে উঠেন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম। তওহীদি জনতার সমর্থন ও ভালোবাসা সাথে নিয়ে আলেম সমাজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা (তালিবান) সংস্কারমূলক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।

মাত্রা ২২ মাসে দখল করে নেন আফগানিস্তানের ৮০ ভাগ অঞ্চল। গত বছরের শেষ ভাগে তারা দখল করে রাজধানী কাবুল। বর্তমানে বিপ্লবী তালিবান নেতা কান্দাহারের মাদ্রাসা শিক্ষক মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নেতৃত্ব দিচ্ছেন আফগান জাতির। সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রব্বানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ ও কমিউনিস্ট জেনারেল রশিদ দোস্তাম কাবুল ছেড়ে আশ্রয় নেন সীমান্তবর্তী মাজার-ই শরীফ, পানশির ও ফারইয়ার প্রদেশে। ইরান মধ্য এশিয়ার দু'একটি দেশের সহায়তায় তারা কিছুদিন টিকে ছিলেন। ভারতও যথাসম্ভব সহায়তা দিয়ে তাদের বিজয়ী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তালিবান অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানে গত সপ্তাহে তারা চূড়ান্তরূপে পরাভূত হয়েছেন বেং রাব্বানী তাজিকিস্তানে, দোস্তাম তুরস্কে পালিয়ে গেছেন। আহমদ শাহ মাসুদ পানশিরে অজ্ঞাতস্থানে আত্মগোপন করে আছেন বলে খবরে প্রকাশ।

ইতোপূর্বে তালিবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক বলেছিলেন, আমাদের ছাত্ররা তো নিয়মিত যোদ্ধা নয়। প্রচণ্ড তুষারপাতের সময় তারা অভিযান চালাতে পারছে না। শীত শেষে আমরা যখন পানশির ফারিয়াব ও মাজার-ই শরীফে আক্রমণ চালাবো, তখন দু'সপ্তাহের মধ্যেই গোটা আফগানিস্তান আমাদের দখলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। সত্যিই গ্রীষ্ম শুরু হওয়া মাত্রই তালিবানরা সমগ্র আফগান ভুমির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিলো।

এ নিবন্ধ তৈরীর সময় পর্যন্ত এ বিজয়াভিযান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়, আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত পন্থী তালিবানদের হাতে উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি মাজার-ই শরীফের পতন ঘটেছে। তালিবানরা ট্যাংক ও জীপে করে মাজার-ই শরীফে প্রবেশ করেন। এর ফলে গোটা আফগানিস্তান কার্যত তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসল। তালিবান যোদ্ধা ও দোস্তামের স্বপক্ষ ত্যাগী সৈন্যরা মাাজর-ই শরীফে সাদা পতাকা উড়ান এবং দোস্তামের বিশাল বিশাল পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন। মাজার-ই শরীফ তালেবান বিরোধীদের অন্যতম শেষ ঘাঁটি।

মাজার-ই শরীফ দখলের ফলে তালিবানদের প্রতিরোধ করার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল থেকে বিতাড়িত সাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন ঘাঁটি রইল না। মাজার-ই শরীফ দখলের ফলে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের পর এই প্রথমবারের মত আফগানিস্তান একটি মাত্র সরকারের শাসনাধীনে আসলো। তালিবানরা গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দীন রাব্বানীর সরকারকে উৎখাত করে কাবুলসহ দেশের ৮০% এলাকার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। দোস্তামের স্বপক্ষ ত্যাগী সৈন্যদের সহায়তায় তীলবানরা দোস্তামের নিজ শহর ও সেনা সদর দপ্তর শেবেরগান দখলের কয়েক ঘণ্টা পরই মাজার-ই শরীফের পতন ঘটলো।

এর আগে তালিবানরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তামের সর্বশেষ ঘাঁটি মাজার-ই শরীফ– যা তিন বছর ধরে তালিবানরা দখল করে নেয়ার চেষ্টা করছেন, সেখানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দোস্তামের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সৈন্যরা মাজার-ই শরীফ থেকে প্রায় ৮০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত দোস্তামের নিজ শহর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক সদর দফতর শেবেরগান দখল করে নিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে শত শত লোক রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তালিবানরা মাজার-ই শরীফে পৌছে যেতে সক্ষম হলে সেপ্টেম্বরে কাবুল থেকে বিতাড়িত সাবেক সরকারের প্রতিরোধের তেমন কোন ঘাঁটি থাকবে না। এর ফলে প্রথমবারের মত তালিবানরা সমগ্র আফগানিস্তানকে তাদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হবেন। ইসলামী হুকুমতপন্থী তালিবানদের মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ বলেন, দু'টি বিমান কমান্ডার আবদুল মালেকের নিয়ন্ত্রাণাধীন উত্তরাঞ্চলীয় ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মাইমানায় অবতরণ করে। তৃতীয় বিমানটি আফগান রাজধানী কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তালেবানদের কান্দাহার ঘাঁটি থেকে জনাব আহমদ বলেন, উক্ত পাইলটগণ দোস্তামের ঘাঁটি মাজার-ই শরীফ থেকে বিমানগুলো নিয়ে আসেন।

তিনি বলেন, স্বপক্ষত্যাগী পাইলটগণ চলে আসার সময় জোযজাং প্রদেশে দোস্তামের সাইবারখান সদর দফতরের বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করে। পরে স্বপক্ষত্যাগী পাইলটগণ তালিবানদের সদর দফতরে সাংবাদিকদের বলেন, 'দোস্তামের পরিকল্পনা হচ্ছে আফগানিস্তাকে ধ্বংস করে ফেলা। সেজন্য তারা দোস্তামের পক্ষ ত্যাগ করেছেন। পাইলট জেনারেল ইউসুফ শাহ বলেন, 'তাজিক, উজবেক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজনসহ সবাই উত্তরাঞ্চলে তালবানদের বিজয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন।' পশতুন জাতিগোষ্ঠীর লোক ইউসুফ শাহ বলেন, তিনি তার এল-৩৯ জঙ্গী বিমানটি মাজার-ই শরীফ থেকে নিয়ে আসেন এবং তাদের আসার পথে সাইবারখানের আশপাশে দু'টি বোমা বর্ষন করেন। তিনি

স্বপক্ষত্যাগী অপর দু'জন পাইলটকে জেনারেল আব্দুল হাফিজ ও জেনারেল আবদুল জলিল বলে সনাক্ত করেন। তবে তার কোন ধরনের বিমান সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তা তিনি বলতে পারেননি।

গত সোমবার ফারিয়ার প্রদেশ দোস্তামের বিরুদ্ধে কমান্ডার আবদুল মালেকের বিদ্রোহ ঘোষণার পর এই তিনজন স্বপক্ষ ত্যাগ করলেন। এই বিদ্রোহের ফলে রাজধানী কাবুলসহ দেশের ৮০% অঞ্চল দখলকারী তালিবানদের পক্ষে দেশের আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ প্রশস্ত হল। আফগানিস্তানে তালিবানদের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। তারা তাদের প্রতিপক্ষের সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি মাজার-ই শরীফ দখলের একদিন পর ২৫ শে মে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশের গোটাটা দখল করে নিয়েছেন। এদিকে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সমগ্র অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ নেতা জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম তার নিজ শহর ও সেনা সদর দপ্ত শেবেরগান ও মাজার-ই শরীফের পতনের পর গতকাল তুরস্কে পালিয়ে যান এবং সবেক আফগান প্রেসিডেন্ট বুরহান উদ্দিন রাব্বানী ইরান পালিয়ে গেছেন। তালিবানদের এই বিজয়ের ফলে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসান ঘটার পর এই প্রথম আফগানিস্তান কার্যত একটি একক সরকারের নেতৃত্বে চলে আসল। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, তালিবানদের বিজয় আর কেউ ঠেকাতে পারবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গওহর আইয়ুব খান বলেন, তার বিশ্বাস তালিবানরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দেশের সম্পূর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি বলেন, তিনি মনে করেন যে, তালিবানদের পক্ষে এখন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রায় সবারই সমর্থন এসে গেছে। তিনি বলেন, তিনি আশা করছেন যে, জাতিসংঘ এই সরকারকে স্বীকৃতি দেবে। পাকিস্তানভিত্তিক আফগান বার্তা সংস্থা আফগান ইসলামী প্রেস জানায়, তালিবান মুজাহিদরা রাজধানীসহ সমগ্র কুন্দুজ প্রদেশ বলতে গেলে বিনা বাধাতেই দখল করে নিয়েছেন। তালিবানদের এই অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার প্রেক্ষিতে বিশ্ববাসীর নজর এখন আফগানিস্তানের দিকে। যুক্তরাষ্ট্র গত শনিবার তালিবানদের প্রতি যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, "আমরা মাজর-ই শরীফের পতনের খবর জানতে পেরেছি। আমরা পরিস্থিতি ঘণিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। তবে আফগানিস্তানে কোন মার্কিন কর্মকর্তা না থাকায় সেখানের প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে তা বলা মুশকিল।

তিনি বলেন, "একটি ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কেবল আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা

আসতে পারে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র কোন আফগান উপদলকে সমর্থন করে না। যদিও তার সাথে প্রত্যেকের যোগাযোগ রয়েছে।"

এদিকে তালিবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ গাউস গতকাল মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংগে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি ইসলামী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আফগানিস্তানে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিব শমশের আহমদকে অবহিত করেন। জনাব শমশের বলেন, "পাকিস্তান আফগানিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" তালিবানদের অগ্রযাত্রায় রাশিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাশিয়া এক বিবৃতিতে সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে আফগানিস্তানের এই সংঘাত বিস্তার লাভ করলে সে হস্তক্ষেপ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, রুশ নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথের (সিআইএস) সীমানা লংঘন করা হলে সিআইএস-এর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুক্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হবে।"

রাশিয়া এই আশংকা দূর করার জন্য তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আমি বিশ্ববাসী ও প্রতিবেশী দেশগুলোকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তালিবান সরকার অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলছে।" বার্তা সংস্থা এপিপি একথা জানায়।

তালিবানরা মাজার-ই-শরীফের নিয়ন্ত্রন গ্রহণের পর সেখানে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মনোযোগী হন। তালিবান সেনা কর্মকর্তা মজিদ রোজি বলেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা দোকান পাট খোলা রাখুন। আপনারা সবাই নিরাপদে আছেন।" লুটপাটের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও রাস্তাঘাট শান্ত রয়েছে।

জনাব রোজি কয়েকশ' পুরুষ ও মহিলার এক সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'কেউ আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করলে সোজা আমাদের কাছে এসে জানাবেন।"

কমান্ডার গাউস রাসুল বলেন, "আমরা এই নগরীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। আফগানিস্তানের তালিবান যোদ্ধারা ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দীন রব্বানীর সাবেক ঘাঁটি তাখার প্রদেশ দখল করে নিয়েছেন। গত ২৮ মে কাবুলে একজন তালিবান মুখপাত্র একথা বলেন। এদিকে মুসলিম বিশ্বে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সওদী আরব তালিবানদের আফগানিস্তানের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাবুলে তালিবান মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ বলেন, 'তাখারের সব বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় আফগান ইসলামী

সরকারের সাদা পতাকা উড়িয়েছে। ইন্টারফ্যাক্স বার্তা সংস্থা তাকিকিস্তানের রাজধানী দুশানেব থেকে জানায়, ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দীন রব্বানী প্রথমে তাজিকিস্তানে ও পরে সেখান থেকে ইরানে পালিয়ে যান বলে জানা গেছে। কাবুলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে তালিবানরা বলেন, তারা দেশের প্রায় সমগ্র অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই তাদেরকে দেশের বৈধ সরকার বলে সকলের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। তালিবানরা বিদেশী সরকারগুলোর প্রতি কাবুলে তাদের মিশন পুনরায় খোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, 'আফগানিস্তানের ইসলামী সরকার যেসব দেশকে দূতাবাস খুলতে এবং দেশের পূণর্গঠনে সাহায্য করবে, তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে।

বিবৃতিতে জাতিসংঘ ও ওআইসির প্রতিও আফগানস্তানের তালিবান সরকারকে বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানানো হয়েছে। সউদী আরব গত ২৬ মে সোমবার তালিবানদের বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর আগে পাকিস্তান তালিবানদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সউদী আরবের তথ্যমন্ত্রী ফুয়াদ ইবনে আব্দুস সালাম আল-ফারসী বলেন, 'মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে আফগানিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনার পর সউদী আরব তালিবান সরকারকে স্বীকৃত দেয়ার সিন্দান্ত নেয়।

জেদ্দায় মন্ত্রীপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকের পর মন্ত্রী বলেন, 'সউদী সরকার আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আফগানিস্তানের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে সক্ষম হবেন।

গত সপ্তাহের আফগান পরিস্থিতি গোটা বিশ্ব সমাজের দৃষ্টিকে তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ এবং গোটা বিশ্বের সকল রাষ্ট্র তালিবানকে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার প্রশ্নে এখন চরম দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগছে। তালিবান আজ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এক অপ্রতিরোধ্য দুর্জেয় শক্তি।

বাংলাদেশের তওহীদি জনতা, আলেম-সমাজ, পীর-মাশায়েখ, রাজনীতিবিদ ও ইসলামপ্রিয় সাংবাদিকরা তালিবানের অগ্রযাত্রায় আনন্দিত। ৩০শে মে শুক্রবার ঢাকায় সর্বস্তরের ওলামাদের অংশ গ্রহণে তালিবানদের সমর্থনে এক শুকরিয়া মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দেশবাসী তালিবান উত্থানকে অন্তর থেকে মুবারকবাদ জানায়।

বিজয়ের শেষ বাঁকে তালিবান

শীতের মৌসুমে হিন্দুকুশ পর্বত বরফে ঢাকা থাকার কারণে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৯৭ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তর আফগানিস্তানে তালিবান অগ্রযাত্রা কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে দোস্তামের এলাকায় তালিবানদের চাপ বাড়তে থাকে।

কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, হেকমতিয়ারের ঘাঁটি জাবালুস সিরাজ ইত্যাদি দখল করতে অস্ত্র বা রক্ত বেশী খরচ করতে হয়নি। তালিবানদের আচার-আচরণ, জীবন-যাত্রা, নিষ্ঠা ও ইখলাস দেখে বিরোধী দলের সেনারা তাদের মুখোমুখি হলেই দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রায় স্থানেই দেখা গেছে যে মুজাহিদ সৈন্যগণ বলতে গেলে বিনা যুদ্ধেই তালিবানদের পথ ছেড়ে দিয়েছেন।

জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তাম ভাবলেন, তাঁর অঞ্চলেও তালিবানদের বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয়ের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এই আশংকায় তিনি স্বপক্ষ ত্যাগী সন্দেহভাজনদেরকে অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

সাদ্দাম হোসেনের ন্যায় আব্দুর রশীদ দোস্তাম তাঁর সন্দেহভাজন জেনারেলদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে অপসারণের নীতিও অনুসরণ করেন। অনেককেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। এতে তার সেনাপতিগণও ভীত হয়ে পড়েন।

সাবেক উজবেক জেনারেল আবুদল মালিক পাহলোয়ানের ভীতির কারণ ছিল আরো বেশী। কারণ, তাঁর ভাই জেনারেল রাসূল পাহলোয়ানকে দোস্তাম ১৯৯৬ সালে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করেন। তার সঙ্গে দোস্তামের মতপার্থক্য এবং নীতিগত বিরোধিতা ছিল।

আব্দুল মালিক ভয় পেলেন যে, ভ্রাতৃস্নেহে দুর্বল সন্দেহে বিনা দোষে দোস্তামের বজ্রপাত তার মাথার উপর নিপতিত হতে পারে। নিজের অনিশ্চিত পরিনতির কথা ভেবে তিনি স্বীয় সেনা কমান্ডার এবং আত্মীয় গুল মোহাম্মদ পাহলোয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তালিবানদের পক্ষে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গুল মোহাম্মদ পাহলোয়ান তালিবান পক্ষ সমর্থনের শপথ নিয়ে স্যাটেলাইট টেলিফোনে তালেবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দোস্তাম বাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দেন। আতঙ্কগ্রস্ত দোস্তাম বাহিনীর এক অংশকে গ্রেফতার করে তালিবান বাহিনীর নিকট সমর্পণ করে তালিবানদের আস্থা অর্জন করে। বন্দীদেরকে তিনি কান্দাহারে পাঠিয়ে দেন।

তালিবান সরকার দোস্তাম ছাড়া অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা এবং গ্রেফতারকৃতদের ইসলামী আদালতে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এতে দোস্তাম বাহিনীর সেনারা মনে করেন যে, আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তের আদালতে শাস্তি পেয়ে জাহান্নাম যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম।

জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান ঃ ১৯শে মে ১৯৯৭ সোমবার দোস্তাম-রাব্বানী জোট ত্যাগ করে জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তামের ঘনিষ্ট সহকর্মী এবং জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান তালিবানদের স্বপক্ষে তাঁর সমর্থন জনসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনীসহ তালিবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ সম্পর্কে জেনারেল আব্দুল মালিক বলেন যে, জাতীয় ঐক্যের খাতিরেই তিনি আবদুর রশিদ দোস্তামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দুটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই আছে। তিনি দোস্তাম বাহিনীর পাঁচ হাজার সৈনিককে বন্দী করেছেন বলেও দাবী করেন। তালিবান সরকারের অস্থায়ী তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকী ২০শে মে ১৯৯৭ কাবুলে এক সরকারী সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জেনারেল আবদুল মালিকের সেনা বাহিনীকে ইসলামী সেনা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মায়মানা শহরে তালিবান এবং উজবেক সৈন্যদের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

ফারিয়ার প্রদেশ দখল ঃ তালিবান বাহিনী ১৯শে মে ১৯৯৭ ফারিয়ার প্রদেশের রাজধানী মায়মানা প্রবেশ করলে সেখানকার জনগণ জনতা ফারিয়াব প্রদেশে তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। ফারিয়ায় প্রদেশ ছিল জেনারেল আবদুল মালিকের প্রভাবাধীন এবং মাজার-ই-শরীফের পথে প্রধান ঘাঁটি। মাজার-ই-শরীফের আক্রমন করতে হলে ফারিয়ায় প্রদেশের রাজধানী মায়মানা হয়েই যেতে হয়। ফারিয়াবের পতনের ফলে তালিবানদের পক্ষে মাজার-ই-শরীফ আক্রমণ করা খুবই সহজ হয়।

শেবিরপাশ, বাদগিস ও সার-ই-পুল প্রদেশ দখল ঃ সালাংপাশ এর ন্যায় মাজার-ই-শরীফের পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ হলো শেবিরপাশ। ফারিয়ার প্রদেশে ৬ মাসের বেশী সময় তালিবান বাহিনী জেনালের আবদুল মালিক পাহলোয়ান এবং শিয়া হেজবে ওয়াহদাত নেতা ইসমাইল খান তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। প্রায় ৭-৮ মাস যাবত যুদ্ধ করে তালিবান বাহিনী বাদগিস প্রদেশের অর্ধেক দখল করে নিয়েছিল।

জেনারেল আবদুল মালিকের স্বপক্ষ ত্যাগের গোষণার সাথে সাথেই বাদগিস প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে। তালিবান বাহিনী স্বল্প চেষ্টায় বাদগিস প্রদেশের বাকী অর্ধেক দখল করে নেয়। ১৯শে মে সোমবার তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস।

ফারিয়ার প্রদেশে শেবিরপাশের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিয়াপন্থী হিজবে ওয়াহাফাত গ্রুপের হাতে। তাদের সঙ্গে তালিবান বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে। এতে শতাধিক

লোক নিহত হয় এবং শত আহত হয়। ফারিয়ার প্রদেশ এবং শেবিরপাশ তালিবানদের হাতে এসে যাওয়ায় হেরাতের সাবেক গভর্নর ইসমাঈল খানের পক্ষে ইরানে পলায়ন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ১৯শে মে, ১৯৯৭ সোমবার বাদগিশ প্রদেশ দখল করে তালেবান এবং জেনারেল মালিক বাহিনী কর্তৃক দোস্তাম বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হয়। মাজার-ই-শরীফের দিকে তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

সেনা সদর দপ্তর শেবেরগাণের পতন ঃ জেনারেল আবদুল মালিকের স্বপক্ষ ত্যাগের ফলে আব্দুর রশিদ দোস্তামের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি পলায়নের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন। ১৯শে মে, ১৯৯৭ ফারিয়ার সার-ই-পোল, বাদগিস প্রদেশ তালিবান কর্তৃক দখল হওয়ার পর জেনারেল দোস্তাম ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে তাঁর নিজ শহর এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতর শেবেরগানে চলে যান। এ শহরটি বালখ সংলগ্ন পশ্চিমে জাউজান প্রদেশে অবস্থিত। শেবেরগানের চারদিকে রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। দোস্তাম শেবেরগানের একটি রেষ্ট হাউজে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও খবর বের হয়।

১৯শে মে মায়মানা ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী পতনের ৫ দিন পর ২৪মে, ১৯৯৭ শনিবার কাবুল হতে ৮০ মাইল পশ্চিমে সেনাসদর দফতর শেবেরগনের পতন ঘটে। শেবেরগনের পতনের পর বালখ প্রদেশের যুদ্ধবাজ নেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম পলায়ন করেন।

শেবেরগান পতনের পর মাজার-ই-শরীফের জনগণের মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি হয় এবং দোস্তাম বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মাজার-ই-শরীফের জনগণ ভয় করে যে, সেনা সদর দপ্তর তালিবান দখলের পর দোস্তাম সেনারা মাজার-ই-শরীফকে তাদের শেষ ঘাঁটি বানাবার চেষ্টা করবে। ফলে নগরীতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। তাই জনগণ স্বতঃপ্রবৃত হয়ে মাজার-ই-শরীফের রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তিনটি সামরিক বিমানের ডিফেকশান ঃ শেবেরগান পতনের পর দোস্তামের বিমান বাহিনীর তিনজন সিনিয়র পাইলট ইউসুফ শাহ, আবদুল হাফিজ এবং আব্দুল জলিল স্বপক্ষ ত্যাগ করে তালিবানদের পক্ষে যোগ দেন।

মাজার-ই-শরীফ বিমান ঘাঁটি থেকে পাইলট জেনারেল আবুল হাফিজ এবং আবদুল জলিল তাদের বিমান নিয়ে ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মাইমানায় অবতরণ করেন। পশ্তুভাষী ইউসুফ শাহ তাঁর এল-৩৯ জঙ্গী বিমানটি নিয়ে কান্দাহারে চলে আসেন। আসার পথে তিনি রাউজান প্রদেশের সেনাসদর দপ্তর সেবেরগান বিমান ঘাঁটতে কয়েকটি বোমাবর্ষণ করেন। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত বিমান ঘাঁটি রক্ষীরা কোন বিমান বিধ্বংসী কামান দাগেনি।

কান্দাহারে তালিবান সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউসুফ শাহ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, "তাজিক, উজবেক এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজন উত্তরাঞ্চলে তালিবান বিজয়ের অপেক্ষায় আছে। (এপি, এএফপি ২৪-০৫-১৯৯৭) ইনকিলাব ২৫-০৫-১৯৯৭)।

কুন্দুজ প্রদেশের পতন ঃ ২৪শে মে শনিবার মাজার-ই-শরীফ পতনের পরদিনই ২৫শে মে, ১৯৯৭ রবিবার তালিবানরা কুন্দুজ শহর দখল করে নেয়। এদেশের সর্বত্র তালিবান সৈনিক যেখানে প্রবেশ করতে পেরেছে সর্বত্রই তারা স্থানীয় জনগণের মুবারকবাদও উষ্ণ সমর্থন পান। পুরো প্রদেশটি বিনা যুদ্ধে তালিবান দখলে এসে যায়। (এপি, এফপি, রয়টার, বিবিসি ২৫-০৬-১৯৯৭)

মাজার-ই-শরীফ ঃ দোস্তামের পলায়নের খবর শোনার পরই মাজার-ই-শরীফের জনগণ স্বস্ব অঞ্চলে তালিবানদের সাদা পতাকা উত্তোলন করেন। নিকটস্থ তালিবান সেনারা বিনা বাধায় মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করেন।

২৪শে মে ১৯৯৭ শনিবার দোস্তামের নিজ শহর এবং সেনা দপ্তরের পতনের পর মাজার-ই-শরীফে প্রথম প্রবেশ করে উজবেক সেনাপতি জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান এর সৈন্যদল।

দলে দলে সেনাদের আত্মসমপর্ণ ঃ তালিবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমর বিরোধী নেতাদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। অন্যথায় তারা ইসলামী বিধান মতে বিচারের সম্মুখীন হবেন বলে ঘোষণা করেন। যারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে তারা কোন শাস্তির সম্মুখীন হবেন না এবং তাদের জানমালের হেফাজত করা হবে। যাদেরকে বন্দী করা হবে তাদের বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

মোল্লা ওমর বিরোধী নেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং আহমাদ শাহ মাসুদকে আফগানিস্তানের রক্তক্ষয় বন্ধ এবং জনগণকে ধোঁকা না দেয়ার আহ্বান জানান। তালিবান নেতা ঘোষণা করেন যে, তারা রক্ষক্ষয় বন্ধ না করলে এবং জনগণের তহবিল অপচয় করতে থাকলে ইসলামী আদালতে তাদের বিচার হবে।

মোল্লা ওমর প্রতিবেশী দেশগুলোকে আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। (ইনকিলাব ২১/০৫/৯৭ ইং)

কয়েকমাস আগে তালিবান অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে রব্বানী দোস্তাম সরকার হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় পাথর কেটে তৈরি সুরঙ্গ পথটি ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর গুড়িয়ে বন্ধ করে দেয়।

তাখার প্র দেশ দখল ঃ বুরহানুদ্দিন রাব্বানীর প্রধান ঘাঁটি ছিল উত্তরাঞ্চলের তাখার প্রদেশ। তালিবানরা ২৬শে মে, ১৯৯৭ কাবুলে বলেন তাখারের অধিকাংশ জনতা রাব্বানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং এবং

তারা ঘরবাড়ির উপর তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে তালিবানদের খোশ আহমেদ জানিয়েছে। বিনা যুদ্ধে এবং বিনা বাধায় রাব্বানী সরকারের প্রধান নগরী তালিবানদের দখলে এসে যায়।

রাব্বানী দোস্তামের পলায়ন ঃ বালখ প্রদেশের রাজধানী এবং যুদ্ধবাজ জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তামের প্রধান ঘাঁটি মাজার-ই-শরীফের পতনের পর বুরহানুদ্দিন রাব্বানী প্রথমে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে পলায়ন করেন। সেখান থেকে তিনি ইরান চলে যান। (এপি/রয়টার ২৭-০৫-১৯৯৭) আর তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ পানশির উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি ২৭শে মে, ১৯৯৭ মঙ্গলবার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে তালিবান নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, তিনি তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। তালিবান প্রধান মোল্লা ওমর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবে রাজী হন। তালিবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাকে আহমদ শাহ মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

তালিবান মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ কাবুলে বলেন, "শান্তি আলোচনা যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী দু'একদিনের মধ্যেই আলাপ আলোচনা শুরু করবেন।" আহমদ শাহ মাসুদ এ শান্তি আলোচনার পূর্বে কোন শর্ত আরোপ করেননি। (এপি, এএফপি/ইনকিলাব ২৯-০৫-১৯৯৭) তবে তিনি শান্তির প্রস্তাব দিয়েই তালিবানদের প্রতি আঘাত হানতে সব রকমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। পানশির উপত্যাকা এবং চারিখার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন।

জেনারেল আবদুল মালিকের পৃষ্ঠ প্রদর্শন ঃ জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তাম কম্যুনিস্ট পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহেদীন পক্ষে যোগ দিয়েও বালখ প্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল আব্দুর মালিকের উজবেক বাহিনীকে নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়।

একজন সেনাকে নিরস্ত্র করা বা এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যেখানে সে অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না তা অপমানের শামিল। অপমানটা বস্ত্র পরিহিতকে বিবস্ত্র করার কাছাকাছি। সাধারণতঃ বিদ্রোহী বা অপরাধী এবং অবিশ্বস্ত সেনাদেরকে নিরস্ত্র করা হয়। এদু'টো হুকুম একসঙ্গে জারী হওয়ার জেনারেল আবদুল মালিকের নেতৃত্বে উজবেক বাহিনী তালিবানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২৭মে মঙ্গলবার অপরাহ্ন থেকে।

প্রায় আড়াই হাজার তালিবান মাজার-ই-শরীফে পৌছেছিল। তাদের পক্ষে বিরাট উজবেক বাহিনীর বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গে দমন করা কঠিন। উজবেক সেনা বাহিনীকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত মাজার-ই-শরীফের সাধারণ জনতার উপরও

বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং তার সঙ্গীগণ পলায়নের সময় অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র সমর্থক জনতার নিকট বিতরণ করে যান।

তালিবান বাহিনী যেখানেই তাদের প্রশাসন কায়েম করেছে সেখানকার জনগণের কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। মাজার-ই-শরীফে তা করতে গিয়ে তালিবান বাহিনী অস্ত্রধারী উজবেক জনতার রুদ্র রোষে পতিত হন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন উজবেক পশ্তু গোত্রীয় বিরোধের অতীত স্মৃতি।

তালিবান বিরোধী বিদ্রোহে উভয় পক্ষের শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। বিনা রক্তপাতে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখলই তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নীতি। কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, হেরাত, জাবালুস, সিরাজ ইত্যাদি তালিবান কর্তৃক দখলের সময় অনুরূপ চিত্রই দেখা গেছে। তালিবানরা যেভাবে প্রায় বিনা রক্তপাতে নগরীর পর নগরী দখল করেছে, এরূপ ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে বিরল।

মাজার-ই-শরীফে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে তালিবান বাহিনী নিকটবর্তী শহর পুল-ই-খুরশীদে জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করছে। নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে তালিবান প্রশাসনের সুবাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হলে মাজার-ই-শরীফ অচিরেই পুনরায় তালিবান দখলে এসে যাবে আশা করা যায়।

এদিকে আবদুর রশীদ দোস্তাম জেনারেল আবদুল মালিকের নিকট পুনারায় একযোগে কাজ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তালিবান সরকার এতো নিবেদিত প্রাণ যে, সকল বিরোধী শক্তি এক জোট হলেও তাদের শেষ রক্ষা হবে না। আফগানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবেই হবেই ইনশাআল্লাহ।

সূত্র ঃ এ.জেড.এম শামসুল আলম ॥ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি

ওসামা বিন লাদেন এক অকুতোভয় মোজাহেদের আলেখ্য

সউদী কোটিপতি পরিবারের সন্তান ওসামা বিন লাদেন। বিন লাদেনরা সউদী আরবের সেরা ধনী পরিবার। ওসামা এ পরিবারের সন্তান হওয়ার সুবাদে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাছাড়া তিনি নিজেও একজন সফল ব্যবসায়ী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওসামার বিশাল বিনেয়োগ রয়েছে। ওসামার বয়স এখনও চল্লিশের নীচে। দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যৌবনের শুরুতেই ওসামা ইহুদী-খৃস্টান দুনিয়া বিশেষতঃ ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ আন্দোলন সংগঠিত করার সাধানায় আত্মনিয়োগ করেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর ওসামা ছুটে আসেন পেশোয়ারে এবং আফগান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে সোমালিয়াতে আমেরিকার কমান্ডো

হামলা শুরু হলে ওসামা তাঁর একটি ছোট গেরিলা বাহিনী নিয়ে সোমালিয়াতে উপনীত হন। প্রথম হামলাতেই ষাটজন মার্কিন কমান্ডোর লাশ পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মার্কিনীদের মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, তারা তড়িঘড়ি সোমালিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়।

সুদানের ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশটির উপর আমেরিকা ও ইহুদী নাসারাদের চাপ বেড়ে যায়। ওসামা তখন তার কর্মক্ষেত্র সুদানে সম্প্রসারিত করেন। সুদানে অবস্থান করে ফিলিস্তিনের হামাস আন্দোলনেও অর্থ যোগান দিতে থাকেন বলে ইহুদীরা অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করেন।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় খৃস্টান জগতের নির্মম অত্যাচার নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে ওসামা মজলুম বসনিয়ার মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান। আফগানিস্তানের তালেবান সংগঠনের পশ্চাতেও ওসামার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সময়ের এই সাহসী বীর বর্তমানে আফগানিস্তানের কোন এক অজ্ঞাত ছাউনিতে অবস্থান করছেন। ওসামা নিজে একজন দক্ষ যোদ্ধা। সব সময় তিনি একদল দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধাদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। ওসামা এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার মোকাবেলায় একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে আছেন। তাঁকে হত্যা অথবা জীবন্ত বন্দী করার জন্য গত কয়েক বছর যাবত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ঘুম হারাম হয়ে আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওরা ওসামার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারেনি।

আফগান ইসলামী লশকরের কয়েকটি গ্রুপকেই মার্কিনী এবং ইহুদী গোয়েন্দারা প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছে। ওরা এ ব্যাপারে তালেবান যোদ্ধাদের সাহায্য চেয়েছেন। অবশেষে তালেবান সরকারের সাথেও এ ব্যাপারে মার্কিনীরা সরাসরি আলাপ-আলোচনা করেছে। মার্কিনীদের সর্বশেষ আবদার ছিল ওসামাকে যদি আফগান থেকে বের করে দেয়া হয় তবে মার্কিন সরকার যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে সাধ্যমত সহযোগিতা করবে।

মার্কিনীদের এই তৎপরতার প্রেক্ষিত সম্প্রতি ইসলামাবাদস্থ আফগান রাষ্ট্রদূত মৌলবী শেহাবুদ্দীন তালেবান ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ওসামা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন মুজাহিদ। ইসলামী আফগানিস্তান তাঁর নিজের দেশ। একজন তালিবান যোদ্ধা জীবিত থাকতে ওসামার গায়ে হাত দেয়া ইহুদী-নাসারাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ওসামা বিন লাদেনের জনৈক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মৌলভী শেহাবুদ্দীন আরও বলেন যে, আমরা ইয়ামন, সোমালিয়া, বসনিয়া এবং চেচনিয়াতে মার্কিনী ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছি। ঘোষণা শোনা যাচ্ছে যে, আফগানিস্তানে অতর্কিত গেরিলা হামলা চালিয়ে ওসামাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা আঁটছে। আমরা

দোয়া করি, মার্কিন কাপুরুষেরা যেন আরো একবার তাদের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। ওদের একটা দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা ওদেরকে একবারের জন্য হলেও হাতের কাছে পেতে চাই।

ইদানীং পাকিস্তান এবং ইরানের এক শ্রেণীর সংবাদপত্র মিডিয়ায় ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যেসব অনভিপ্রেত আলোচনা পর্যালোচনা করা হচ্ছে, সে সবের প্রেক্ষিতে তালেবান সরকারের অন্য একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, আমরা ইহুদী ও খৃস্ট জগতের ঘাতক নই। ওদের মোড়লীপনার সামনে আমরা ভীতও নই। ওরা সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরীনের ন্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে আশ্রয় দিয়ে নিজেরাও মুসলিম উম্মাহর নিকট অপরাধী হয়ে আছে। ওসমা অপরাধী নন; বরং মুসলিম উম্মাহর গৌরব তিনি। তাঁকে আশ্রয় দেয়া দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম সরকারেরই নৈতিক দায়িত্ব। তিনি অনুগ্রহ করে আফগানিস্তানে আছেন এবং সেটা আফগানিস্তানের জন্য গর্বের বিষয়। ওসামা আফগানিস্তানের। প্রতিটি আফগান নর-নারী, শিশু ওসামার প্রতি কৃতজ্ঞ। আফগানিস্তানের জনগণ এই বীর মোজাহেদের সাথে অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করতে পারে না।

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান ॥ মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নিবন্ধ

আফগানিস্তান পৃথিবীর এমমাত্র ঋণমুক্ত দেশ

জনযুদ্ধের মাধ্যমে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম সেরা পরাশক্তি রাশিয়ার দখলদারী থেকে আফগানকে মুক্ত করার মূল পরিকল্পনাকারী জেনারেল হামিদগুল বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে আজ আফগানিস্তানই এমন একটি দেশ যার কোন ঋণ নেই। বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ. প্রভৃতি অর্থনৈতিক দখলদারী প্রতিষ্ঠাকামী কোন আন্তর্জাতিক লগ্নি প্রতিষ্ঠানের এক কপর্দক ঋণও আফগানিস্তান গ্রহণ করে নাই।

জেনারেল হামিদগুল আরও বলেন, আফগানিস্তান অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা একটি দেশ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম স্বর্ণখনি এদেশে অবস্থিত। যে খনিটি থেকে বর্তমানে স্বর্ণ আহরণ চলছে। এর মজুদের পরিমাণ আটশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বলে অনুমিত হচ্ছে! স্বর্ণ ছাড়াও আফগানিস্তানে আরও বহুবিধ মূল্যবান খনিজ সম্পদের মজুদ রয়েছে।

আমু দরিয়ার তীরে ইসলামী পতাকা ঃ তালেবান ইসলামী লশকরের অগ্রাভিযান সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তবর্তী আমু দরিয়ার জলসীমা পর্যন্ত পৌছে গেছে। তালেবান হাইকমান্ড থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, ইসলামী লশকরের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযান এখন আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত পৌছে গেছে। তালেবান কর্তৃপক্ষ এই বিজয়কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। কারণ, এর ফলে মধ্য-এশিয়ার অভ্যন্তরে দীনের দাওয়াত দেয়ার পথ উন্মুক্ত হলো।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হত্যাযজ্ঞ

গৃহযুদ্ধ, বিদেশি শক্তির আধিপত্য ও বর্তমান মার্কিন হামলা আফগান শিশুদের কোমল মনে জীবন সম্পর্কে একেবারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তারা এখনও নিকট আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের মৃত্যুর খরব শুনতে সদা প্রস্তুত। তালেবান শাসনাধীনে প্রকাশ্যে ফাঁসি, মৃত্যুদণ্ড, ঘোষণা, সামান্য চুরির অপরাধে হাত কেটে দেয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে বেড় উঠা আফগান শিশুরা এখন মার্কিন হামলার মুখে নিজেদেরকে জীবন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে। জীবনের ন্যূনতম মূল্য তাদের কাছে নেই। নিজের চোখের সামনে মা-বাবা-ভাই-বোনের মৃত্যু দেখে এসব শিশুরা ভয়াবহ রকমের নৃশংস হয়ে উঠেছে। শিক্ষা বর্জিত এই হিংস্র প্রজন্মের দায় এই পৃথিবীকেই বহণ করতে হবে।

১৩ বছরের মুতিউল্লাহ বা ওর পাঁচ ভাই-বোনের কেউই রাতে ঘুমাতে পারে না। চোখ বন্ধ করলে মানস চোখে ভেসে উঠে সেই ভয়ংকর দৃশ্য। গগন বিদারী প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছে পৃথিবী। আকাশ থেকে নেমে আসছে আগুনের হলকা, তারপর শুধু আগুন আর আগুন। দাউ দাউ আগুন। শব্দের রাক্ষুসে হুঙ্কার আত্মসমর্পণ করে জানালার কাঁচ। ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ে মাটিতে। ব্যবহার্য একমাত্র আয়নাটিও ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কোন রকমে জানা জান নিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকে।

কোন ছবির দৃশ্য নয়, সত্যি, কাবুলে মার্কিন হামলার পর সোহানা হাবিবীসহ তার দু'সন্তান অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ত্রিশোর্ধ হাবিবী আতঙ্ক কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। তবে তার সন্তানরা এখনো অস্বাভাবিক। কাবুলে বোমা হামলার পর তারা কোনো রকমে জান নিয়ে পাকিস্তানে পেশোয়ারে আশ্রয় শিবিরে এসেছে। কিন্তু জীবনের যে আনন্দ তারা হারিয়েছে তার জন্যে দায়ি কে?

শুধু মতিউল্লাহই নয়, হাজারো আফগান শিশু আজ মার্কিন হামলায় বাস্তুচ্যুত হয়ে পাকিস্তান, ইরান ও উজবেকিস্তানের সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে যারা একটু সামর্থবান তারা সীমান্তের দুপারেই পয়সা ফেলে কোন রকমে পাকিস্তান এসে আশ্রয় নিয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে শায়েস্তা করার নামে মার্কিন বিমান হামলার পর পরই পাকিস্তান, ইরান ও উজবেকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তার পরও পাকিস্তানেই কেবল অল্প বিস্তর সৌভাগ্যবান আফগান আশ্রয় নিতে পেরেছে। আর যারা পারেনি, তারা আফগান ভূখণ্ডে মার্কিন হামলার মুখে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

মার্কিন হামলা থেকে মতিউল্লাহ জানে বাঁচলেও মারা গেছে ওর বন্ধু। একসঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করেছে ওরা। মতিউল্লাহ শুনেছে, ওর আরো কয়েকজন বন্ধু মার্কিন হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। লাদেনকে ধরার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যে কার্পেট বোম্বিং শুরু করেছে তাতে নিরীহ আফগানরাই শুধু মারা পড়ছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন সন্ত্রাসী হামলার পেছনে

যারা জড়িত বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, তাদের কেউই এই হামলায় নিহত তো দূরে কথা, আহতও হয়নি। ফলে অন্তত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো ফলাও করে তুলে ধরতে মোটেও কার্পণ্য করতো না। তা হল এই হামলার উদ্দেশ্য কী?

যুক্তরাষ্ট্র এখনো পরিষ্কার করেত পারেনি, কেন এই হামলা হচ্ছে। প্রথমে ওয়াশিংটন সন্ত্রাসী হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী অভিহিত করে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের দাবি জানায়। প্রায় চার সপ্তাহ বোমা হামলার পর পরিস্থিতি এখন এমন দিকে মোড় নিয়েছে, যা চোখে দেখে মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য শুধু লাদেন ঘায়েল করা নয়, আফগানিস্তানের সরকারের পরিবর্তন আনা। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্যে বেসামরিক আফগান হত্যার আসল কারণ কী?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র আফগানিস্তানের সামরিক ও কৌশলগত স্থাপনায় বোমা হামলা চালিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। বেসামরিক আবাসস্থল, হাসপাতাল এবং মসজিদেও বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি। কাজ হয়নি দু'ভাবে। প্রথমত, লাদেন বা তার সহযোগী গোত্রের কেউ ধরা পড়েনি, দ্বিতীয়, সভ্য বিশ্বও এই নির্বিচার বেসামরিক হতাহতের জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েনি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদে বড় ধরনের কোনো হইচই চোখে পড়েনি। বরং পশ্চিমা সরকার ও রাষ্ট্রগুলো এই সামরিক হামলাকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক অভিযান আখ্যায়িত করে বেসামরিক নাগরিক হত্যায় বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। ফলে নিরীহ আফগানরা যেমনি বিচারের জন্যে কারো কাছে আবেদন জানাতে পারছে না, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না করতে পেরে তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী হামলা অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা কিছুটা সাফায়ের সুরে বলেছেন, এতো বুড় অভিযান'- দু'একজন তো মারা পড়বেই। দু'একজন মারা পড়লে তো কোন কথা ছিল না। এই হামলায় দু'একশ'রও বেশী বেসামরিক লোক ইতোমধ্যেই মারা পড়েছে। যা শেষ পর্যন্ত দু'এক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। আর সন্ত্রাস দমনের নামে ক্লাস্টার বোমা হাসপাতালে মৃত্যুপথযাত্রী রোগিদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। অভিযান পরিচালনাকারীরা কী আর বড় সন্ত্রাস করেছে না? কে করবে এর বিচার? নিরীহ আফগানরা কার কাছে যাবে সুবিচারের জন্য? এ অবস্থায় জাতিসংগ কি অন্ধ হয়ে বসে নেই? নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, মানবাধিকার কমিশন, শরণার্থী সংস্থা সবাই কি চুপ করে থাকবে। নিরীহ আফগানদের জন্যে তাদের এখনকার প্রায় নির্লিপ্ত ভূমিকা ভবিষ্যতে মানব জাতির কাছে এক কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আফগানিস্তানরা যুদ্ধে যুদ্ধে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সংবাদ চিত্রে কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ বা অন্য কোন শহরে নিরূপম কোনো ভবন চোখে পড়ে না, মনোরম তো দূরের কথা, স্বাভাবিক কোন স্থাপনাই পত্রিকার বা সংবাদ পত্রে দেখা যায় না। কাজেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে আর কি ধ্বংস করার জন্যে এখনো মার্কিন হামলা চলছে। এতো নিঃসন্দেহে ভয়াবহভাবে মানবতা লঙ্ঘন।

বিকারগ্রস্থ হয়ে ওঠা আফগানরা এখন আর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। সেদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মানসিকভাবে অসুস্থ। জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ আফগানের বাবা-মা, ভাই-বোন বা নিকট আত্মীয়দের কেউ না কেউ এই এ পর্যন্ত যুদ্ধে মারা গেছে। আফানিস্থানের গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী শক্তির আধিপত্য সব দিক থেকে দেশটিকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে দার করিয়েছে। আর বিধবার সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষস্থান দিয়েছে। যুদ্ধের কারণে আফগানিস্তানের ৮০ শতাংশ নাগরিক গৃহহারা হয়েছে এবং ৯০ শতাংশই মনে করে জীবনে বেঁচে থাকাটা তার কাছে বোনাস। কারণ ইতোমধ্যেই সে কোন না কোনভাবে আক্রান্ত হয়ে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে। ৯৪ শতাংশ আফগান আত্মরক্ষার জন্যে গোপন আস্তনায় আশ্রয় নিয়েছে এবং ৩৩ শতাংশ আফগান শিশু যুদ্ধের কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন করছে। রাজধানী কাবুলের ৯০ শতাংশ শিশু মনে করে যে, যে কোনো সময় তারা মারা যেতে পারে। ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা আশা তো দূরের কথা কোনরূপ চিন্তাও মনে আনে না।

গৃহযুদ্ধ, বিদেশী শক্তির আধিপত্য ও বর্তমান মার্কিন হামলা আফগান শিশুদের জীবন সম্পর্কে একেবারে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। তারা এখন নিকট আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের মৃত্যুর খবর শুনতে সদা প্রস্তুত। তালেবান শাসনাধীনে প্রকাশ্যে ফাঁসি, মৃত্যুদণ্ড, ঘোষণা, সামান্য চুরির অপরাধে হাত কেটে দেয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠা আফগান শিশুরা এখন মার্কিন হামলার মুখে নিজেদের যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে। জীবনের নূন্যতম মূল্য তাদের কাছে নেই। নিজেদের চোখের সামনে মা-বাবা-ভাই বোনের মৃত্যু দেখে এসব শিশুরা ভয়াবহ রকমের নৃশংস হয়ে উঠেছে। শিক্ষাবিহীন এই হিংস্র প্রজন্মের দায় এই পৃথিবীকেই বহন করতে হবে। এরাই বড় হয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দাড়াবে হয়তো। দারিদ্রতা, যুদ্ধ এবং বঞ্চনার অবসান না হলে শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত এই আফগান শিশুদের কাছ থেকে ইতিবাচক কিছু আশা করা হবে নিরর্থক। এভাবে নির্বিচারে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না বরং নতুন একটি সন্ত্রাসী প্রজন্ম তৈরী করে মাত্র। মার্কিন হামলার ফলে শুধু নির্বিচারে বেসামরিক লোকজনসহ নারী ও শিশুই মারা যাচ্ছে না এতে ত্রাণ পরিবহণও ব্যহত হচ্ছে। ইউনিসেফ প্রেসিডেন্ট চার্লস লিওন এর মতে, যথাযথভাবে মানবিক ত্রান পরিবহন ও বিতরণ করা সম্ভব না হলে এই শীতে চার লাখ আফগান শিশু মারা যেতে পারে। প্রতিবেশী উজবেকিস্তানে এক সংবাদ সম্মেলনে চার্লস এর এই ভয়াবহ ভবিষ্যতবানী সভ্য বিশ্বকে এতটুকু আলোড়িত করেনি। করলে পশ্চিমা নেতারা প্রকাশ্যে রমযান উপেক্ষা করে হামলা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার কথা জানাতে পারতো না। ইসলাম ধর্মের অনুসারি অনেকেই না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দেয়া সভ্যতা

শিষ্টাচার বহির্ভূত। বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের চার লাখ শিশু মৃত্যুর সম্ভাবনা ভবিষ্যতে দেশটিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার নামান্তর মাত্র। ইউনিসেফের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আফগান শিশুদের ৯৫ শতাংশই নিজ চোখে নৃশংশ ভয়াহতার দৃশ্য অবলোকন করেছে। এর সঙ্গে এই যুদ্ধে যোগ হয়ে মাত্রা শতকরা একশ' ভাগ ছাড়িয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আজও যদি মার্কিন হামলা বন্ধ হয় (সম্ভাবনা নেই বললেই চলে) তাহলে এক ভীতিকর প্রজন্ম নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আফগানিস্তানকে।

যুদ্ধ, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা আফগান শিশুদের মধ্যে এমন প্রকটভাবে চেপে বসেছে যে, তাদের অনেকেই এখন আর উঁচু স্বরেতো দূরের কথা, স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে পারে না। আতঙ্কগ্রস্ত শিশুদের অনেকেই এখন ফিসফিসিয়ে কথা বলে, আর চিন্তিত চোখে চারিদিক দেখে, কোথাও আকস্মিকভাবে কোনো বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়েছে কিনা। সদা সর্বদা মৃত্যুর প্রহর গুণে এ শিশুরা। কোয়েটা পেশওয়ার কান্দাহারর আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করে স্বয়ং মার্কিন সাংবাদিকরাই এ সংবাদ পরিবেশণ করেছেন ইউএসএ টুডে পত্রিকায়।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিন হামলা নিরীহ আফগানদের ওপর একটি ভয়াবহ চক্রবদ্ধ সন্ত্রাস হিসেবে চেপে বসেছে। এক দিকে নিরীহ আফগান, যাদের সঙ্গে টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন, লাদেন বা তালেবানের কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে আছে সভ্য বেশের বিশ্ব, যারা জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান দফতর ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সন্ত্রাস দমনের নামে এরা নির্বিচারে আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবাদ করে কোন দেশ জাতিসংঘে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করছে না। মার্কিন হামলার স্বপক্ষে অবস্থানকারীরা বলতে পারেন, সন্ত্রাসী লাদেনকে আশ্রয় দেয়ায় তালেবান অবস্থানে চলছে এই হামলা। ইরাকেও চলছে।' কিন্তু ইরাকের ক্ষেত্রটি ছিল ভিন্ন। তা ছাড়াও, বাগদাদে হামলার পক্ষে ছিলো জাতিসংঘের অনুমোদন। আর এবার আফগানিস্তানে হামলার পক্ষে জাতিসংঘের কোন অনুমোদন নেই। তার পরও টানা প্রায় চার সপ্তাহ ধরে হামলা চলছে। এই হামলার সবচে নেতিবাচক দিকটি হলো, বেসামরিক নাগরিক হত্যার আইনগত বৈধতা প্রাপ্তী। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন দেশে নির্বিচারে হামলা ও হত্যা চললে সে সম্পর্কে জাতিসংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না। শুধু তাই নয়, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়েই প্রমাণ ছাড়া হামলা চালানো যাবে। এ ধরনের আচরণ নিরাপদ বিশ্ব গড়া শুধু ব্যাহতই করবে না, বিশ্বকে আরো হিংস্র এবং ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দেবে। শান্তিকামী বিশ্বের দুয়ারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে নিরীহ আফগান শিশুদের বাঁচার আকুতি।

মন ভালো নেই

মাগরিবের পর বায়তুল মোকাররমের দিকে গেলাম। আজ ১০ নভেম্বর ২০০১ শনিবার। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আজ শনিবারই প্রথম সাপ্তাহিক ছুটি বিহীন দিবস। আজ থেকে কেবল শুক্রবারই ছুটি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে বলেই সম্ভবত রাস্তাঘাটে ভীড় কম। যেখানে গেলাম সেখানটা তখনও লোকারণ্য। বিপনী কেন্দ্রে আমাদের সমমনা দু'য়েকজনের সাথে দেখা হলো। একভাই জিজ্ঞেস করলেন, কিছু আনাবেন কিনা! বললাম, সবাই যদি খান তো আনা হোক। ওরা বললেন, তাদের মন ভীষণ খারাপ, খাওয়া-দাওয়া বা কোন আনন্দই আজ আর ভালো লাগবে না। জানতে চাইলেন, আমার বিষণ্নতার কারণ কি? ছোট এককাপ চা এলো, চা নিয়ে আমি বসলাম। আগে শুনি আপনাদের মন খারাপের কারণ। এরপর আমারটা বলা যাবে। তাছাড়া, আমার তো বারো মাসই বিষণ্নতা লেগে আছে। কখনো কখনো কৃত্রিম হাসিখুশী ভাব বাইরে ধরে রাখি কিন্তু বিষণ্নতার ব্যাধি সততই হৃদয়কে ঝাঝরা করে চলে। কবিতার ভাষায়–

দুনিয়া মে কুছ লোগ আয়সে ভী তো হোতে হেয়,
মাহফিল মে হাসতে হে ওহ্, তান্‌হায়ী মে রোতে হেয় ॥

অর্থাৎ, দুনিয়ার বাজারে কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা জনসমক্ষে হাসে বটে কিন্তু নির্জনে কেবলই কাঁদে।

একজন বললেন, সকালে ওঠে পত্রিকার প্রথম পাতায়ই যখন দেখলাম, 'মাজার-ই-শরীফের পতন'– তখন থেকেই আমার এবং এখানকার অনেকের মন খারাপ। পত্রিকাই আর পড়িনি। বললাম, বন্ধু এমন কথাই তো শুনতে চেয়েছিলাম আজ রাজধানীর পথে প্রান্তরে, বিপনী কেন্দ্র ও হাটে বাজারে। যতদূর শুনেছি যথেষ্ট হয়েছে আমার নিঃশ্বাস ফেলার জন্য। চা টুকু শেষ করে ওঠে পড়ছিলাম। মনটা একটু হালকা হলো ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের দু'চারটে অনুভূতি শুনে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সপক্ষে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যারাই কাজ করছেন তাদের আমার আপনজন মনে হয়। শেষ যামানার ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে একটু চোখ রাঙানি আর ছোট্ট খাটো এক আধটু প্রতিরোধ যারাই গড়ে তুলেন তাদেরই আমি ভক্ত হয়ে যাই। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যাতাকল থেকে বিশ্ববাসী তথা মুসলিম জাতির মুক্তির কথা যারাই কার্যকরভাবে বলেন তাদের আমি প্রেমে পড়ে যাই। এ রোগের কি ওষুধ আছে! মনে হলো–

মারীযানে ইশ্‌ক কে লিয়ে বাস্ চায় কাফী হেয়,
নিদা আতি হে পিয়ালী সে, পিও খোদা শাফী হেয়॥

অর্থাৎ, ভালোবাসার ব্যাধিতে যারা ভীষণ আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসার জন্যে আপাততঃ এককাপ চা-ই যথেষ্ট। মন দিয়ে শোন, দেখবে পিয়ালা থেকে এ

আহ্বান শোনা যাচ্ছে যে, পান কর হে ভগ্নহৃদয়! আল্লাহ পাকই তোমাকে শেফা দান করবেন।

পরিচিতজন, বন্ধুবর্গ ও শুভার্থীদের কাছে বিদায় নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পথে নেমে পড়লাম।

এশার পর বাসায় ফিরে দিনের পত্রিকাগুলো বিস্তারিত পড়তে চাইলাম। ইলেকট্রসিটি গায়েব। মশার কয়েল আর মোম জ্বেলে ষ্টাডিতে বসেছি। পত্রিকার সাথে লিখার কাগজও নিলাম। মুড এলে কয়েক স্লিপ লিখেও ফেলবো। কিন্তু না। দেড় ঘন্টা পর্যন্তই গোটা এলাকা অন্ধকার আর পাশের রাস্তা, দু'পাশের ব্যালকনি, জানালা আর খোলা গেইটগুলোয় সমবেত পুরবাসীগণ একটা নাগরিক সংসদের সান্ধ্য অধিবেশনে জড়ো হয়ে আছেন। যেখান থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার শব্দ আমাকে সচকিত করে দিচ্ছে। আমি একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাল-মশলা জোগাড় হবে ভেবে কান লাগিয়ে রাখলাম ওই বিদ্যুৎ না থাকাকালীন নাগরিক আলোচনায়।

এ বইয়ে অপ্রাসঙ্গিক হবে ভেবে উপরোক্ত আলোচনা এখানে পত্রস্থ করলাম না। অবশ্য এর আলোকে কৃত একখানা অ্যানালাইসিস ঢাকার একটি সংবাদপত্র খুব গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে। তবে সংক্ষেপে এ টুকুই বলে রাখি যে, ওই দিনের আলোচনার পর আমার মনে এ জন্যে প্রসন্ন বোধ হয় যে, আমি শাসকশক্তির সাথে কোনভাবেই জড়িত নই এবং সরকারের কোন কার্যক্রমের দায়ই আমার মতো অবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বহন করতে হয় না। বিশেষ করে দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত না হওয়ায় যথেষ্ট হালকা বোধ করি।

ইলেকট্রসিটি এসেছে। আমার বেগম এসে বললেন, আজকের ইনকিলাবে সাবেক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়ার একটি দীর্ঘ লেখা ছাপা হয়েছে। তিনি লেখাটি বের করলেন, আমি বললাম, এর নিচের লেখাটি দেখেছো? এটি আমার এক সুহৃদ ডঃ মাওলানা মুহম্মদ আবদুল হকের। ইনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক পদে কিশোরগঞ্জে কর্মরত আছেন। বেগম সাহেবা মনে করলেন 'সেন্টার ফর কিশোরগঞ্জ ষ্টাডিজ' এর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী শতবার্ষিকী আলোচনায় বক্তা হিসেবে এসেছিলেন। আমি বললাম, ঠিক তাই! ইনিই সে ডঃ আবদুল হক। বেগম সাহেবা ডঃ হকের লেখাটি পড়তে লাগলেন।

বর্তমান আফগান-আমেরিকা অসম যুদ্ধ তথা আফগানিস্তানে নির্বিচারে ব্যাপক ধ্বংসজ্ঞ ও গণহত্যার উপর ব্যারিষ্টার মিয়ার এ মূল্যবান নিবন্ধটি এ বইয়ের প্রামাণ্যতাকে আরো ঋদ্ধ করতে সক্ষম ঃ

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন

যুক্তরাষ্ট্রের টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং এ সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব বিবেক ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। বিশেষভাবে বোমা হামলায় কয়েক হাজার নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুতে সব দেশেই একযোগে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি লোমহর্ষক যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের গর্ব টুইনটাওয়ার ও পরাশক্তির কেন্দ্রস্থল পেন্টাগন বিল্ডিং সন্ত্রাসী কর্তৃক ধ্বংসের এ ঘটনা ঘটার পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে সবাই হতবাক, বিস্মিত। সারা বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করার আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এত ভয়ংকর আত্মঘাতী আঘাত হানার ক্ষমতা কার রয়েছে-এ প্রশ্নই সকলের মুখে মুখে।

যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা এ হামলার মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব ওসামা বিন লাদেনকে। লাদেন অবশ্য বারবার বলেছেন, এ হামলার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তবুও হামলাকারীরা সন্দেহতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনের সদর দফতর পরিদর্শনকালে বলেন, জীবিত অথবা মৃত যাই হউক ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকা চায়। আমেরিকা ধ্বংসের জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের কাছে লাদেনকে হস্তান্তরের দাবী জানায়।

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারপ্রধান মোল্লা ওমর যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর হামলার জন্য ওসামা বিন লাদেনই যে দায়ী, তার প্রমাণ উত্থাপন ব্যতীত লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। যে অপরাধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ জীবিত অথবা মৃত লাদেনকে চায় সে লাদেন ঐ অপরাধের সঙ্গে জড়িত কি-না সে প্রশ্ন উত্থাপন করার আইনগত ও নৈতিক অধিকার আফগানিস্তানের রয়েছে। যথোপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করার নিয়ম বা রীতিনীতি আন্তর্জাতিক আইনে নেই। পৃথিবীর বহু দেশ Extradition Agreement ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমনকি সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীকে হস্তান্তর করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বহু সাজাপ্রাপ্ত আসামী রয়েছে যাদের সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে Extradition Agreement নেই বলে সেসব দেশে হস্তান্তর করা হচ্ছে না। তালেবান সরকার প্রধান মোল্লা ওমর বলেছেন, ওআইসির অন্তর্ভুক্ত যে কোন দেশে পশ্চিমা দেশের পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে ওসামা বিন লাদেনকে বিচারের জন্য হস্তান্তর করতে তার দেশ রাজি আছে। মোল্লা ওমরের এই বক্তব্যে বোঝা যায়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিচারের ব্যবস্থা করা হলে

তালেবান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত নিছক সন্দেহমূলক অপরাধী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে নির্বিবাদে নিরপরাধ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষকে বোমা মেরে হত্যার বিধান আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত নয়। যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে অপরাধীর শাস্তি হওয়ার পর সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য লাদেনই দায়ী তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের আগেই যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং মিডিয়াকে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সচল করে তুলেছে। ২০ সেপ্টেম্বর এফবিআই জানায়, ১১ সেপ্টেম্বর বিমান ছিনতাইকারীদের কয়েকজনের পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধা রয়েছে। অথচ ২০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, আমরা নিশ্চিত জানি, কারা এবং কোন কোন রাষ্ট্র এদের মদদ দিচ্ছে। প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন অনেক কিছুই জানেন, যা এফবিআই বা আমেরিকার জনগণ জানেন না। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন ভবন ধ্বংসের জন্য ওসামা বিন লাদেন দায়ী এবং লাদেনকে আশ্রয়দানের জন্য মার্কিন বাহিনী অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে আফগান আক্রমণের পরও অনেকেই সন্দেহ করেন এ হামলার জন্য আসলেই ইসরাঈলের 'সন্ত্রাসীরা' গোপনে জড়িত ছিল। এ সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাস্তব তথ্য তুলে ধরা যাক–

(১) বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র টুইনটাওয়ারে সাড়ে চার হাজারের বেশী ইহুদি কর্মরত থাকলেও ঘটনার দিন ১১ সেপ্টেম্বর সব ইহুদি তাদের কর্মস্থল বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল কেন?

(২) মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার ঘটনার সরাসরি লাভবান হয়েছে ইসরাইলী শাসকগোষ্ঠী। এখন কোন আইনী সাক্ষ্য উপস্থাপন ব্যতীতই দায়ী করা হচ্ছে 'ফিলিস্তিন ভুখণ্ড মুক্ত করার স্বার্থে চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে।'

(৩) মার্কিন এবং মুসলিম আরবদের মধ্যে ক্ষোভ, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব তৈরির জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু মার্কিন ও ব্রিটিশ সাংবাদিকসহ ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বেতন ভোগী দুর্নীতিগ্রস্ত সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কয়েকটি মুসলিম দেশ এবং মুসলিম জঙ্গী গ্রুপকে দায়ী করেছে।

(৪) হামলার দিন পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত আব্দুস সালাম সাহেবের বরাত দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া) জানায়, এত ব্যাপকমাত্রায় হামলা চালাতে যেসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ সুবিধা দরকার, সে

ধরনের উন্নতমানের প্রযুক্তি ও সুবিধাদি ওসামা বিন লাদেনের কাছে নেই। পক্ষান্তরে পেন্টাগন ও বিশ্বাবাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা চালানোর মত সুদক্ষ পাইলট, অস্ত্র, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থ এসবই ইসরাঈলের রয়েছে।

(৫) ১৯৬৭ সালের ৮ জুন আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ছয়দিনের যুদ্ধ চলাকালে ইসরাঈলী সশস্ত্রবাহিনী মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ ইউএসএস লিবারটির ওপর বিমান ও নৌ হামলা চালিয়ে ৩৪ জন মার্কিন নাগরিককে হত্যা ও ১৭১ জনকে আহত করে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আরব সৈনিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ইউএসএস লিবারটির বেঁচে যাওয়া অনেকেসহ মার্কিন সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্ক, সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল টমাস মুবার সুনির্দিষ্ট করে বলেন, লিবারটির ওপর ইসরাঈলী হামলা মোটেও কোন দুর্ঘটনা ছিল না। অথচ ইসরাঈলীরা নিজেরা হামলা চালিয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে তুলতে জন্য এ হেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের হামলার পর সিআইএ, এফবিআই, ডিআইএ, এমএস সহ অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য প্রকৃত দোষী ও দায়ী ব্যক্তিদের বের করার জন্য কোন অনুসন্ধান চালাবে কি না একমাত্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার জবাব দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বাবাসীকে দু'টি কথা বিশ্বাস করতে বলেছেন-প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে তারাই প্রকৃত শত্রু, যদিও এর পেছনে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। দ্বিতীয়ত, এ শত্রুর প্রকৃত মোটিভ যুক্তরাষ্ট্র সরকার যা শনাক্ত করেছে তাই, যদিও এ দাবীর পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য ও জোরালো প্রমাণ নেই।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে চিহ্নিত আফগানিস্তানে বোমা ফেলে প্রস্তরযুগে পাঠিয়ে দেয়ার কথা আমেরিকায় বলাবলি হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তার আর প্রয়োজন হবে না। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখলের পর ১০ বছর একটানা লড়াই শেষে ১৯৮৯ সালে রুশরা তল্পি তল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেও পেছনে ফেলে গেছে ধুলোয় মিশে যাওয়া এক মানব সভ্যতা। এরপর আফগানিস্তানে চলে এক করুণ গৃহযুদ্ধ। বিশেষজ্ঞরা আমেরিকা আফগান আক্রমণের আগে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আফগানিস্তান আক্রমণ হলে ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। এই মানুষদের মধ্যে আবার ইতিমধ্যে ৫ লাখ এতিম হয়ে গেছে। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আফগান আক্রমণের তৃতীয় সপ্তাহে সেখানে আমেরিকা গ্রাউণ্ড ফোর্সও নামিয়েছে; কিন্তু মারণাস্ত্রের আঘাত হেনে তারা কতটি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছেন বা কতটি তালেবানের অস্ত্রাগার নিঃশেষ করেছেন, কত মুজাহিদ হত্যা করেছেন সেই হিসাব

মিলাতে পারছে না। যদিও ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিল্ডিং এ ঘুমিয়ে থাকা চারজন কর্মীসহ শত শত নিরপরাধ মহিলা, বৃদ্ধ ও সহায়-সম্বলহীন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে সমূলে উৎখাত করে জীবিত অথবা মৃত ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য আমেরিকা আজ রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আফগানিস্তানে বোমা ফেলার দৃশ্য দেখে প্রশ্ন জাগে ধ্বংসস্তূপকে কি আবার নতুন করে ধ্বংস করা যায়? বোমা ফেলে শুধু ধ্বংসস্তূপগুলোকে ওলট-পালট করে চলছে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনী। তারা যেন কবরে চিরন্দ্রিায় শায়িত মৃতদের নিদ্রার ব্যাঘাত আনতে চাইছে।

lntematicnal Covenant on Civil and political rights যা জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালের ২২০০ প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে তার আর্টিকেল ১৪ (২)-এ বলা হয়েছে, Everyone charged with a criminal offence shall have right to be presumed innocent until provcd guilty according to law.

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ সকল সভ্য দেশেই কোন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত আইন, নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বরের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগান বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ করেছে সে অভিযোগের সত্যতা যাচায়ের জন্য আইনকে তার নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হতে দেয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। অভিযোগকারী অভিযোগের যথার্থ প্রমাণাদি উপযুক্ত আদালতে প্রদান করার পর আদালতেই নির্ধারণ করবেন অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন মোতাবেক দোষী কি-না? অভিযোগ যতই ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ ও অমানবিক হোক না কেন, যথোপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত অভিযুক্তকে সাজা দেয়ার কোন বিধান সভ্যতায়, গণতন্ত্রে ও আইনের শাসনে নেই। জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেই অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসসহ সকল অপরাধাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদালতে এসব অপরাধের বিচারের বিধান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে সোফা চুক্তির আওতায় যেসব দেশে তাদের সেনা মোতায়েন করেছে সেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কোন অপরাধ করলে তার বিচার যুক্তরাষ্ট্রের আইন মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। যে দেশের বিরুদ্ধে বা যে দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে দেশের আইন মোতাবেক বিচার করার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এই জাতীয় ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ কি না তা বিচার করার অধিকার কারো নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে যুক্তরাষ্ট্র

অপরাধীকে পাকড়াও করে নিজেদের আইনের আওতায় বিচার করে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসকারী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর না করায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। প্রথমে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেও ক্রুসেডের মর্মার্থ উপলব্ধি করে এখন ক্রুসেড শব্দের ব্যবহার না করেও আফগানিস্তানের নিরপরাধ নিরীহ মুসলিম নর-নারী ও শিশুহত্যা করছে নির্বিবাদে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছে বিশ্ব সংস্থা, জাতিসংঘ। কিন্তু জাতিসংঘ সন্ত্রাস বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কোন সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ বা গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করলেও এ জাতীয় সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িতরা তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অবিহিত করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিসংঘের বহু নবাগত সদস্য তাদের পবিত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং পরবর্তীতে বিশ্ব সংস্থার সদস্যপদও লাভ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারায় স্বীকৃত আত্মরক্ষার অধিকার বলে আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে সামরিক হামলা শুরু করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত অপরাধী সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আফগানিস্তানকে Abebettor অভিহিত করে আফগানিস্তান আক্রমণের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

মুল অপরাধীর দোষ প্রমাণের পূর্বে Abebttor এর বিচার কিভাবে করছেন তা বোধগম্য নয়।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

জাতিসংঘের সনদের ৫১ ধরায় বলা হয়েছে, Nothing in the preseent charter shall impair the inhective self defense if an amed attack Qccurs against a Member of the united Natiorts, tintil security Council has taken measures necssary to maintain

intemational peace and secutity Measures taken by Members in the exercise of this reght of self defense

shall be immediately reported to the seeurity Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the security and responsibility of the security Council under the present Charter to take at any time such as it deems necessaty in order to maintain or restore intemational peace and security

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সশস্ত্র আক্রান্ত রাষ্ট্র ৫১ ধারায় প্রদত্ত জন্মগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে কেন নিরাপত্তা পরিষদের বিষয়টি উত্থাপন করেনি তা বোধগম্য নয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে একটি হতদরিদ্র, দুর্বল, যুদ্ধ ও অন্তর্কলহে ক্ষতবিক্ষত একটি দেশকে আক্রমণ করে সে দেশের নিরপরাধ, দরিদ্র শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ অসহায় মানুষকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা ব্যতিরেকে। নিরাপত্তা পরিষদকে সংযুক্ত না করে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এই সম্পর্কে সংস্থাটির বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিরাপত্তা পরিষদকে এভাবে অকার্যকর করে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ তথা জাতিসংঘের ক্ষমতাকেই কার্যত চ্যালেঞ্জ করলেন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি সম্প্রতি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান নিজে কেন এ ব্যাপারে কোন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন না তা বোধগম্য নয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশী অর্থ প্রদান করে থাকেন জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে এবং মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা বিশ্বাবাসী অবগত। আফগানিস্তান আক্রমণের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আক্রমণকে বৈধ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে শক্তিশালী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র এটাই প্রমাণ করল যে নিরাপত্তা পরিষদ স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নয়। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে সমগ্র ব্যাপারটি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিশেষ করে স্থায়ী সদস্যদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যসহ সমগ্র বিশ্ব ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিকতর শ্রেয় হত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পৃথিবীর হতদরিদ্র, অনঅগ্রসর বহিঃশত্রু ও আত্মঘাতী সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত আফগানের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালিয়ে শত শত নিরপরাধ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও অসহায় নাগরিকদের হতাহত করছে। এসব নিরপরাধ শিশু মহিলারা কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসী বা তালেবান বা ওসামা বিন লাদেন এর কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। অথচ তাদের জীবনই কেড়ে নিয়েছে আমেরিকার নির্দয় বোমা হামলা। আত্মরক্ষার জন্মগত অধিকার কি নিরপরাধ অসহায় দুর্বল মানুষের জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছে? নিরপরাধ মানুষের হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বলেছেন, এটা একটা যুদ্ধ। যুদ্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই নিরাপরাধ শিশু ও মহিলা হত্যাকে তারা অপরাধ মনে করছে না। কিন্তু এসব অসহায় শিশু ও মহিলাগণকে কি জাতিসংঘের সনদের ৫১ ধারায় স্বীকৃত আত্মরক্ষার অধিকার জাতিসংঘ দিয়েছে? প্যালেস্টাইনের জনগণের কি আত্মরক্ষাসহ অন্য কোন অধিকার প্রয়োগের সুযোগ আছে? তাই পৃথিবীর সব বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র যুক্তরাজ্য ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র, দুর্বল অনগ্রসর এবং দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আফগানিস্তানে আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণের পর ওসামা বিন লাদেন বা তালেবান সরকার খোদ আমেরিকায় সৃষ্ট একথা বলা অবান্তর বলে বিরেচিত হলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি, স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার ধারক ও বাহকের দাবীদার আমেরিকার কর্মকাণ্ড বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আফগানিস্তানের বর্তমান ট্র্যাজেডির জন্য কে বা কারা দায়ী তা বিবেচনায় আনতে হবে। খ্যাতনামা লেখক অরুন্ধতী রায় লন্ডনের লিবারেল দৈনিক গার্ডিয়ান' পত্রিকায় The algebra of inftnite justice নামে এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 'Some one recently said not if osama Bin Laden did not exist. America would have had to invent him'

বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় নিজেদের প্রভাববলয় অক্ষত রাখার জন্য কারো কারো ওসামা বিন লাদেন আবিষ্কার করার প্রয়োজন যে অস্বাভাবিক নয় তার প্রমাণ মিলছে বর্তমান সংকটে। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বলেছেন, 'Talibans were conceived & engineered by the CIA financd boy the sandis & brilliantly executed by pakistani ISI.

সৌদি যুবরাজ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আফগান আক্রমণের যথার্থতা বর্ণনা করে ১০ মিলিয়ন ডলারের একটা চেক দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের মেয়রের কাছে। কিন্তু যুবরাজ আমেরিকার একচোখা ইসরাইলী নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মেয়র তার চেক ফেরত

দিয়েছেন। বিশ্ব মুসলিমদের এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এ যেন এক মঘের মুল্লুক যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলী নীতি সম্পর্কে কথা বলার অধিকার কারো নেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আফগান হামলার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার যুক্তরাস্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিরপরাধ দরিদ্র অসহায় শিশুঘাতী, নরঘাতী, বোমা হামলার বিরুদ্ধে ওহাজার হাজার লোকের শান্তি মিছিল হয়েছে। যা ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবতাবাদী মনীষী বার্টাণ্ড রাসেলের গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ও তার্ সহযোগীদের প্রতীকী বিচারের কথা মানবতাবাদী সভ্য দুনিয়ার মানুষ ভুলেনি। আত্মরক্ষার নামে আফগানিস্তানের নিরপরাধ শিশু, মহিলা দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষগুলোকে আধুনিক সমরাস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যার বিচারের জন্য কি কোন গণআদালত কোন মানবতাবাদী বিশ্ববরেণ্য নেতার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে?

সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ॥ ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য

বিষয়টি ‘ভালো লাগা’র

প্রিয় পাঠক, ক্ষমা করবেন। আমি যে কোন লেখায়ই নিজেকে টেনে আনি। বিজ্ঞ পাঠকগণ এতে দোষ নেবেন না। কারণ আমার লেখা আমি শুধু কলম কালি দিয়েই লেখি না। এতে থাকে আমার হৃদয়ের অনুভূতি, আবেগ ও অশ্রু। আমি যা বিশ্বাস করিনা তা আমি বলতে বা লিখতে পারি না। এ জন্যেই সম্ভবত প্রকাশকরা যা চান সে লেখা আমাকে দিয়ে কখনোই হয়ে ওঠে না। আমার চেতনা, আমার ঈমান, আমার মন ও মনন আমাকে যা লিখতে বলে, যেভাবে লিখতে বলে আমি অপকটে নির্ভয়ে তাই লিখে যাই এতে কে খুশি বা কে বেজার হলো সে চিন্তা আমার থাকে না। আমি মনে করি, লক্ষ্যভেদী লেখকের চিন্তা-ভাবনা এমনই হওয়া উচিত। আমার এক পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বীর একটি কবিতা মনে পড়ে গেলো, যিনি আমাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখিয়েছেন।

আপনে আফকারে বে-খুদী মে গার্ক হে জহীর,
ওহ্ কোই আওর হোঙ্গে জিনকো ফিক্‌রে মাদহো যাম হৌগা ॥

তন্ময় হয়ে ডুবে আছ হে জহীর নিজের আত্মনিমগ্নতার গভীরে; যারা মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার কথা ভেবে কাজ করে তুমি মোটেও সে দলের লোক নও!

পবিত্র হাদীস শরীফে এ বিষয়টাই সম্ভবতঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন, “ যুগে যুগেই আমার উম্মতের ভেতর নিরেট

সত্যের উপর একটি সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা গোড়াদের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকবে, ভ্রষ্টদের ভ্রান্তি তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, বিকৃতি থেকেও তারা মুক্ত রাখবে নিজেদের চেতনা ও জ্ঞান। তারা আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না, ধার ধারবেনা কারো সমালোচনার।"

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে এক বিজ্ঞ পাঠক টেলিফোন করে 'বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ, পড়ার পর তার অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, নাদভী সাহেব, আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়, আপনার সামনে বসে আবেগভরা বক্তৃতা শুনছি। বিশেষ করে আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো বড় প্রাণবন্ত মনে হয়, তিনি তার এক আত্মীয়ার পক্ষ থেকেও আমাকে কিছু উপলব্ধি শুনান। ডাকযোগে যারা অনুভূতি জানিয়েছেন তাদের অনেকের মতামতও একই রকম। তাদের ধন্যবাদের জন্যে শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক আমি বিনয়ের সাথে বলছি, আমি লিখার মতো করে না লিখে বলার মতো করে লিখতে চেষ্টা করি। এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল না করে কোন কোন বন্ধু আবার একটু সমালোচনাও করেন বলে শুনি। তারা মানুষকে এ জন্যেও গাল দেন যে, এ সব বই তারা কেন এমন পাগলের মতো কিনে বা পড়ে। আমি এর জবাবে আনত শিরে নিবেদন করি, পাঠকেরা বোকা বলে নন, তারা ভালো বলে এসব কিনেন। তাছাড়া, উপরের ইশারাই এসব ক্ষেত্রে প্রধান কারণ। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

খোশা গায়ী হে দুনিয়া কো কলন্দরী মেরী,
অরনা শের মেরা কিয়া হে, শায়েরী কেয়া হেয়!

অর্থাৎ, আমার হৃদজগতের উচ্ছ্বলতা জগতের মনে ধরেছে বলেই আমি ইকবাল। নতুবা আমার কবিতাই কি, আমার কাব্যচর্চাই কি!

পাঠক ধৃষ্ঠতা নেবেন না। আমি হযরত ইকবালের সাথে আমার কাজের তুলনা করছি না। আমি বলছি যে, বিষয়টি 'ভালো হওয়া'র নয়, 'ভালো লাগা'র। নিছক 'যোগ্যতার' নয়, বরং 'গ্রহণযোগ্যতার'।

প্রয়োজনে একশ' বছর যুদ্ধ করবঃ তালিবান

আফগানিস্তানে এক মাসের বেশী সময় ধরে মার্কিন বিমান হামলা চলছে। এসব হামলায় নারী-শিশুসহ দেড় হাজারেরও বেশী নিরীহ ও নিরপরাধ লোক নিহত ও হাজার হাজার লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মার্কিন হামলার অন্যতম জোরালো সমর্থক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বিশ্ববাসী এ হামলাকে নিরপরাধ বেসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ' হিসেবে দেখছে। পাকিস্তানে নিযুক্ত তালিবান রাষ্ট্রদূত মোল্লা আব্দুস সালাম জাইফ বলেছেন, আফগানরা একশ' বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, তবুও ইসলাম ছাড়বে না। তিনি পুনরায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দেন। তবে একই সাথে তিনি জোর দিয়ে বলেন, অপর

পক্ষ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে আমরা আলোচনায় বসতে চাই না। তিনি আরো বলেন, আমরা ইসলামী নীতি লংঘন করব না। এ কারণেই প্রমাণ ছাড়া ওসামা বিন লাদেনকে আমরা হস্তান্তর করতে পারি না। প্রচণ্ড বিমান হামলা সত্ত্বেও তালিবান বাহিনী কাবুলের উত্তরে বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর ৩টি বড় ধরণের হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মার্কিন সৈন্যদের সর্বাত্মক সহায়তার পরও বিরোধী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ নগরী মাজার-ই-শরীফ দখলে ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে অধিবাসীরা জানান, ফ্রন্ট লাইনে প্রচণ্ড বোমা হামলায় তালিবান পক্ষে বহু হতাহত হচ্ছে। কিন্তু হতাহতের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তালিবান যোদ্ধারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছে। এর ফলে তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলে সেজন্য তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় না; বরং ইসলামের পথে শহীদ হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আরো মুজাহিদ শূন্যস্থান পূরণ করছে। প্রতিদিন তালিবান বাহিনীর পক্ষে যোগ দিচ্ছে শত শত দেশী-বিদেশী যোদ্ধা। এ কারণে মার্কিন মদদপুষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনী শত চেষ্টার পরও মাজার-ই-শরীফ দখল করতে পারছে না। মাজার-ই-শরীফের অধিবাসীরা জানান, ট্রাক ও মোটর গাড়ী ভর্তি তালিবান যোদ্ধারা প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে জেহাদে অংশ নিতে উত্তরাঞ্চলের রণাঙ্গনে যাচ্ছে। এএফপি, রয়টার্স, এপি ও বিবিসি।

২০ মার্কিন গুপ্তচর গ্রেফতার

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি এবং বিদ্রোহ সৃষ্টিতে উস্কানিদানের অভিযোগে ২০ জন আফগানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তালিবান সরকার গতকাল একথা জানায়। জালালাবাদে তালিবান গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে বিরোধী বাহিনীর দু'জন সিনিয়র কমাণ্ডার। একজন আব্দুল মান্নান বাগারওয়াল। দ্বিতীয় জন শাহরাজ। তারা তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছিল এবং গণবিদ্রোহ সংঘটনের চেষ্টা করছিল। ওইসব ব্যক্তিকে এ সপ্তাহের প্রথমে পূর্বাঞ্চলের লাঘমান ও নানগারহার প্রদেশে গ্রেফতার করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের জালালাবাদে নেয়া হয়েছে। পশতু ভাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ সংঘটনের জন্য ইতিপূর্বে আব্দুল হক ও হামিদ কারজাইকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। এর মধ্যে আবদুল হককে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু হামিদ কারজাইকে মার্কিন বিমান গোপন স্থান থেকে তুলে নেয় বলে গুজব রটে। গতকাল হামিদ কারজাই বিবিসিকে জানান, তিনি এখনও আফগানিস্তানে আছেন। এর আগে এক খবরে বলা হয়, একজন সাবেক কর্ণেলসহ ৪ ব্যক্তিকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা ওমর এসব গুপ্তচরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানা গেছে।

আফগানিস্তানে উপর্যুপরি বৈদেশিক আগ্রাসনের রহস্য

সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমী ॥ অনুবাদ ঃ সাহাদত হোসেন খান

আফগানিস্তানের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমী (২৪) ১০ মার্চ, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মূল্যবান ভাষণ দেন আমরা সেটির হুবহু অনুবাদ পেশ করছি।

হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কারো ক্ষতি করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। (সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ৬, আল- কোরআন)

আমি এইমাত্র পণ্ডিতদের একটি বৈঠক থেকে এখানে এসেছি এবং ওই বৈঠকে আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি তা হচ্ছে মূর্তি। আমি এখানে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমরা খুব কমই জানি এবং কম দেখতে পাই। লোকজন আফগানিস্তানের ঘটনাবলী খুব কমই জানে। এজন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত। কেউ আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো বুঝতে চায়নি এবং বুঝার চেষ্টাও করেনি। আর এখন আফগানিস্তানকে একমাত্র যে বিষয়টি বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তা হচ্ছে মূর্তি।

আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো নতুন নয়। আপনারা জানেন যে আফগানিস্তানকে এশিয়ার সন্ধিস্থল বলা হয়। তাই আমরা ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছি। উনবিংশ এবং এখন এই শতাব্দীতেও আমরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছি। আমরা বৃটিশদের আক্রমণ করিনি। রুশদের ওপরও আমরা আক্রমণ চালাইনি। তারাই বরং আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো আমাদের তৈরি নয়, আমাদের সমস্যাগুলো বিশ্বের কদর্য চেহারাই তুলে ধরছে।

সোভিয়েত আগ্রাসন ঃ ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছে। আফগানিস্তান একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং সে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনা উস্কানিতে রাশিয়া ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে ১ লাখ ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। তারা এক দশক আফগানিস্তান দখল করে রাখে। এ সময় তারা ১৫ লাখ লোককে হত্যা করে। তাদের হাতে আরও ১০ লাখ লোক পঙ্গু হয়ে যায়। রাশিয়ার নৃশংসতায় পৌঁছে ২ কোটি লোকের মধ্যে ৬০ লাখ দেশ ছাড়া হয়। রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করার আগে ১ কোটি মাইন পুঁতে রেখে যায়। এসব

মাইন বিস্ফোরণে আজও আমাদের শিশুরা নিহত হচ্ছে। কিন্তু কেউ এগুলো জানে না। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনকালে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী, চীনা এবং অন্যরা আফগান মুজাহিদদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানে ৭টি এবং ইরানে অবস্থানরত ৮টি মুজাহিদ গ্রুপ রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছে। রুশরা বিদায় নেয়ার পর এসব মুজাহিদ গ্রুপ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তাদের প্রতিটি গ্রুপের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ছিল এবং তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। আফগানিস্তানে একটি একক সরকার না থাকায় তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। মুজাহিদদের পারস্পরিক লড়াইয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা রুশ আগ্রাসনকালে ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও বেশী। রাজধানী কাবুলেই নিহত হয়েছে ৬৩ হাজার মানুষ। নৈরাজ্যের কারণে আরও ১০ লাখ লোক আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়।

তালিবানদের আবির্ভাব ঃ এই নৈরাজ্য আর ধ্বংস দেখে দেশকে বাঁচানোর জন্য একদল ছাত্র এগিয়ে আসে। এরাই তালিবান নামে পরিচিত। তালিবান শব্দের অর্থ ছাত্রদল। আমাদের ভাষায় ছাত্রের বহুবচন হচ্ছে তালিবান। আরবী ভাষায় দু'জন ছাত্রকেও বোঝাতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাষায় বুঝায় ছাত্ররা। এ ছাত্ররা একটি আন্দোলন গড়ে তুলল, যার নাম ছাত্রদের আন্দোলন। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহারের একটি গ্রাম থেকে প্রথম এ আন্দোলন শুরু হয়। একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার দু'জন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে শ্লীলতাহানি ঘটালে তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নির্যাতিত দুই কিশোরীর পিতা-মাতা একটি স্কুলে গিয়ে একজন শিক্ষকের কাছে সাহায্য চাইলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক তখন ৫৩ জন ছাত্র ও ১৬টি বন্দুক যোগাড় করে সেই কমান্ডারের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। কিশোরী দু'টিকে উদ্ধার করে তারা পাপিষ্ঠকমাণ্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কমান্ডারের কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকেও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। এ ঘটনার কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়। বিবিসিতেও তা প্রচার করা হয়। এ কাহিনী শুনে আরও বহু ছাত্র এই আন্দোলনে শামিল হন এবং তারা বাদবাকি যুদ্ধবাজ কমান্ডারদের নিরস্ত্র করতে থাকেন। আমি এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য বাড়াতে চাই না। কান্দাহারে সেদিন যে ছাত্র আন্দোলন বা তালিবান মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল আজকের তালিবান হচ্ছে তারাই। তালিবানরা দেশের ৯৫ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং চারটি বড় শহরসহ রাজধানী কাবুল দখল করেছিল। আর যুদ্ধবাজ পথভ্রষ্ট মুজাহিদদের একাংশ এখনো আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে রয়ে গেছে।

তালিবান সরকারের সাফল্য ঃ তালিবানরামাত্র ৫ বছর সরকার পরিচালনা করে। তাদের সাফল্যগুলো আপনারা জানেন না। তাই এগুলো তুলে ধরছি।

১। সর্ব প্রথম তারা যা করেছে তা হচ্ছে, এই খণ্ড-বিখণ্ড দেশটাকে একত্রিত সংঘঠিত করার কাজ। আফগানিস্তান আগে ৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তালিবানরা এসব খণ্ডে মোজা লাগিয়েছে। ইতিপূর্বে কেউ আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।

২। দ্বিতীয় যে জিনিসটা তারা করছে তা হল মানুষজনকে নিরস্ত্র করা। যুদ্ধের পর প্রতিটি আফগানের কাছে একটা করে কালাশিনকৎ রাইফেল ছিল। কারও কারও কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ফাইটার প্লেন ও হেলিকপ্টার পর্যন্ত ছিল। এসব লোককে নিরস্ত্র করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ এসব অস্ত্র ক্রয়ে ৩শ' কোটি ডলারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই পরিকল্পনার গোড়াতেই ত্রুটি ছিল বলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সবাই আফগানিস্তানের কথা ভুলে গেল। কিন্তু তালেবানরা ৯৫ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

৩। তৃতীয় যে কাজটি হচ্ছে আফগানিস্তানে একটি একক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বিগত ১০ বছর ধরে এখানে ছিল না।

৪। তালিবানদের চতুর্থ সফলতা সকলের কাছেই বিস্ময়কর যে, তারা বিশ্বের আফিম চাষের ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। আফগানিস্তানে বিশ্বের ৭৫ শতাংশ আফিম উৎপাদিত হত। তারা গত বছর আফিম চাষ বন্ধে একটি ডিক্রি জারি করে। এ বছর জাতিসংঘ মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ইউএনডিসিপি এবং এ সংস্থার মিস্টার রানার্ড এফ গর্বভরে ঘোষণা করলেন যে, আফগানিস্তানে আফিম চাষ শূন্য শতাংশ। আফগানিস্তানে আফিম চাষ বন্ধের ঘটনা জাতিসংঘের জন্য মোটেও সুখকর নয়। কারণ এতে তাদের অনেকেরই চাকরি খোয়া গেছে। ইউএনডিসিপিতে ৭শ' বিশেষজ্ঞ কাজ করতেন এবং বেতন পেতেন। এরা আফগানিস্তানে কোন কাজকর্ম না করেই সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। এই ডিক্রি জারি করায় তারা খুশি হতে পারেননি। এ বছর তারা সবাই তাদের চাকরি হারিয়েছেন।

৫। পঞ্চম সাফল্য হচ্ছে মাবাধিকার প্রতিষ্ঠা। তালিবানদের কোন কোন বন্ধু তাদের এ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জানেন না এবং কোথাও কোথাও এনিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন যে, তালিবানরা মানবাধিকার লংঘন করছে। এখানে দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তাদের বক্তব্য হল– আমাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী আমরা মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে তার বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে প্রথম। আমাদের আগে আফগাস্তিানে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। আমরা প্রথম যে কাজটা করেছি তা হল মানুষজনকে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করা। দ্বিতীয় বড় যে কাজটা

আমরা করেছি তা হচ্ছে মানুষজনের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচারের ধরন আপনাদের মত নয়। ওখানে ন্যায়বিচার কিনতে হয় না। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচার হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং অনায়াসলব্ধ।

নারী অধিকার ঃ নারী অধিকার লংঘনের জন্য তালিবানদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আপনারা কি জানেন তাদের পূর্বে কী ঘটত? এখানে বহু ঘটনা আফগানিস্তানে জনগণের মনে আজও ভয়াবহ রূপে দাগ কেটে আছে। যা স্মরণ করলে দেহ-মন এখনও শংকীত হয়। আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে নারীদের সঙ্গে জীবজন্তুর মত ব্যবহার করা হত। আক্ষরিক অর্থেই তাদের বিক্রি করা হত। এই ঘৃণ্য রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করি। স্বামী বাছাই করার ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তাদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করে দেয়া হয়। আফগানিস্তানে এক সময় উপঢৌকন হিসেবে নারীদের বিনিময় করা হত। ইসলাম ধর্মে এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু তাও চলত। এটা ছিল একটি সামাজিক রীতি-নীতি। দুটি বিবদমান গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রফা করতে চাইলে তারা নারী বিনিময় করত। এটা এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আফগানিস্তানে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা পুরোপুরি অমূলক ও অসত্য। সেখানে নারীরা কাজ করে। তবে এটা সত্য যে, ১৯৯৬ সালে রাজধানী কাবুল দখল করার পূর্ব পর্যন্ত নারীদের ঘরের ভেতরে থাকতে বলা হয়। তার মানে এই নয় যে, আমরা চিরদিন তাদের চার দেয়ালের ভেতর আটকে রাখতে চাই। এ বিষয়ে তালিবানদের বক্তব্য হল, কাবুল দখলের আগে আমরা নারীদের বলেছি যে, কোথাও আইন-শৃংখলা নেই। তাই আপনারা নিরাপত্তার খাতিরে আপাতত ঘরে থাকুন। আমরা মানুষজনকে নিরস্ত্র করেছি এবং আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন নারীরা কাজ করছেন। তবে পাশ্চাত্যের মত আমাদের নারীরা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি করে না। আমরা চাই না যে, আমাদের নারীরা পাইলট হোক কিংবা তারা বিজ্ঞাপনে দর্শণীয় বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হোক। তারা কাজ করেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। একইভাবে নারী শিক্ষা নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা বলেছি যে, আমরা শিক্ষা চাই এবং আমরা শিক্ষিত হবই। শিক্ষা লাভ করা হচ্ছে আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের অংশ। ধর্মীয় নির্দেশেই আমরা শিক্ষা লাভ করতে বাধ্য। আমরা নারীদের জন্য পৃথক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। তার মানে এই নয় যে, আমরা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করছি। আমরা চাই, আমাদের নারীরা শিক্ষিত হোক। তবে তাদেরকে শালীনতা বজায় রেখে পর্দার ভেতরে শিক্ষা লাভ করতে হবে। আমরা নারী শিক্ষার নয়, ছেলেমেয়ের একসঙ্গে পড়াশুনা করার বিরোধিতা করছি। আমাদের এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে আমরা মহিলা স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়াতে পারছি না।

আমাদের সরকারের আগে নানা ধরনের পাঠ্যসূচী চালু ছিল। কখনও ছিল রাজাদের বন্দনামূলক পাঠ্যসূচী। আর কখনও বা পাঠ্যসূচীতে থাকত কমিউনিস্টদের বন্দনা। এছাড়া ৭টি মুজাহিদ গ্রুপের পক্ষ থেকে ৭ ধরণের পাঠ্যসূচী দেয়া হত। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিগড়ে যেত। তারা বুঝতে পারত না তারা কোন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে। আমরা পাঠ্যসূচী একত্রীকরণে হাত দিয়েছি এবং সেটা চলছে। সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানের বড় বড় শহর ও কান্দাহারে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ পুনরায় চালু করেছি। চিকিৎসা অনুষদে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। তবে তারা পৃথক পৃথকভাবে পড়াশুনা করছে। সুইডিশ কমিটিগুলোও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি জানি যে, তা মোটেও যথেষ্ট নয়। তবে আপাতত আমরা এতটুকুই করতে পেরেছি, আমরা রাতারাতি সবকিছু করে ফেলতে পারি না।

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে তালিবানদের বক্তব্য ঃ আমাদেরকে সন্ত্রাসবাদে মদদদানের জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। মার্কিনীদের কাছে সন্ত্রাসবাদ কিংবা সন্ত্রাসী বলতে বোঝায় কেবল বিন লাদেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, তালিবান আন্দোলনের জন্মের ১৭ বছর আগে থেকেই বিন লাদেন আফগানিস্তানে রয়েছেন। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক চেনীর দৃষ্টিতে বিন লাদেনের মত মুজাহিদরা মুক্তিযোদ্ধা ও বীর হিসেবে বিবেচিত হতেন। তারা তাদেরকে হোয়াইট হাউসে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কারণ এরা তখন তাদের স্বার্থে লড়াই করছিলেন। আর এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাই এসব লোকের আর দরকার নেই। তারা এখন সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা থেকে সন্ত্রাসী। একেবারেই ইয়াসির আরাফাতের মত। মার্কিন মিত্রে পরিণত হওয়ায় আরাফাত সন্ত্রাসী থেকে হয়েছেন বীর। আর মার্কিন বিরাগভাজন হয়ে লাদেনের মত মুজাহিদরা হয়েছেন সন্ত্রাসী। বিন লাদেনকে যে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয় সে ধরণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পার্থক্য কি? উত্তর আফ্রিকায় দু'টি মার্কিন দূতাবাসে হামলা এবং আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ কোনটাই ঘোষণা দিয়ে করা হয়নি এবং এ দু'টি হামলাতেই সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে। সুতরাং আমরা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভ্রান্ত।

নির্বিচারে লোকজন হত্যার নাম যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে উত্তর আফ্রিকার দু'টি দেশে মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ এবং আফগানিস্তানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। যুক্তরাষ্ট্র একজন লোককে ন্যায়বিচারের সুযোগ না দিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করছে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের উন্মাদনায় আফগানিস্তানে সেই ৭অক্টোবর ২০০১ তারিখ থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনী এক পৈশাচিক উল্লাসে লাগাতার যে হরেক রকমের বোমা হামলা চালিয়ে মানুষের ঘরবাড়িসহ সবকিছু ধ্বংস এবং নারী, পুরুষ, শিশু, নির্বিশেষে সবার ওপর নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে এর প্রতিবাদে গত ২৩ অক্টোবর ২০০১ তারিখ মঙ্গলবার এক মা তাঁর ৩ মাসের শিশুকন্যা পুতুলকে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন। শিশুটির গলায় ঝুলানো প্লাকার্ডে লেখা ছিল ঃ 'ড্রাকুলা প্রেসিডেন্ট বুশ আমাকে মেরে ফেলো/শিশু ওসামা'। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বুশ প্রশাসন ঘোষণা করে যে, তারা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য এ হামলা চালিয়েছে। আমরা তখন ওসামা বিন লাদেনকে চিনতাম না। আমি ইতোপূর্বে কখনও তার নাম শুনিনি। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং আমরা বিস্মিত হই। আমি সে রাতে বাসায় ছিলাম। আমাকে জরুরী একটি বৈঠকে তলব করা হয়। বৈঠকে আমাদের জানানো হয় যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। লাদেনকে হত্যার জন্য ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা পান। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৯জন ছাত্র নিহত হন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আজও ক্ষমা প্রার্থনা করিনি। আপনারা আমাদের জায়গায় থাকলে কি করতেন? আমরা যদি আমেরিকায় গিয়ে ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বলতাম যে, আমরা একটা লোককে হত্যা করতে এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, যে লোকটিকে আমরা আমাদের দূতাবাসে হামলার জন্য দায়ী মনে করছি, এবং সেই লোকটিকে আমরা পাইনি। তবে আমরা অপর ১৯ জন মার্কিনীকে হত্যা করে ফেলেছি। কী করত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? তাৎক্ষণিকভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন আপনারা। কিন্তু আমরা নম্র। আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। এমনিতেই আমরা সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমরা আমাদের সমস্যা বাড়াতে চাই না।

সংকট নিরসনে তালেবানদের নৈতিক প্রস্তাবনা ঃ প্রথম থেকেই তালিবানরা বলে আসছিল যে, ওসামা বিন লাদেন যদি সত্যি সত্যিই কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় জড়িত হয়ে থাকে এবং তার জড়িত থাকার পক্ষে কেউ আমাদের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমরা তাকে শাস্তি দেব। কিন্তু কেউ আমাদের কাছে কোন প্রমাণ দেয়নি। আমরা তাকে ৪৫দিনের ট্রায়ালে রাখলাম এবং এ সময় কেউ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বলল, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের আস্থা নেই। আমরা হতবাক হয়েছি যে, তাহলে তাদের বিচার ব্যবস্থাটা কোন ধরনের? তারা একটা মানুষকে হত্যার চেষ্টা করছে, তাকে কোন রকমের বিচারের আত্মরক্ষা সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই। এখানে আমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরাধ করে,

তাহলে পুলিশ গিয়ে তার বাড়ীঘর ভাঙতে শুরু করবে না। তাকে নিশ্চয়ই প্রথমে আদালতে নেয়া হবে। আমাদের কথা তারা শুনল না। বলল, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের বিশ্বাস নেই এবং তাকে তাদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। আমাদের প্রথম প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা রাজি। আপনারা চাইলে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল আফগানিস্তানে এসে এই লোকটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করুক, যাতে তিনি কিছু করতে না পারেন। আমাদের সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হল। তৃতীয় প্রস্তাব আমরা দিয়েছি ৬ মাস আগে। এ প্রস্তাবে আমরা বললাম, তৃতীয় একটি ইসলামী দেশে আমরা ওসামা বিন লাদেনের বিচার মেনে নিতে রাজি আছি। যেখানে সউদী আরব ও আফগানিস্তানের সম্মতি থাকবে। কিন্তু আমাদের এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হল।

এখনও যথাসম্ভব খোলা মন এবং চতুর্থবারের মত আমি এখানে আমার নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে এসেছি যেটা আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে চাই এই আশায় যে, তারা সমস্যাটির সমাধান করবেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে, তারা তা করবেন। কারণ আমরা মনে করি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই একজন জুজুবুড়ি খুঁজে বেড়ায়। আপনাদের কি মনে আছে? সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করতে যাচ্ছেন। সবাই মনে করল, তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ওদের শত্রুকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছি। এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করলেন। তিনি সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বহু লোক চাকরি হারায়। পেন্টাগন, সিআইএ ও এফবিআই থেকে বহু লোক ছাঁটাই করা হয়। কারণ তখন তাদের প্রয়োজন ছিল না। তাই আমাদের মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন একজন জুজু বুড়ি খুঁজছে। হতে পারে তারা তাদের বার্ষিক বাজেটের যৌক্তিকতা দেখাতে অথবা নিজেদের নাগরিকদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য এমনটি করছে।

আফগানিস্তান কোন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়। আমরা একটি সুচও বানাতে পারি না। তাহলে আমরা কিভাবে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হব? কিভাবে আমরা বিশ্বের প্রতি একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারি? সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঐসব দেশই হতে পারে যারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি করে আমরা নই।

অবরোধ ঃ এখন আমাদের উপর অবরোধ রয়েছে। আর এই অবরোধে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও আমরা ইতোমধ্যে বহু সমস্যার মধ্য দিয়ে

পথ চলছি। ২৩ বছরের অব্যাহত লড়াই, অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ধ্বংস, শরণার্থী সমস্যা এবং কৃষি জমিতে পুঁতে রাখা স্থলমাইনের মত সংকটে আমরা জর্জরিত। এসব সমস্যার সঙ্গে এবার যোগ হল জাতিসংঘ অবরোধ। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার প্ররোচনায় জাতিসংঘ আমাদের উপর অবরোধ আরোপ করেছে। আমরা অবরোধের শিকার। এক মাস আগে কয়েকশ শিশু মারা গেছে। ৭শ' শিশু মারা গেছে অপুষ্টিতে এবং ৪শ' শৈত্যপ্রবাহে। কেউ এ নিয়ে কথা পর্যন্ত বলল না। অথচ মূর্তির সুখ-দুঃখের খবর তারা ঠিকই রাখে।

মানুষের চিন্তা বাদ দিয়ে মূর্তির জন্য দরদ ঃ সারা দুনিয়া যখন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন আমাদের অতীত নিয়ে দুর্ভাবনা করার কোন অধিকার কারও নেই। আমি কান্দাহারে তালেবান সদর দফতরে যোগাযোগ করেছি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কেন তারা মূর্তি ভাঙতে চান। আমি উলেমা পরিষদের প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছি যিনি মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। উলেমা পরিষদের প্রধান আমাকে জানান যে, ইউনেস্কো ও সুইডেনের একটি এনজিও বামিয়ানে রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া বুদ্ধমূর্তি সংস্কারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা আফগানিস্তানে আসেন। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অনুরোধ করলেন তারা যাতে টাকাগুলো মূর্তি মেরামতের পরিবর্তে আমাদের শিশুদের জীবন রক্ষার্থে ব্যয় করেন। বিদেশী প্রতিনিধি দল তখন জানালো যে, মূর্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য তারা তাদের অর্থ ব্যয় করবে না। এদের এই জবাবে আমাদের লোকজন ক্ষেপে গিয়েছিল। লোকজন বলল, যদি আমাদের শিশুদের কথা তোমরা না ভাব, তাহলে এই মূর্তিগুলো আমরা ভেঙ্গে ফেলব। আপনারা এই অবস্থায় পড়লে কী করতেন? আপনাদের চোখের সামনে আপনাদের সন্তান অনাহারে মারা গেলে এবং আপনাদের উপর অবরোধ আরোপিত থাকলে কী করতেন আপনারা? সে ধরনের অবস্থায় যারা অবরোধ আরোপ করেছে তারাই যদি মূর্তি সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে আসে তবে আপনারা কী করতেন?

কফি আনান ও মূর্তি ঃ আর আছেন কফি আনান। কফি আনানকে তো আপনারা চেনেন। তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি পাকিস্তানে গেলেন এবং বললেন, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু এই লোকটি আমাদের শিশুদের নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তিনি আফগানিস্তানের ৬০ লাখ শরণার্থী এবং দারিদ্র্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি কেবল ওইসব মূর্তির জন্য পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন। ওআইসির ভূমিকাও তথৈবচ। ওআইসি মূর্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য কাবুলে একটি মিশন পাঠায়। আমরা সত্যি বিস্মিত। এই পৃথিবী শুধু মূর্তি নিয়ে ভাবল। কিন্তু তারা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ নিয়ে ভাবল না। বামিয়ানে

বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত আমাদের নয়, এ সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্ট থেকে অনুমোদিত হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারি না। বিদেশীরা আমাদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তানা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে পারত না। আমাদের উপর দু'দুবার অবরোধ আরোপ করা হোক তাতে আমাদের আদর্শের কোন হেরফের হবে না। আমাদের কাছে আদর্শটাই সব। তাই জাতিসংঘ অবরোধে আমাদের কিছুই যায় আসে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, নিষ্ফল বাঁচার চেয়ে আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। আমরা আলোচনার জন্য আমাদের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছি। কিন্তু সর্বত্র আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কেও আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা অন্যান্য দেশেও আমাদের অফিস বন্ধ এবং আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে তারা এটা জানে না যে, আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থ। কারণ তাদের কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তাদের কাছে ইংরোজীভাষী ছাড়া আর কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তারা আমাদের ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। ঐসব বিশেষজ্ঞ অথবা জাতিসংঘ অবরোধ কমিটি কখনও আফগানিস্তানে যাননি।

এত বোমা হামলার পরও আফগানরা দমেনি

আফাগানিস্তানের নিরীহ ও নিরপরাধ সাধারণ মানুষের উপর যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার টন বোমা ফেলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী এসব বোমায় নারী-শিশুসহ দেড় হাজার মানুষ নিহত ও হাজার হাজার লোক আহত হয়েছে। নির্বিচারে বোমা হামলায় মসজিদ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, রেডক্রসের খাদ্যগুদাম, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিমানবন্দর ও পানি শোধনাগার ধ্বংস হয়েছে। সাধারণ মানুষের মাটির ঘর বোমার আঘাতে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। গতকাল তালিবান সরকারের আমন্ত্রণে একদল বিদেশী সাংবাদিক কাবুল, কান্দাহার ও হেরাতসহ বিভিন্ন নগরী সফর করেন। সাংবাদিকরা মার্কিন বাহিনীর হামলায় বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর, হাসপাতাল, মসজিদসহ অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেন। এত প্রচণ্ড হামলার পরও জনগণের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে বিদেশী সাংবাদিকগণ বিস্মিত হন। নৈশকালীন কার্ফ্যু উঠে গেলে লোকজন তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট খুলছে। চারিদিকে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ইলেকট্রোনিক্সও মেকানিকদের ওয়ার্কশপগুলো খুলেছে। সেখানে ভাল কেনাবেচা চলছে। ফলের দোকানে আপেল, আঙুর, বেদানা ও কলা রয়েছে। এসব প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হয়েছে। ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল কাইয়ুম বলেন, বোমায় তার বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মার্কিনীরা বোমা ফেলছে। এক্ষেত্রে আমাদের করার কিছুই নেই। আমরা চাই মার্কিন স্থলবাহিনী এদেশে আসুক। তখন আমরা কিছু করতে পারবো। ফলের

দোকানদার বলেন, আমরা ওসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে তালিবানের নীতি সমর্থন করি। তিনি আমাদের মেহমান। এখানে জেহাদ করার জন্যই তার আগমন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র কান্দাহার নগরীতে অবস্থিত তালিবান রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ছিনতাই করে তাতে বিভিন্ন বার্তা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। কিন্তু আফগান জনগণ এই রেডিও'র খবরে আদৌ বিশ্বাস করছে না। মার্কিন কর্তৃপক্ষ সেদেশের ৮৬টি পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার আশংকা থাকায় এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। গতকাল কান্দাহার নগরীতে অবস্থিত রেড ক্রিসেন্টের একটি ক্লিনিকে মার্কিন বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়। এতে অসুস্থ ব্যক্তিবর্গসহ ১৫ জন নিহত এবং চিকিৎসকসহ ২৫ জন গুরুতর আহত হয়। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েন করা শুরু হয়েছে। সেখানে মার্কিন সৈন্যদের একটি ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে। ৫শ' মার্কিন সৈন্য ঐ ঘাঁটির সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। তারা মার্কিন বিমান হামলা এবং উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করছে।

যেভাবে মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েন করা হয় ঃ আফগানিস্তানে মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তালিবানবিরোধী বাহিনীর দখলিকৃত উত্তরাঞ্চলে এসব মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। মার্কিন বিমান হামলা এবং উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে এসব সৈন্য সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রথম উত্তরাঞ্চলীয় জোট তাদের ভূখণ্ডে সশস্ত্র ও ইউনিফর্ম পরিহিত মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতির বিষয়টি স্বীকার করেছে। একজন তালিবান কর্মকর্তা জানান, উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর সাথে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ৫০০ সৈন্য অবস্থান করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রাম্সফেল্ড বলেছেন যে, তালিবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর দখলিকৃত আফগান ভূখণ্ডে খুব কমসংখ্যক মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি সীমিত। তবে এ কথা সত্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা কোরিয়ার যুদ্ধকালে অথবা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে স্থলসেনা মোতায়েন করেছিল বর্তমানে এখনও সেভাবে সৈন্য মোতায়েন করা হয়নি। তবে সে সময়ের মতই স্থলসেনা মোতায়েনের বিষয়টি আমরা নাকচ করছি না। ইতিপূর্বে পেন্টাগন বলেছে, তারা আফগানিস্তানের ভেতরে শতাধিক কমাণ্ডো নামিয়েছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল, আঘাত হানা এবং পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কমাণ্ডো হামলা একবারই হয়েছে। সে সময় তালিবান সরকার দু'টি মার্কিন হেলিকপ্টার গুলী করে ভূপাতিত করা এবং ২৭ জন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করার কথা জনায়। এরপর আর কমাণ্ডো নামানোর কোন খবর পাওয়া যায়নি। উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর মুখপাত্র মোহাম্মদ আশরাফ নাদিম জানান, তাদের অধিকৃত এলাকায় ২০ জন মার্কিন সৈন্য রয়েছে। সেখানে তাদের নিজস্ব ঘাঁটি রয়েছে। তাদের কাছে

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র এবং তারা তাদের দেশের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ব্যবহার করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাম্সফেল্ড প্রথমবারের মত স্বীকার করেছেন যে, আফগানিস্তানে সার্বক্ষণিকভাবে কিছু মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। মার্কিন বাহিনীর জেনারেল স্টাফলে বিম বলেন, আফগানিস্তানে স্থলসৈন্য নামিয়ে আমরা একটু ঝুঁকি নিয়েছি। কিন্তু এটা হিসাব-নিকাশ করা ঝুঁকি। এই ঝুঁকি একটি পরিকল্পনার অংশ।

কেয়ামত পর্যন্ত চলবে আফগান যুদ্ধ

চমন কি পাকিস্তানের নাকি আফগানিস্তানের অংশ এটা বোঝা মুশকিল স্থানীয় লোকজনের বেশভূষা দেখলে। ১০ নভেম্বর শনিবার বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে যখন ১২৫ কিলোমিটার দূরে আফগান সীমান্তের এই ছোট্ট শহরে পৌছি, তখন প্রায় সন্ধ্যা। পরনে সালওয়ার-কামিজ, মাথায় পাগড়ি, মুখে মোচসহ লম্বা দাড়ি তালেবানি সিম্বলের লোক ছাড়া এখানে অন্য বেশ ভূষার লোক খুবই কম। কারণটি খুবই সঙ্গত। আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে এর লাগোয়া বৈধ বর্ডার পোস্ট। সেখান দিয়ে তারা যাচ্ছে, আফগানরা আসছে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্য। আর বয়স কম-বেশি, যারাই আফগান সফর করে, সবাইকে তালেবানরা দাড়ি রাখতে বাধ্য করেছে। দাড়ি ছাড়া আফগানিস্তানে যাওয়া যায় না। আফগানদের সঙ্গে এদের রয়েছে দীর্ঘদিনের ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতিক বন্ধন। দু'পারেই পাঠান। এখন পাঠানে পাঠানে আরো একাকার সীমান্ত শহর চমন।

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ইতিমধ্যে মাজার-ই-শরীফ শহর হারিয়েছে নর্দার্ন এলায়েন্সের কাছে। সামনে তাদের কি দশা হয় কে জানে! যুদ্ধ কতোদিন চলে, তারও ঠিক নেই। কিন্তু এখানকার পাঠানদের ভাষ্য এ যুদ্ধ শেষ হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। হয়তো তালেবানরা হেরে যাবে; কিন্তু আফগানিস্তানে জাতিগত সমস্যা মিটবে না। এরপর ঘরে ঘরে যুদ্ধ হবে।

'আমি তো জন্মথেকেই দেখছি এ যুদ্ধ চলে আসছে। এর মধ্যেই আমরা বড়ো হচ্ছি। তবে এখন এপারে থাকি। সে-পারের সঙ্গে ব্যবসা আছে। আমার বোন বিয়ে দিয়েছি। প্রতিদিন যাচ্ছি' বললেন ২৬ বছর বয়সী টায়ার ব্যবসায়ী সৈয়দ আলী। আলী কাগজে কলমে পাকিস্তানি নাগরিক, কিন্তু সে নিজেকে আফগানিস্তানী বলেই জানে। নিজের মুখের দাড়ি দেখিয়ে বললেন, এটা অন্তরের না। ব্যবসার জন্যে আফগানিস্তান যেতে হয় তাই রেখেছি। আলীর কথা শুনে আমার মনে পড়লো স্থানীয় পত্রিকার একটি খবরের দিকে তালেবানরা মাজার-ই-শরীফের দখল হারানোর পর সেখানকার বাসিন্দাদের অনেকে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন।

যুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশসহ অনেকে দেশের লোকেরা যেমন উদ্বিগ্ন, তেমন উদ্বিগ্ন এরা নয়। যেনো গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে যুদ্ধের খবর পড়তে, টিভি দেখতে আগ্রহ তাদের কমেনি। পাক-আফগান বাণিজ্যও যে থেমে নেই, তার জানান দেয় সীমান্তে মাল খালাস করার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সারি।

শহর থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরের চমন সীমান্ত এখনো ভালোভাবেই খোলা আছে। প্রতিদিন আফগান শরণার্থিরা আসছে। আসার জন্যে সীমান্তে ভিড় করছে। সীমান্ত প্রহরীদের লাঠি বাড়িও খাচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে আসা শ'শ' শরণার্থীকে গ্রহণ এবং আত্মীয়করণ করা ছাড়া বেলুচিস্তানের আর কোনো উপায় নেই। অতীতেও ছিলো না। আফগানিস্তানের সঙ্গে বর্ডার বন্ধ করে দেয়ার জন্যে পাকিস্তানের ওপর রয়েছে পাহাড়প্রমাণ আন্তর্জাতিক চাপ। অন্যদিকে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আফগানদের দীর্ঘবন্ধনকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে মা।

৭ অক্টোবর আমেরিকা বেলুচিস্তানের আশপাশের আফগান জেলাগুলোতে বোমাবর্ষণ শুরু করার পর থেকেই আফগানিস্তান থেকে বন্যার স্রোতের মতো লোক সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এসে আশ্রয় নেয় বেলুচিস্তানে। পাক সরকার চমন বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে দাবি করলেও তা আসলে বন্ধ নয়। শরণার্থী এবং সীমান্ত পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে একটি গোপন কারবার চালু আছে। শুধুমাত্র প্রতিদিন কিছু লোক বর্ডার দিয়ে ধরা পড়ে এবং বিকেলে তাদের পুশব্যাক করা হয় আফগানিস্তানে।

পাকিস্তান সরকার যে দাবি করছে, পুরো বর্ডার সীল করে দেয়া হয়েছে এবং যেসব শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া জরুরি তাদেরকে বেছে বেছে এপারের ক্যাম্পে এনে রাখা হচ্ছে তারও সত্যতা নেই পুরোপুরি। সত্যিকার অর্থে আফগানিস্তানের শরণার্থী আসার বিষয়টি পাকিস্তান সরকার প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগ নিতে পারছে না। ইউএনএইচসিআর শরণার্থিদের গ্রহণ করার জন্যে চমন সীমান্তের কিল্লাই ফাইজু এলাকায় এবং সীমান্তের কাছাকাছি ট্রানজিট ক্যাম্প খুলেছে। সরকারকে চাপ দিয়েই তারা এখানে ঘাঁটি করার উদ্যোগ নিয়েছে। গুণে-মানে এখানকার সবচেয়ে ভালো এরিয়ানা নামের একটি হোটেলে তারা শুধু অফিস খোলেনি, পুরো হোটেলই বুক করে নিয়েছে।

পাকিস্তানের আফগান নীতির ঝামেলা বেলুচিস্তানকেই পোহাতে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। এক সময় পাকিস্তান সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড আর্মির আগমন ঠেকাতে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছে। পাকিস্তান ব্যবহৃত হয়েছে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের স্বার্থে। বার বার আফগান শরণার্থিরা বেলুচিস্তান এবং পাঠান অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করে মূলত দ্বৈত নাগরিকত্ব লাভ করেছে। আর পাকিস্তান হয়েছে আফগানিস্তানের অস্ত্র জোগানের এবং হেরোইন পাচারের রুট। ইরান অস্ত্র এবং ড্রাগ মাফিয়ার বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করতে গিয়ে তার ৩ হাজার সৈন্য হারিয়েছে; কিন্তু হেরোইন পাচার এবং বিক্রি মেনে নেয়নি বলে পাকিস্তানই তালেবানদের অস্ত্র এবং হেরোইনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এর আগের বার সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে বোম্বিং করেছে। এবার আমেরিকা করছে। পরিণতিতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো পাকিস্তানের ওপর ক্ষিপ্ত এবং অবন্ধু রাষ্ট্র। আমেরিকা হয়েছে তাদের বন্ধু রাষ্ট্র এবং তারই ধারাবাহিকতায় এখন 'ওয়ার এগেইনস্ট টেরর' এ পাকিস্তানকে বানিয়েছে কোয়ালিশনের পার্টনার। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বোম্বিংকে পাকিস্তান তখন নিন্দা করেছে, এখন আমেরিকান এয়ার স্ট্রাইকর্কে হজম করছে।

আফগানিস্তানে সর্দার দাউদের রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর বেলুচিস্তান ছিলো ফ্রন্টলাইন প্রদেশ। শরণার্থী সমস্যা তার সিকি শতাব্দীর বেশি। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, প্রফেসর বোরহানুদ্দিন রাব্বানী, আহমেদ শাহ মাসুদ এবং অন্যান্য আফগান অতিথিদের আমন্ত্রণ করেছেন। অস্ত্র অর্থ এবং আবাস দিয়েছেন সর্দার দাউদের জাতীয়তাবাদী সরকারকে উচ্ছেদের কাজে। তখন থেকেই বেলুচিস্তানের সম্পদ এবং অঞ্চল ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে অস্থির করার কাজে এবং কাবুল সরকার পাকিস্তানের কাছে বিবেচিত হয়ে আসছে অবন্ধুসুলভ।

শরণার্থীর কারণে যা হয়, আফগানিস্তানের দশ লাখ বা তারো বেশি শরণার্থীর জন্যে বেলুচিস্তানের জমির পরিমান হ্রাস পেয়েছে, পানি সম্পদ কমেছে। বেলুচিস্তানের প্রত্যেক চাকরির জন্যে আফগানরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যেহেতু তারা কম মূল্যে কাজ করতে রাজি, তাই তারা নষ্ট করে দিয়েছে কাজের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের রীতিনীতি। ছোট বড় শহরের হাজার হাজার ঠেলা গাড়ি, গাধার গাড়ির মালিক আফগানরা। এর মাধ্যমে স্থানীয়দের রীতিমতো এ পেশা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এখানকার একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটাতেই ৫০ হাজার আফগানি স্থানীয়দের চাকরি দখল করেছে। স্বাস্থ্যখাতেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাদেশিক সরকারের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল সান্ডিমানের ৬০ শতাংশ রোগীই হচ্ছে পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানের। অন্য অর্থে প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যখাতে যে ব্যয় তার প্রায় অর্ধেক ব্যয় হচ্ছে আফগানদের জন্যে।

দুপুরের পাঠানরা যদি মনে করে এই যুদ্ধ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে, তবে যুদ্ধের ধাক্কাও বোধহয় তাদের সইতে হবে কেয়ামত পর্যন্তই। শরণার্থীর ভার বইতে হবে বেলুচিস্তানকে তখন পর্যন্ত। সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব

আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমা নিক্ষেপ

আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন যাবত বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তালিবান যোদ্ধাদের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে না পেরে মার্কিন বাহিনী এবার তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের ভয়াবহ অস্ত্র 'গুচ্ছ বোমা' ফেলা শুরু করছে। গুচ্ছ বোমা হচ্ছে মুষ্টি আকৃতির মাইন জাতীয় বিস্ফোরক। একটি গুচ্ছ বোমায় ১শ' পর্যন্ত রোমব্লেট এক সঙ্গে থাকে এবং এর প্রতিটির ওজন দেড় কেজি। এই বোমা যেখানে ফেলা হয় সেখানকার সব দাহ্য বস্তু আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এসব বোমা যথার্থভাবে কাজ করে না এবং এর ব্যর্থতা রয়েছে। জাতিসংঘ এ ধরনের বোমা আফগানিস্তানে না ফেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামে এ ধরনের বোমা ফেলায় সেখানকার নিরীহ গ্রামবাসীরা আটকা পড়ে রয়েছে। নিক্ষিপ্ত বোমাগুলো সেখানে অবিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে বলে জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা রিয়ার এডমিরাল জন স্পফ লেবিন এই প্রথববারের মতো স্বীকার করেছেন যে, প্রতিপক্ষ হিসেবে তালিবান বেশ শক্ত। তালিবান যোদ্ধারা প্রাণপণে তাদের দূর্গ রক্ষা করছেন। তালিবান সরকার সেদেশে ইসলামের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাশ্চাত্যের ইহুদী ও নাসারা শক্তি এটা ভাল চোখে দেখছে না। তারা চায় ফুৎকার দিয়ে ইসলামের এই নূরকে (আলো) নিভিয়ে ফেলতে। কিন্তু পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তার এই নূরকে অনির্বাণ রাখবেন– তা কাফের মোশরেকদের কাছে যতই অপছন্দ হোক না কেন। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান এনেছে আর সৎকর্ম করেছে এবং কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবিচল ও সুদৃঢ় থেকেছে তারা সাফল্য অর্জন করবে। আল্লাহর ঘোষণা শুধুমাত্র সেকালের লোকদের জন্যই সত্য ছিল এখন সত্য হবে না তা নয়; বরং এ ঘোষণা আগের লোকদের বেলায় যেমন সত্য হয়েছিল এখনো তা সত্যিই হবে। শেষ পর্যন্ত ঈমানদাররাই সাফল্য লাভ করবে। কেননা আল্লাহ তা'লার ওয়াদা সত্য। তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। এ কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের তরুণ-যুকবেরা জেহাদে যোগ দিতে পাগলপারা হয়ে ওঠেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদের হৃদয় কন্দরে লালিত ঈমানের এই বহ্নিশিখার উত্তাপ সঠিকভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তিন লিখতে পেরেছেন, শহিদী ঈদগাহে আজ জামায়েত ভারী– হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারি। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর পরিচালক রবার্ট মুলার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে আরো সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে। মার্কিন বাহিনী ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক বিদেশী মুজাহিদদের ওপর প্রধানতঃ হামলা চালাচ্ছে। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে আরব ও অন্যান্য দেশের যোদ্ধাদের মনোবল ধ্বংস করতে। পরে তারা তালিবান বাহিনীর উপর ব্যাপকভাবে হামলা চালাবে।

আমেরিকাকে চরম শিক্ষা দেব ঃ মোল্লা ওমর

আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালেবানের শীর্ষ ও আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা ওমর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধ এখনও শুরুই হয়নি। গতকাল রোববার আলজেরিয়ার দৈনিক আল ইমাম পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলে মোল্লা ওমর আমেরিকাকে চরম শিক্ষা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী আফগানিস্তানে টানা তিন সপ্তাহ বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং স্পেশাল ফোর্স নামিয়ে তালেবান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি বলে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনুদ্দীন হায়দার জানান। উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের যোদ্ধারা তাদের অগ্রাভিযানে মার্কিন বাহিনীর সহায়তা নিয়েও তালেবানের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোরাও তালেবানের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এ থেকেই আফগান যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর সাফল্যের ক্ষীণতা ফুটে ওঠে। আক্রমণের ২২তম দিনে কাবুল, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরীফে তালেবান ফ্রন্টলাইনগুলোতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। কাবুলে বোমা হামলায় ১০ নারী ও শিশুসহ মোট ১৫ জন নিহত হয়েছে। বিরোধী জোট নিয়ন্ত্রীত এলাকায় কয়েকদিন আগে নিক্ষিপ্ত একটি অবিস্ফোরিত বোমা শনিবার বিস্ফোরিত হয়ে ১০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ফ্রন্টলাইনগুলোতে হামলার সময় তালেবান যোদ্ধারা বিমান বিধ্বংসী কামান ও রকেট লাঞ্চার ছুড়ে জবাব দেয়। তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি একটি তালেবান ফ্রন্টলাইনে যৌথ বাহিনী গতকাল প্রথমবারের মতো হামলা শুরু করেছে। এদিকে হেরাতের সাবেক গভর্ণর ও যুদ্ধবাজ তালেবান বিরোী নেতা ইসমাইল খানের অনুগত বাহিনী গতকাল জানিয়েছে, তারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ 'কালা নাও' শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। তালেবানের সঙ্গে তীব্র লড়াই করে তারা শহরের ২ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছে বলে খান বাহিনীর মুখপাত্র সাইয়িদ নাসির আহমেদ আলভী জানান।

তালেবান শাসনের অবসান ঃ ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ট্র্যাজিডির প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়দা গ্রুপকে নির্মূলের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মূলত কিছু বেসামরিক নিরীহ আফগানকে হত্যা করা ছাড়া মূল লক্ষ্যে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। এ অবস্থায় বুশ প্রশাসন নতুন কৌশলের চিন্তা-ভাবনা করছে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে দীর্ঘদিন পর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে বুশ সিআইএকে গুপ্তহত্যার ক্ষমতা দিতে চাচ্ছেন। এর ফলে সিআইএ নির্দিষ্ট চিহ্নিত ব্যক্তিকে গোপনে বা আততায়ী হামলার মাধ্যমে হত্যা করতে পারবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করেছিল, সিআইএ এ ক্ষমতাদানের মধ্য দিয়ে সে নীতির তিরোধান ঘটবে। এদিকে আমেরিকায়

এফবিআই ও অন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের সাম্প্রতিক তদন্ত থেকে অ্যানথ্রাক্স আক্রমণ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছে। কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, কেবল লাদেন কিংবা আল কায়দা গোষ্ঠীর অনুসারীরাই নয়, আমেরিকার অভ্যন্তরে কিছু চরমপন্থী ব্যক্তিও অ্যানথ্রাক্স সন্ত্রাসের সংগে জড়িত থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তারা কিছু প্রাথমকি ক্লু পেয়েছেন বলে কর্তারা জানান। সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ যত শিগগীর সম্ভব আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শেষ করে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে কোনপ্রকার রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে না দেয়ার জন্যও তিনি বুশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আফগানিস্তানে দীর্ঘ লড়াইয়ের সমর্থনদানের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের ধৈর্যধারনের জন্য বলেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র বলেছেন, আফগান যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালও চলতে পারে। এদিকে জর্ডানের বাদশা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সন্ত্রাস তাড়ানোর নামে যুক্তরাষ্ট্র কোন আরব দেশে হামলা চালালে তা চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে বলে হুশিয়ার করে দেন। এএফপি, এপি, রয়টার্স বিবিসি, সিএনএন।

তালেবান শীর্ষ নেতা মোল্লা ওমর আলজেরিয়ার আল ইমাম পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধ এখনও শুরুই হয়নি। তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, 'আমরা আমেরিকাকে রাশিয়ানদের চেয়েও কঠোর শিক্ষা দেব। তিনি বলেন, তাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) প্রযুক্তিগত প্রাধান্যের কারণে আমেরিকার বিরুদ্ধে তালেবান বাহিনী প্রকৃত লড়াইয়ে এখনও নামেনি। তার অনুসারীরা মার্কিন বাহিনীকে কোন রকম ছাড় দেবে না বলে মোল্লা ওমর হুশিয়ার করেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে আফগানিস্তানে টানা তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে তালেবান শাসকদের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা খর্ব করতে পারেনি। তালেবান সমর্থকদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি এবং তালেবান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষ্যে শুরু করা এ অভিযানে এ যাবৎ সাফল্য নেই বললেই চলে। আফগানিস্তানে কর্মরত ত্রাণ কর্মীদের এবং বিরোধী জোটের কমান্ডারদের মূল্যায়ন থেকে এ চিত্র পাওয়া যায়।

ওসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষ সহযোগীদের হত্যার জন্য আমেরিকা এবার সিআইএ কে গুপ্তহত্যার ক্ষমতা দিয়ে মাঠে নামাচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরূপ শিক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও তৎকালীন তিনজন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'নির্দিষ্ট গুপ্তহত্যা' নিষিদ্ধ করে। ওয়াশিংটন পোস্টের এক খবরে গতকাল বলা হয়, বুশ প্রশাসন ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে। কারণ, ওসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষ সহযোগীদের হত্যা অথবা

গ্রেফতারের যে নির্দেশ প্রেসিডেন্ট বুশ দিয়েছেন, তা কার্যকার করতে হলে ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। এছাড়া সিআইএ এবং স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডারদের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয়ের ব্যাপারেও একটি নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন পোস্ট শনিবার এক খবরে জানান, সিআইএ এবং এফবিআই'র তদন্ত কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে জড়িত নন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার এমনসব চরমপন্থী ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া অ্যানথ্রাক্স জীবাণু অস্ত্র আক্রমণের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে তারা এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাননি বলে কর্মকর্তারা জানান।

মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো শনিবার রাতভর এবং রোববার সকালে কাবুলে তালেবান ফ্রন্টলাইনে অবস্থান এবং রাজধানীর উত্তরাঞ্চলে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে। কাবুল থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এই হামলায় অন্তত ১২ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জন শিশুও রয়েছে। সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় বোমা হামলায় এসব শিশু মারা যায়।

আফগান বাহিনীতে যোগদানের অপেক্ষায় ঃ 'আমাদের ভাই মুসলমানদের রক্ষা করব'– এই শ্লোগন নিয়ে হাজার হাজার সশস্ত্র পাকিস্তানী আফগানিস্তানে তালেবানদে সঙ্গে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান শরণার্থী এববং পাকিস্তানের নাগরিকরা আফগান শরণার্থী এবং পাকিস্তানের নাগরিকরা সীমান্তবর্তী ছোট শহর লাঘারে জড়ো হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানে অবস্থানরত আফগান শরণার্থী এবং পাকিস্তানের নাগরিকরা সীমান্তবর্তী ছোট শহর লাঘাড়ে জড়ো হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লাঘার থেকে মাত্র চার মাইল দূরে তালেবানদের সঙ্গে চেচেন এবং আরবসহ অনেক বিদেশী যোদ্ধা রয়েছে। তাদের মতো পাকিস্তানীরাও তালেবানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। এদিকে মার্কিন বাহিনীর জয়েন্ট স্টাফের ডেপুটি ডিরেক্টর অপরেশন রিয়ার এডমিরাল জন স্টাফ লিবিম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিটিশ সৈন্যরা শীতের আগেই কঠিন হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

জার্মান চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রধান রুড লবার্স আফাগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এ ব্যাপারে বলেছেন, পাকিস্তান যদি সীমান্ত খুলে দেয় তাহলে আরও অতিরিক্ত ২০ লক্ষাধিক শরণার্থী পাকিস্তানে চলে আসবে। শরণার্থীদের এই বিরাট বোঝা বহণের ক্ষমতা তার দেশের নেই বলে জেনালেল মোশাররফ জানান।

আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের ঘটনাপঞ্জী

তালিবানরা ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর সেখানে তথা বর্হির্বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তালেবান মুজাহিদরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছ থেকে কাবুল দখল করে সাবেক প্রেসিডেন্ট নযিবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আইন চালু করে। প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দীন রব্বানীর ক্ষমতাচ্যুত সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ তার জন্মস্থান পানশীর উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

১৯৯৬ সালের ১০ অক্টোবর মাসুদ সমর্থিত অংশ জাতিগত উজবেক জেনারেল আবদুল রশিদ দোস্তামের তালেবানবিরোধী বাহিনী ও শিয়া মুসলিম গোষ্ঠী হেজবে ওয়াহাদাতের সঙ্গে একটি জোট গঠন করে।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে দোস্তামের প্রতিনিধ জাতিগত উজবেক বংশোদ্ভূত জেনারেল আবদুল মালেক কৌশলগত উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজার-ই-শরীফ দোস্তামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তালেবানদের সঙ্গে একটি জোট গঠন করেন।

২৪ মে তালিবানরা দোস্তামের শক্ত ঘাঁটি মাজার-ই-শরীফ প্রবেশ করলে দোস্তাম শহর ছেড়ে পালিয়ে যান।

২৮ মে তালিবানদের সঙ্গে জোট গঠনকারী জেনারেল মালিক তাদের বিরোধিতা করলে তালিবানরা মাজার-ই-শরীফে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৬শ' তালেবান নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

৩০ মে হেজবে ওয়াহাদাত কেন্দ্রীয় গোরবান্দ উপত্যকা এবং মাসুদের বাহিনী কাবুলের উত্তরাঞ্চলীয় জামাল সিরাজ শহর দখল করে নেয়।

২৪ জুলাই মাসুদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী কাবুলের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে অগ্রসর হয়। অবশেষে তারা তালেবানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

২১ আগস্ট মালিকের অনুগত সৈন্য ও দোস্তামের বাহিনীর মধ্যে মাজার-ই-শরীফের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে।

১৯৯৭ সালের ১২ দেপ্টেম্বরের মধ্যে দোস্তামের বাহিনী পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

১৯৯৮ সালের ৯ আগস্ট তালিবানরা পুনরায় মাজার-ই-শরীফ দখল করে এবং দোস্তাম আবার পালিয়ে যান।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো আফগানিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা বিশেষ করে শিয়া মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের জন্য তালেবানদের দায়ী করে।

২০ আগস্ট কেনিয়ার ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসের ওপর বোমা হামলায় ২২৪ জন নিহত ও ৫ হাজার মানুষ আহত হয়। এর ১৩ দিন পর যুক্তরাষ্ট্র চরমপন্থীদের প্রশিক্ষণ শিবির লক্ষ করে অবিরাম প্রচণ্ড ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার লক্ষ্য হচ্ছে তালেবানদের মেহমান সৌদী ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে সর্ম্পূভাবে ধ্বংস করা।

একই বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর তালেবান মিলিশিয়ারা হেজবে ওয়াদাতের শক্ত ঘাঁটি হাজারাজাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তালেবানরা দেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে বিশ্বে শুধু পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব তাদের কূটনৈতিকভাবেব স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৯৯ সালের ১৪ মার্চ তালেবান ও বিরোধী জোট তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় ক্ষমতা ভাগাভাগির একটি চুক্তিতে সম্মত হয়। এপ্রিলের দিকে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে আবার শত্রুতা শুরু হয় এবং তালিবানরা হেজবে ওয়াহাদাতের শক্ত ঘাঁটি মধ্যাঞ্চলীয় বামিয়ান শহরে তাদের নিয়ন্ত্রন হারায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের মে মাসেই তালিবানরা পুনরায় শহরটি দখল করে নেয়।

২৪ আগস্ট শীর্ষস্থানীয় তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে তালিবানদের শক্ত ঘাঁটি কান্দাহারে তার প্রাণনাশের চেষ্টায় পুঁতে রাখা এক ট্রাক বোমা বিস্ফোরণের হাত থেবে বেঁচে যান।

১৪ নভেম্বর বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞাসহ তাবোনদের ওপর সর্বপ্রথম জাতিসংঘ অবরোধের প্রতিবদে বিক্ষোভকারীরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তর সমূহে ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ চালায়।

২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান সংস্থার একটি ছিনতাইকৃত যাত্রীবাহী বিমান কান্দাহারে অবতরণ করে। ভারত বেশ কয়েকজন কাশ্মীরী মুসলিম বিচ্ছিন্নতাকারীকে মুক্তি দেয়ার পর আটক যাত্রীদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়।

২০০০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী কাবুল থেকে মাজার-ই-শরীফগামী এরিয়ানা বিমান সংস্থার একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই হয়। অবশেষে এটিকে বৃটেনে অবতরণ করানো হয় এবং সেখানে ১০ ফেব্রুয়ারী ছিনতাইকারীরা আত্মসমর্পণ করে ও ১৭০ জন যাত্রীকে মুক্ত করে দেয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর তালিবানরা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তালোকান শহর দখল করে নিলে লাখ লাখ শরণার্থী শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৩ নভেম্বর তালিবানরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় সম্মতি প্রদান করে।

২০ নভেম্বর তালিবানরা রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জাহির শাহের একটি শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে।

২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে আবার জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করা হয় এবং তালিবানরা শান্তি আলোচনা বর্জন করে।

২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তালিবানরা কাবুলে জাতিসংঘের অফিসসমূহ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ঘোষণা দেয়।

গত ১ মার্চ আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালিবানরা বামিয়ান প্রদেশের বিশাল বৌদ্ধ মূর্তির ধ্বংস সাধন করে আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষোভের সঞ্চার করে। তালেবান বিরোধী জোটের নেতা মাসুদ গত এপ্রিল প্যারিস স্ট্রার্সবুর্গ ও ব্রাসেলস সফর করেন। গত আগস্টে আফগানিস্তানে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের দায়ে আটজন বিদেশী ত্রাণকর্মী এবং তাদের আশ্রয়দানকারী ১৬ জন আফগান নাগরিককে কাবুলে গ্রেফতার করা হয়।

৯ সেপ্টেম্বর মাসুদ আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হর।

গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে ছিনতাইকারীদের তিনটি বিমান হামলায় নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ৫ হাজারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়।

১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেন ও তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে দায়ী করে।

১৫ সেপ্টেম্বরে বিরোধী নেতারা মাসুদের নিশ্চিত মৃত্যুর খবর দেয়। তালিবানরা আফগানিস্তানে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিককে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন হামরঅয় পার্শ্ববর্তী কোন দেশ সহযোগিতা করলে সেসব দেশের ওপর পাল্টা হামলা চালানোর হুমকি দেয়া হয়। আফগানিস্তানের ইসলামী চিন্তাবিদগণ গতগণ ২০ সেপ্টেম্বর তালেবান শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিন লাদেনকে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান। এর জবাবে তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর জানান, তিনি ধর্মীয় চিন্তাবিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবেন। তাবে বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বহিস্কারের কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।

২৫ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব কাবুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

২৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তালেবানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় তালিবানরা তাদের প্রধান মিত্র পাকিস্তানের সমর্থন হারায়।

গত ১ অক্টোবর রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের বাদশাহ জাহির শাহের সঙ্গে আলোচনার পর তালেবান বিরোধীরা আফগানিস্তানে একটি পরিবর্তনমূলক সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২ অক্টোবর ক্ষমতাচ্যূত্য তালেবানদের পক্ষ থেকে রোম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ নয়– মধ্যস্থতার আহ্বান জানানো হয়। ৬ অক্টোবর এক হাজার এলিট মার্কিন সৈন্য উজবেকিস্তানে পৌছে। সেখানে ওয়াশিংটন ও লন্ডনের প্রায় ৫০ হাজার রণতরী আফগানিস্তানের সন্ত্রাস বিরোধী মার্কিন হামলার জন্য অপেক্ষমান ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিন লাদেনকে হস্তান্তরের সময় ফুরিয়ে আসছে বলে তালেবানদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

৭ অক্টোবর মার্কিন জোটের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক হামলা চালানো হয়।

২৬ অক্টোবর ক্ষমতাসীন তালেবানদের বিরুদ্ধে জাতিগত পশুতুন উপজাতিদের প্ররোচিত করার অভিযোগে তালিবানরা আফগান প্রতিরোধের নায়ক আব্দুল হকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

৯ নভেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা মাজার-ই-শরীফ দখল করে নেয় এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।

আমি সেই দিন হব শান্ত

মুসলিম জাতির জীবনে যত রকম সমস্যা আর সম্ভাবনা আসতে পারে, সেসবের সমাধান ও বিশ্লেষণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক দিয়ে রেখেছেন। ইসলামের প্রধানতম ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম হলো– 'ভালো বা মন্দ ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।' মুসলমান মাত্রই তাকদীরে বিশ্বাসী যা তার ঈমানেরই অংশ। জনৈক সাহাবীর উক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলতেন, 'একজন মানুষ তাকদীর বা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যে বিশ্বাস করার পর আবার সে উদ্বিগ্ন হয় কিভাবে।'

পবিত্র কুরআনের শুরুর দিকেই আল্লাহ পাক বলেছেন, 'অতীত যুগের নবী ও তাদের অনুসারীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে অস্থির অবস্থায় বলে উঠতো, 'মাতা নাসরুল্লাহ্'– 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' তখনই আল্লাহ জবাব দিয়েছেন যে, এই তো আল্লাহর সাহায্য খুব সন্নিকটে! আর বর্তমান যুগের উম্মতে মুহাম্মদী কি ভেবেছে যে, ঈমান এনেছ বলেই তোমাদের কেল্লা ফতে হয়ে গেলো! আল্লাহ কি তোমাদের মধ্য থেকে কারা ঘরে বসে থাকলে আর কারা রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লে; দেশহারা, ঘরছাড়া হলে, তার হিসাব নেবেন না! আল্লাহ কি তাঁর রাহে জীবন-যৌবন, সুখ-সম্পদ সব বিলিয়ে দেয়ার পরীক্ষা নেবেন না! 'কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই শুধু ঈমান এনেছি বলেই কি তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে ধরে নিয়েছ?' এ তো আল্লাহরই বাণী।

আল্লাহ পাকের দেয়া ফরয বিধান 'জিহাদ' কিয়ামত পর্যন্ত ফরয থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জাহির থাকবে'– সংশয় বা শিথিলতার বিন্দুমাত্র অবকাশও শরীয়তে মুহাম্মদীতে নেই। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কবিতার দু'টি চরণ এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে বলে মনে হয় না। কবির ভাষায়–

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম-বাতাসে রণিবে না।
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত।

'যতদিন না ফিতনা বা শিরক ও জুলুম নির্মূল না হয়, ততদিন হে ঈমানদারগণ তোমরা অবিশ্বাসী ও জালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।'

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর এই প্রত্যক্ষ নির্দেশ কি জেহাদের উৎসমূল নয়?

বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকার ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের তালেবান বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা ত্যাগে যে সব বন্ধু জিহাদী শক্তির বিষধর বলে ভাবছেন, তারা কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল করছেন না যে, খৃঃ ১৮৩১ সালে বালাকোটে কি ইসলামী জিহাদ পরাজিত হয়েছিল? ১৮৫৭

সালে কি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর সরকার হেরে গিয়ে, শামেলির যুদ্ধে হাফেজ জামেন (রহঃ) শহীদ হওয়ায় কি ইসলামের বিপর্যয় সাধিত হয়েছিল। এক সময় ভারতের গণবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে কি স্বাধীনতার চেতনা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল? অবশ্যই নয়। এরা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন; কিন্তু পরাজয়বরণ করেননি। ধ্বংস হয়ে যাবো, তবুও পদানত হব না। মরে যাব, তবু পরাভব মানব না, এইতো ঈমানদারের কথা। হযরত সুমাইয়া, হযরত খুবাইব, হযরত হামযা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব, হযত হানাযালা, হযরত আবু দোজানা আর হযরত মুসআব এর মত প্রাণাধিক প্রিয় শহীদ সাহাবী ও সাহাবীয়াগণের নাম নিলেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রায়িাল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন। বিশ্বের সকল কুফুরীশক্তি, তাদের ভীরু-কাপুরুষ গোলাম (অথচ নামধারী মুসলিম) গোষ্ঠী এক হয়ে পৃথিবীর একটিমাত্র নিখুঁত ইসলামী ও জিহাদী রাষ্ট্রশক্তিকে নির্মূল করার জন্য খোড়া যুক্তি এবং নামমাত্র অজুহাত তূলে যে অমানবিক মহাযুদ্ধ শুরু করেছিল, এরই এক কঠিন পর্যায়ে জনগণের মানষিক সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য, নিতান্ত কৌশলগত কারণে, যুদ্ধীতর আওতায় তালেবান যোদ্ধারা নিজ ইচ্ছায় দেশের রাজধানীসহ অধিকাংশ এলাকা দেশীয় কম্যুনিস্ট, মার্কিনভজা ইসলামী সংগঠন, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, গোষ্ঠীগত ইত্যাদি মিশ্রশক্তি 'নর্দান এ্যালায়েন্স'-এর হাতে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে আমেরিকা ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের আফগানিস্তানের পাথুরে জমিনের গভীরে টেনে আনার যে পন্থা গ্রহণ করেছে, এর চেয়ে যৌক্তিক আর কোন উপায় কি এ মুহূর্তে কোন শুভার্থীর জানা ছিল?

বিশাল-বিপুল তালেবান সমরশক্তিকে অস্ত্র, অর্থ, কৌশল, শৃঙ্খলাসহ ভবিষ্যত ব্যাপক যুদ্ধের জন্য নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার যে অপূর্ব কৌশল মোল্লা ওমর গ্রহণ করেছেন, এজন্য গোটা মুসলিম উম্মাহর তরফ থেকে এমন মহান সেনানায়ককে মোবারকবাদ জানাতে হয়।

মোটকথা, কোন কালে, কোন স্থানে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জয়-পরজয়নের সাথে চিরন্তন ইসলামী জিহাদকে সীমাবদ্ধ করা কখনোই উচিৎ নয়। আল্লাহ বিশ্বব্যাপী প্রতিটি জিহাদী শক্তির হেফাজত করুন। ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটবর্তী। আর শুভ পরিণাম কেবল ঈমানদার-পরহেজগারদের জন্যই নির্ধারিত।

আফগান রণাঙ্গনে মার্কিনীদের বিপর্যয়ের অজানা কাহিনী

গত ৭ অক্টোবর, ২০০১ তারিখ থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান চলছে। আমরা প্রতিদিনই পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে রণাঙ্গনের খবরাখবর পাচ্ছি। আমাদের পক্ষে এসব খবরের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। বিকল্প কোন উৎস থেকেও প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় নেই। বহির্বিশ্বের যে কোন ঘটনা জানার জন্য আমরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্যের ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর কম-বেশী নির্ভরশীল। এ ধরনের নির্ভরশীলতার জন্য আমরা আফগান রণাঙ্গনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পাচ্ছি। এতে আমাদের মাঝে এমন একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে, আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য ও তাদের দোসররা বিনা প্রতিরোধে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা কাপুরুষের মত মার খাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার পরিস্থিতি মোটেও সেরকম নয়। আফগান ও রণাঙ্গনে শ'শ মার্কিন সৈন্য হতাহত হচ্ছে এবং তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আল্লাহর সাহায্যও লাভ করছে। এসব ঘটনা পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো চেপে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যকে কখনো চেপে রাখা সম্ভব নয়। আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থা বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলো ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তবে এতে আজাম ডট কম মোটেও বিচলিত নয়। সাহসের সঙ্গে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ বৃটেনভিত্তিক মুসলিম পরিচালিত আজাম ইন্টারনেট সংস্থা পরিবেশিত আফগান রণাঙ্গনের কিছু খবরাখবর পাঠকদের জানাতে চাই।

আফগান রণাঙ্গনে অসংখ্য মার্কিন সৈন্য নিহত হচ্ছে ঃ লন্ডনভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার এন্ড পীস রিপোর্ট-এর খবরে বলা হয়েছে যে, উজবেকিস্তানের খানাবাদে মার্কিন বিমানঘাটিতে প্রতিদিনই আফগান রণাঙ্গনে হতাহত মার্কিন সৈন্য বোঝাই বিমান এসে পৌছছে। খানাবাদ বিমানঘাটিতে কর্মরত উজবেক সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, আফগানিস্তান থেকেও ঘাঁটিতে প্রচুর মার্কিন সৈন্যের লাশ আসছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন খানাবাদ বিমানঘাটিতে ৪/৫টি করে হেলিকপ্টার এতে পৌছেছে। প্রতিটি হেলিকপ্টারে ১০/১৫ জন মার্কিন সৈন্যের লাশ ছিল। উজবেক সেনা কর্মকর্তাদের কাছে মার্কিন ষ্টাফরা স্বীকার করেছে যে, এসব সৈন্য আফগানিস্তানে নিহত হয়েছে। একজন সাংবাদিক খানাবাদ বিমানঘাটিতে ঢোকার সুযোগ পান। তিনি গিয়ে দেখতে পান যে, একটি ভবনের পুরো মেঝে এবং ৪টি বড় তাঁবু আহত মার্কিন সৈন্যে বোঝাই হয়ে রয়েছে। এসব সৈন্যের কারও গুলী লেগেছে হাতে-পায়ে অথবা মাথায়। আহতদের মধ্যে কতজন মারা গেছে বিমানঘাঁটির কোন সূত্র তা জানাতে পারেনি। একজন উজবেক সৈন্য জানিয়েছেন যে, তিনি ১৫ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন মার্কিন পরিবহন বিমানে অন্তত ২০টি করে কফিন উঠাতে মার্কিন সৈন্যদের সাহায্য করেছেন। মার্কিন সৈন্যরা একজন উজবেক

সেনা কর্মকর্তাকে বলেছে যে, খানাবাদ বিমানঘাঁটিতে নিয়ে আসার পথে তাদের আহত ৪২৯ জন সঙ্গী মারা গেছে। একজন উজবেক পাইলটের সঙ্গে একজন মার্কিন সৈন্যের ভাব হয়। কিন্তু হায়। সেই মার্কিন সৈন্যটিও মাজার-ই-শরীফে কথিত কারা বিদ্রোহে নিহত হয়েছে। পেন্টাগন বলছে যে, মাজার-ই-শরীফে মাত্র একজন সিআইএ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। কিন্তু উজবেক পাইলট বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি জানিয়েছেন যে, মাজার-ই-শরীফে প্রচুর মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। এটা ছিল একটি ভয়ংকর লড়াই।

আফগানিস্তানে হামলা চালানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন শুরু করে। প্রথমেই আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ উজবেকিস্তানের খানাবাদ ঘাঁটিতে মার্কিন সৈন্যরা অবস্থান নেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মার্কিন সৈন্যরা তাদের উজবেক সহযোগীদের কাছে দম্ভভরে বলছিল যে, তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধাদের পরাজিত করতে দেড় মাসের বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু এখন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখে মার্কিন সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েছে। হতাশা থেকে খানাবাদে মোতায়েন বহু মার্কিন সৈন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। তাদের হতাশা খুবই গভীর। মার্কিন সৈন্যদের মনোবলে চিড় ধরেছে এবং প্রায়ই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করছে। এগুলো উজবেক সৈন্যরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছে।

আরব মুজাহিদদের জন্য গায়েবী সাহায্য ঃ ডিসেম্বরের এক শনিবারে অপরাহ্নে তালিবানবিরোধী পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যরা তোরাবোরা পাহাড়ে মুজাহিদ অবস্থানে সাঁড়াশি হামলা শুরু করে। আরব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল সবচেয়ে তীব্র হামলা। পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হাজী কাদের। তার বাহিনীকে মার্কিন বিমান ও স্পেশাল ফোর্স সহায়তা দিচ্ছিল। মার্কিন বিমান হামলায় মুজাহিদদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদেরকে পিছু হটতে হয়। এসময় তাদের কাছে হালকা অস্ত্র ছাড়া লড়াই করার মত আর কোন সর াম ছিল না। আরব মুজাহিদরা পণ করেছিল যে, তারা বন্দী হওয়ার পরিবর্তে লড়াই করে শহীদ হবে। মুজাহিদরা যখন পিছু হটে যায় তখন পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মার্কিন স্থল সৈন্যও ছিল। এমন সময় আকাশ থেকে যৌথ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হতে থাকে। এ বোমাবর্ষণে তৎক্ষণাৎ যৌথ বাহিনীর ৩শ সৈন্য নিহত হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি গায়েবী সাহায্য। এ সাহায্য না পেলে মুজাহিদরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছেন। যৌথ বাহিনীর ১শ' সৈন্যকে আটক করে। যৌথ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯শ' এবং মুজাহিদরা ছিল সংখায় মাত্র ৫শ'। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এ সুসংগঠিত হামলায় নেতৃত্ব দেয় উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাগণ। লড়াই শেষে এদের ছিন্নভিন্ন লাশ রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুজাহিদদের এই অভাবিত

বিজয়ের পর পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর কমাণ্ডার হাজী কাদের আরও মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েনের অনুরোধ জানান।

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট বাহিনী ঃ তোরাবোরায় অগ্রাভিযানে ব্যর্থ মার্কিন জঙ্গীবিমান তোরাবোরায় মুজাহিদ অবস্থানে ১৫ হাজার পাউণ্ডের ডেইজিকাটার বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্লাস্টার বোমা, নাপাম বোমা, কার্পেট বোমা, অক্সিজেন বিনাশী বোমার মত মারণাস্ত্র ব্যবহার করেও মুজাহিদদের কাবু করতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র ডেইজিকাটার বোমা নিক্ষেপ করছে। এ ভয়ংকর বোমা হামলা সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলীয় জোট তোরাবোরায় মুজাহিদ অবস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমাণ্ডার হযরত আলী ও হাজী জহির বেশ কিছুদিন ধরে দাবী করছেন যে, তাদের অধীনস্থ ৩ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তোরাবোরায় হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে, তাদের অধীনস্থ মাত্র সাড়ে ৪শ' সৈন্য এ অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। এদের মধ্যে ২শ' রয়েছে হযরত আলীর নেতৃত্বে এবং আড়াইশ সৈন্য রয়েছে হাজী জহিরের নেতৃত্বে। আমেরিকানদের কাছ থেকে ডলার খসিয়ে নেয়ার জন্যই উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমাণ্ডাররা এমন মিথ্যা দাবী করছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, এতদিনে তারা তাদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তোরাবোরা অঞ্চল দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৫ কিলোমিটার। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় গুহা ও খাদ। জালালাবাদের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে এই অঞ্চলের শুরু এবং পারাচিনারে শেষ। এই দুর্গম অঞ্চলে মার্কিন বোমা হামলায় কোন বিরতি দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিনীরা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তারা বুঝতে পারছে না ওসামা বিন লাদেন জীবিত না মৃত।

কান্দাহার বিমানঘাঁটিতে মুজাহিদদের ভয়ংকর হামলা ঃ ডিসেম্বরের এক মঙ্গলবারে বিদেশী মুজাহিদরা কান্দাহার বিমানঘাঁটিতে মার্কিন মেরিন সৈন্য ও উপজাতি অবস্থানে বড় ধরনের আক্রমণ চালায়। এই ঘাঁটিতে যৌথ বাহিনীর ৮শ' সৈন্য ছিল। মুজাহিদ হামলায় কান্দাহার বিমানঘাঁটি ধ্বংস হয়। মুজাহিদ হামলার যৌথ বাহিনীর প্রায় ২শ' সৈন্য নিহত এবং আরও বহু আহত হয়। এই লড়াইয়ে ২৫ জন মুজাহিদ শহীদ হয় এবং কয়েকজন সামান্য আহত হয়। এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে এখনো লড়াই শেষ হয়নি। মার্কিন মেরিন সৈন্যরা মুজাহিদদের অতর্কিত হামলার ভয়ে এ অঞ্চলে বের হতে সাহস পাচ্ছে না।

একজন মুজাহিদের মোনাজাত ঃ আবু খুলুদ আল-ইয়েমেনী শহীদী কাফেলায় শামিল হয়েছেন। তিনি এমনভাবে শহীদ হয়েছেন যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য গর্বের বিষয়। ৫ ডিসেম্বর আরব মুজাহিদদের দু'টি এলিট ইউনিট মার্কিন এজেন্ট গুল আগার বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে তাখতা পুলের উপকণ্ঠে এগিয়ে যায়। ইয়েমেনের আবু খুলুদ দিচ্ছিলেন প্রথম ইউনিটের নেতৃত্ব

এবং আবু হানি দিচ্ছিলেন দ্বিতীয় ইউনিটের। প্রতিটি ইউনিটে যোদ্ধা ছিল মাত্র ১৫ জন করে। যেখানে দু'টি ইউনিটের একত্রিত হওয়ার কথা সেখানে যাবার পথে আবু খুলুদ তার সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন যে, এই লড়াইয়ে তিনি শহীদ হবেন। সহযোদ্ধারা তার এ উক্তি হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। রণাঙ্গনে মুজাহিদরা ইসলামের দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লড়াইয়ে গুল আগার বাহিনীর ১৭জন সৈন্য নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। গোলাগুলি কিছুটা কমে আসে। এ সময় কমান্ডার আবু খুলুদ গুলি খেয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যান। তিনি তখন দু'হাত উপরে তুলে মোনাজাত করে বলেন, হে প্রভু, আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার পথে লড়াই করছি। কিন্তু তুমি আজও আমাকে শহীদদের মধ্যে গণ্য করনি। মোনাজাত শেষ হওয়ার সঙ্গে তার শরীরে এসে একটি বুলেট বিদ্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন। আবু খুলুদ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যেখানে মুসলিম উম্মাহ বিপন্ন সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন। বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তানসহ সর্বত্র তিনি লড়াই করেছেন। গুল আগার বাহিনীর সঙ্গে সেদিনের লড়াইয়ে আবু খুলুদ ছাড়া আর কোন মুজাহিদ শহীদ হননি।

আফগান রণাঙ্গনে আরব মুজাহিদরা যে অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিচ্ছে তাতে আমাদের শির উঁচু হয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরে তোরাবোরায় আরব মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত মর্টারের একটি গোলা এসে ইস্টার্ন এ্যালায়েন্সের কমাণ্ড সেন্টারে আঘাত হানে। এ সময় সেখানে ইস্টার্ন এ্যালায়েন্স যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে একটি জরুরী বৈঠক করছিল। এই বৈঠকে পদস্থ মার্কিন কমান্ডার ও হাজী কাদেরের অধীনস্থ আরও কয়েকজন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন। মুজাহিদদের মর্টার হামলায় ইস্টার্ন এ্যালায়েন্সের কমান্ড সেন্টার ধ্বংস হয়। কিন্তু সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এজন্য সংবাদ মাধ্যমে এ ঘটনা প্রকাশিত হয়নি।

দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানের
ঐতিহাসিক উপসম্পাদকীয় ঃ

কাবুলের পতন হলেও শেষ হবে না লড়াই
এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে

আফগানিস্তানে আমেরিকা যে নীতি অবলম্বন করে নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হেনে চলছে, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে তা যদি দীর্ঘদিন অব্যাহতও থাকে; আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি লংঘন করে ওরা যেভাবে বেসামরিক জনবসতি, মাদ্রাসা-মসজিদ, হাটবাজার, আশ্রয় শিবির, খাদ্যগুদাম, হাসপাতাল ধ্বংস করে চলছে যদি তা এভাবে জারিও রাখে; হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন-মুসল্লী, পঙ্গু আহত-অসহায় মানুষ, অবলা নারী, মাসুম শিশুদের এভাবে হত্যা করেই চলে

তাহলেও কি এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে? আমেরিকা ও তার মিত্ররা উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটকে অর্থ দিয়ে রসদ দিয়ে, সেনা-সৈন্য দিয়ে, পশ্চাৎভাগ রক্ষা করে সম্মুখভাগের বাধা অপসারণ করে, এয়ার সাপোর্ট দিয়ে রাজধানীর দিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা যদি অব্যাহতও রাখে এবং আমেরিকা বৃটেনের স্থলসেনারা ঐ জোটসেনাদের সাথে যোগ দিয়ে সম্মিলিত বাহিনী কাবুলের দিকে যদি অগ্রসর হয়; কিংবা রাজধানী কাবুল যদি তারা দখলও করে নেয়- তাহলেও কি এ যুদ্ধের ইতি হবে? কিংবা যদি এমন হয় যে, সব বিমানবন্দর, শহর-নগর, সামরিক স্থাপনা, তালেবান ও বিন লাদেনের সব ঘাঁটি ইঙ্গ-মার্কিন ও বিরোধী জোটের কব্জায় এসে গেছে, মোল্লা ওমর, ওসামা বিন লাদেন, বিশিষ্ট তালেবান নেতাদের হত্যা করে ফেলা হয়েছে তাহলেও কি শেষ হয়ে যাবে এ লড়াই? অথবা ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা-বৃটেন ও তাদের মিত্ররা নির্বাসন থেকে জহির শাহকে কাবুলে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে, ঘুষ নজরানা দিয়ে কিছু উপজাতীয় সরদারকে তার সভাসদ নিযুক্ত করেছে। বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ ও দু'চারজন গাদ্দার পাখতুনকে নিয়ে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও সামরিক বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব নিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন ধুরন্ধররা। সিআইএ, মোশাদ, 'র'-এর ঝানু ঝানু এজেন্টদের বসানো হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে, সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ, একে বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র। করে যাচ্ছে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা তাহলেও কি লড়াই শেষ হয়ে যাবে? বন্ধ হবে কি রক্তপাত? শান্তি ফিরে আসবে কি আফগানিস্তানে? লক্ষ্য অর্জিত হবে কি আমেরিকা, বৃটেন ও তাদের মিত্রদের? না। তারপরেও যুদ্ধ শেষ হবে না। লড়াই থামবে না। রক্তপাত বন্ধ হবে না। কারণ যা করা হচ্ছে এবং আরও যা করা হবে তা আফগান জনগণের স্বার্থে করা হচ্ছে না। তাদের বোধ বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে করা হচ্ছে না। আফগানিস্তানের আমজনতার সমর্থন নেই এর প্রতি। এ সমাধান তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। এ আর এক গোলামী। এ আর এক দখলদারী। এ আর এক আগ্রাসন, স্বাধীনতা হরণ। এ আগ্রাসনের অবসানের জন্য, এই নব্য গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য লড়াই তখনো চলতেই থাকবে।

এটা আফগানিস্তান। এরা আফগান। এরা শির দেয়, আমামা দেয় না। জান দেয়, শেকল পরে না। এরা চির দুর্দম, দুর্বার দুর্জয়। এরা চিরমুক্ত, চির স্বাধীন। আত্মমর্যাদাবোধ এদের হিন্দুকুশের চেয়েও উঁচু। খাইবার, তুরখাম, পানশিরের পাথরের চেয়েও কঠিন এদের সংকল্প। তাদের এসব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে, তাদের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বলের সাথে যুক্ত হয়েছে ইসলাম। যুক্ত হয়েছে, ঈমানের নূর, একীনের তেজ, জিহাদের জজবা, শাহাদাতের তামান্না। এ দুয়ে মিলে ওদের মধ্যে এসেছে হায়দরী হিম্মৎ, খালেদ, তারেক, মূসার বাজুর তাকত। তাই ওদের কবি গাইতে পারে, আমরা আফগানরা, ঈমানের নূর সুরাইয়া সিতারার জগতে গিয়ে পলায়ন করলেও তা এই মাটিতে নামিয়ে আনি।

ওরা শেয়ালের জিন্দেগী নিয়ে শতবর্ষ বাঁচার চেয়ে সিংহের জীবন নিয়ে একদিন বেঁচে থাকাকেও শ্রেয় মনে করে। আফগানিস্তান সুলতান মাহমুদ গজনবীর দেশ। শেহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরির দেশ। সম্রাট বাবরের প্রিয়তম ভূমি। আফগানিস্তান আহমাদ শাহ আবদালীর দেশ, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির দেশ। মহামনীষী আলবেরুনী, প্যানইসলামীজমের দিশারী জামালুদ্দীন আফগানির দেশ। তালেবান মুহাজিদীনের দেশ, আমীরে শরীয়ত মোল্লা ওমরের দেশ। একুশ শতকের বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেনের স্বাগতিক দেশ। এদেশের তৌহিদী সেনানীরা গোটা দুনিয়ার সাথে লড়াই কবুল করে নেয় তবু মেহমানের বেইজ্জত বরদাশত করে না। এরা সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র, টোমাহক, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক বোমার আঘাত বুক পেতে বরণ করে নেয় তবু সম্মানিত মেহমানকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে না। তাই বিনা দ্বিধায় বলা চলে, এই আফগান জাতি, তালেবান ফৌজ, ঈমানদার পাঠান একজনও বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমেরিকার প্রভুত্ব, বৃটেনের গোলামী রাশিয়ার মাতব্বরী, ভারতের খবরদারী, ইহুদী-নাসারা, পৌত্তলিকদের পায়রবি মেনে নেবে, কবুল করে শুয়ে শুয়ে গোবৎসের মত জাবর কাটবে, সে আশা দূরাশা। আমেরিকা ও তার মিত্রদের সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন। হিন্দুকুশের খাদে খাদে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, গিরি গহ্বরে গহ্বরে গিরিপথের বাঁকে বাঁকে, চড়াইয়ে উতরাইয়ে, কোহেস্তানে, রেগেস্তানে, সমতলে বিয়াবানে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে জিহাদের আগুন, জ্বলতে থাকবে ধিকি ধিকি। যতদিনে না শত্রু সৈন্য নিশ্চিহ্ন হবে, যতদিনে না দেশ দখলদার মুক্ত হবে, যতদিনে না শরীয়াহ শাসনের আওতায় পুরো দেশ আবার ফিরে আসবে, যতদিনে না কায়েম হবে আমান ও সালামত, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা ততদিন জিহাদ জারি থাকবে আফগানিস্তানে। রাজা-বাদশা আমীর-সুলতান, শেখরা, সাম্রাজ্যবাদীদের দাস মুসলিম দেশের শাসকরা কি করছে, না করছে তাতে কিছু যায় আসেনা, এই জিহাদে সারা দুনিয়ার আমমুসলমানদের নিকট থেকে পেতে থাকবে তারা সমর্থন ও সহযোগিতা। আমেরিকা ও তার মিত্ররা স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে, সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে পেরেছে, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, খাদ্য গুদাম চুরমার করে দিতে পেরেছে, ইমাম-মুয়াজ্জিন, মুসল্লী, ডাক্তার-নার্স আহত পঙ্গু মানুষ, অবলা নারী, মাসুম শিশু, অচল বৃদ্ধদের নির্বিচার হত্যা করতে পেরেছে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে শহর-নগর, বিরান করে দিতে পেরেছে জনপদের পর জনপদ, কিন্তু জয় করতে পারেনি সেদেশের মানুষের হৃদয়। বরং সে হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছে অপরিসীম ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা। তাদের হৃদয় রয়েছে তালেবানের সঙ্গে। তাদের ভালবাসা, শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, দোয়া একমাত্র তালেবানদের জন্যই।

কারণ, তালেবানী শাসন আমলে শত্রুর সাথে যুদ্ধ ছিল, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বয়কট ছিল, খাদ্য বস্ত্রের অভাব ছিল সত্য, তারপরও ছিল জান্নাতি

পরিবেশ। ছিল ন্যায় ইনসাফ। ছিল জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা। ছিল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। শাসক ও শাসিতের মধ্যে রাষ্ট্রনেতা ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ছিল না কোন পার্থক্য। শাসকদের বুলন্দ নসীব, আর লাখো নাগরিকের বদনসীব, ওরা বালাখানায় আর এরা ধুলা বালুকায় এমনটা হতে পারেনি। সুখ-দুঃখ সবাই সমান ভাগ করে নিয়েছে। আমীরে শরীয়ত ও সাধারণ নাগরিকের মত শয়ন করেছেন খাটিয়ায়, চিবিয়েছেন শুকনো রুটি। এই শরীয়তী শাসনে কোথাও চুরি হয়নি, ডাকাতি ছিনতাই হয়নি। একটি নারীকেও হতে হয়নি ধর্ষিতা। হারাতে হয়নি ইজ্জত। যদি কোন দিন সমৃদ্ধি আসে, আসে আর্থিক সচ্ছলতা তারও সমান ভাগ পাবে তখন সকলে। ঈমানদার আফগানরা এমন শাসনই কামনা করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তারা পেয়েছিল সেই শাসনই কায়েম করতে। শত অপপ্রচারেও, শত প্ররোচণা ও প্রলোভনেও তাই তালেবানদের প্রতি সেদেশের সাধারণ নাগরিকদের আস্থায় ঘাটতি হয়নি। এ কারণেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশের ৯০% এলাকা তাদের কব্জায় আনা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর রহমত আর জনগণের সমর্থন ও ভালবাসা সম্বল করেই চলছিল তাদের অগ্রযাত্রা। আফগানিস্তানে একটা ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এটা সংহত হওয়ার মওকা মিললে এ বিপ্লব গোটা দুনিয়াকে আলোড়িত করবে এ আশঙ্কা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনৈসলামী দুনিয়ার মনে।

একদিকে মোল্লা ওমরের তালেবান এবং তার পাশে একুশ শতকের ইসলামী বিপ্লবের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেন যিনি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের রাজা বাদশা আমীর শেখ ও ধনকুবেরদের মত বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। তাঁর অর্থ, বিত্ত, মেধা, জীবন, যৌবন সবই উৎসর্গ করেছেন তিনি ইসলামের সেবায়, ইসলামী বিপ্লবকে সফল করার সাধনায়। সুরম্য অট্টালিকা, বিলাসবহুল প্যালেস, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল সজ্জা, আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা, আয়েশ-আরাম পায়ে ঠেলে বেছে নিয়েছেন সাহাবা যিন্দেগী দরবেশী জীবন। ছুটে এসেছেন আফগানিস্তানের পাথুরে জমিনে। পর্বতের চূড়ায়। শয়নকক্ষ বানিয়েছেন গিরিগুহায়। বিছানা পেতেছেন লোহার খাটিয়ায়। আহার করছেন, শুকনো রুটি। কর্মক্ষেত্র তাঁর রক্তঝরা, খুনরাঙা প্রান্তর। নিজেকে বানিয়েছেন তিনি সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু; ইসরাইল, আমেরিকা, বৃটেন, ভারত-রাশিয়াসহ দুনিয়ার তামাম ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক, কাফির, মুশরিক, মুলহিদ, মুরতাদ, খোদাদ্রোহী, নাস্তিক বেঈমান, গাদ্দার মুনাফিকদের হামলার লক্ষ্যবস্তু। তাঁর আহ্বান সত্যিকার ইসলামী আদর্শের দিকে মুসলমানদের ফিরে আসার আহ্বান। পবিত্র আরব ভূমিতে জেঁকে বসা ইহুদী নাসারা আগ্রাসী সেনাদের উৎখাতের আহ্বান। আল্লাহর দেয়া সম্পদে মুসলিম ভাইদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান। ন্যায় ইনসাফ, সাম্য ভ্রাতৃত্ব কায়েমের আহ্বান।

বসনিয়া কসোভোতে খৃষ্টশক্তির হাতে কি মুসলমানদের রক্ত ঝরতেই থাকবে? ফিলিস্তিনে ইহুদীদের হাতে কি কেবল মুসলমান মার খেতেই থাকবে?

চেচনিয়ায় রুশ জালেমদের হামলায় কি মুসলমান শহীদ হতেই থাকবে? কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্বরদের হাতে কি যুগ যুগ ধরে মুসলমান নির্মূল হতেই থাকবে? এর কি কোন প্রতিকার হবে না? মুসলমানের রক্তের কি কোনই মূল্য নেই? না। এর প্রতিকার চাই। মুসলমানদের বাঁচার মত বাঁচতে হবে। অধিকার নিয়ে বাঁচতে হবে। যা ন্যায্য পাওনা তা আদায় করে নিতে হবে। মুসলমান শুধু পরেড় পড়ে মার খাবে না, মার দেবেও। আঘাতের প্রত্যাঘাত করবে। এটা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। মুসলমানরা তাদের সম্পদ কাউকে লুণ্ঠন করে নিতে দেবে না, তা নিজেদের দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে লাগবে। সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না, স্বাবলম্বী হবে। প্রয়োজনে জীবন দেব, ন্যায্যসঙ্গতভাবে জীবন নেবও। আমার ধর্ম, আমার সংস্কৃতি, আমার স্বকীয়তা নিয়ে আমি বাঁচব। অন্যেরাও তাদেরটা নিয়ে বাঁচবে। আমি অন্যেরটায় হস্তক্ষেপ করব না। আমারটায়ও অন্যকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। এজন্য লড়াই করতে হলে করব। প্রাণ দিতে হলে দেব। এ লড়াইয়ের নাম জিহাদ। এ মৃত্যুর নাম শাহাদাত। ওসামা বিন লাদেনের আহ্বান এটাই। ওসামা বিন লাদেন এ জিহাদেই মশগুল। এ জন্য তিনি শহীদ হতে প্রস্তুত। এই জিহাদী প্রেরণা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি বিশ্বব্যাপী। প্রতিটি মুসলিম তরুণকে করে তুলেছেন উদ্দীপিত। প্রতিটি হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছেন শাহাদতের তামান্না। মোল্লা ওমর শহীদ হতে পারেন, ওসামা বিন লাদেন শাহাদাতের শরাবন তহুরা পান করতে পারেন কিন্তু যে জিহাদী জজবা তারা সৃষ্টি করেছেন বিশ্বব্যাপী মুসলিম তরুণদের প্রাণে প্রাণে, যে শহীদী তামান্না জাগিয়ে তুলেছেন তাদের হৃদয়ে হৃদয়ে, তার লয় নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই। ইসলামদ্রোহী শক্তির হামলা যত প্রচণ্ড হবে এ প্রেরণা ততই হতে থাকবে তীব্র থেকে তীব্রতর। তাই কাবুলের পতন হলেও থামবে না জেহাদ। শেষ হবে না লড়াই। নিভে যাবে না আগুন। বরং এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র, সবখানে, বিশ্বব্যাপী।

মুসলিম উম্মাহর ভয়াল দুঃসময়ে, এই ঘোরতর দুর্দিনেও যেটুকু আশার আলো বিচ্ছুরিত, তা হচ্ছে মিল্লাতের তরুণদের মধ্যে এই জিহাদী প্রেরণা, শাহাদাতের তামান্না। তালেবান, মোল্লা ওমর, ওসামা বিন লাদেনের কৃতিত্ব এখানেই, সাফল্য এখানেই। কী মহাবিস্ময়। সারা দুনিয়া হামলে পড়েছে, সর্বত্র আগুন জ্বলছে, ঘাতকরা চারদিক ঘিরে ধরেছে, যে কোন মুহূর্তে দুশমনের বুলেট বৃষ্টি বুক ঝাঁঝরা করে দিতে পারে, তার মাঝে কী নিরুদ্বিগ্ন চেহারা। কী অকুঞ্চিত প্রশান্ত ললাট। জাহান্নামের আগুনের মধ্যে বসেও কী পুষ্পের হাসি। কী শঙ্কাহীন, উদ্বেগহীন সংযত বাক! আল্লাহর ওপর কী সীমাহীন নির্ভরতা! ঈমান একীন কতটা মজবুত হলে এমনটা সম্ভব। যেন জান্নাতের ঠিকানা নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত রয়েছে। যেন তার খোশবুতে বিভোর মাতোয়ারা হয়ে রয়েছেন একুশ শতকের মহাবিস্ময় ওসামা বিন লাদেন। শুধু তিনি নন, এই গুণে গুণান্বিত একদল অনুসারী গড়ে তুলতে পেরেছেন তিনি, এখানেই তাঁর সাফল্য। বসনিয়া, কসোভো, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও এবং এভাবে আরো সব

সাম্রাজ্যবাদীদের জ্বালানো অনলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে এরকম হাজারো লাদেন ও মোল্লা ওমরের অনুসারী। আবার বলছি, তাদের ত্যাগ, তাদের কুরবানী, তাদের হিম্মতকে কেবল প্রাথমিক জামানার মুসলমানদের কুরবানী ও হিম্মতের সাথেই তুলনা করা চলে। তাদের যে শির আল্লাহর কাছে নত হয়েছে সে শির দুনিয়ার আর কোন শক্তির কাছে, কোন পরাশক্তির কাছেই অবনত হবে না। যে হৃদয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, বিশ্বজগতের আর কারো কাছে তা আত্মসমর্পণ করবে না। তারা কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টি চায়, তারই রেজামন্দি কামনা করে, ভয় একমাত্র তাঁকেই করে। রাজ্য জয় তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বিজয় অর্জনই তাদের কাছে মোক্ষ নয়। আল্লাহর ফরমাবদারিতে, তাঁর হুকুম পালনে নিজেদের নিয়োজিত রাখাই তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। তাদের জীবন মরণ একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। সবকিছু আল্লাহতেই নিবেদিত। শাহাদাত তাদের হৃদয়ের তামান্না। তলোয়ারের ছায়াতলে তারা জান্নাত দেখতে পায়। তারা হযরত খুবায়েবের মতই বলতে পারে– লাছতু উবালী হিনা উক্তালু মুসলিমান/বি আইয়্যি শিককিন কানা লিল্লাহি মাসরায়ী। আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে, ঈমানের সাথে যখন আমার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হচ্ছে তখন পরোয়া করি না তোমাদের এই শূল যন্ত্রণা। পরোয়া করি না তোমাদের কামানের গোলা, মেশিন গানের বুলেট বৃষ্টি, গুচ্ছ গুচ্ছ বোমার হামলা, হেলিকপ্টার গানশীপের আক্রমণ, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত। রসদ, ফুরিয়ে যাচ্ছে, যাক। অস্ত্র নিঃশেষ হচ্ছে, হোক। তবু জিহাদ তারা চালিয়ে যাবে। লড়াই অব্যাহত রাখবে। রক্ত ঢেলে যাবে। শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে থাকবে। শেষ মানুষটি, শেষ বুলেটটি, খুনের সর্বশেষ কাতরাটি তারা পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহর নামে নজরানা দিয়ে যাবে। শহীদী খুনের এই কাতরা থেকে জন্ম নেবে দুনিয়ার দিকে দিকে লক্ষ কোটি মুজাহিদ। সেই মুজাহিদ তরুণদের তাদের পিতা-মাতারা তালাবদ্ধ করে আটকে রাখতে পারবে না, শেকলবন্দী করে আটকাতে পারবে না। তালা ভেঙে, শেকল, ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে আসবে, খুনরাঙ্গা প্রান্তরে হাজির হবে, জঙ্গ-জিহাদের দরিয়ায় ঝাঁপ দেবে, রক্তের দরিয়ায় সাঁতার কাটবে। সেই রক্ত পাথার সাঁতারি আবার আসবে জগতে নতুন দিন, জাগবে আবার নতুন আশাতে লক্ষ সূর্য শঙ্কাহীন।

তালিবান বাহিনী আবার রুখে দাঁড়াতে পারে

তালিবান মুজাহিদ বাহিনী আফগান রাজধানী কাবুল থেকে সরে যাবার পর আরো কিছু এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে এবং সমরবিদ ও ভাষ্যকাররা তাদের এই কার্যক্রমকে যুদ্ধকৌশল বলেই মনে করছেন। ইঙ্গ-মার্কিন নির্বিচার বোমা হামলা ও ব্যাপক রক্তপাত এড়ানোর জন্যই তারা নাটকীয়ভাবে সরে গেছেন। তালিবান বাহিনী একত্রিত হয়ে পুনরায় রুখে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে।

আফগানিস্তানে হামলার ৩৮ তম দিনে মার্কিন বিমান জালালাবাদ ও খোশতে তালিবান অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট বাহিনী রাজধানী কাবুল দখলের পর রক্তপাতের ঘটনা কমে এসে পরিস্থিতি ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। আফগানিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদে এ নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছে। কাবুলে ও অন্যান্য শহরে মার্কিন বিশেষ বাহিনী প্রবেশ করেছে এবং বৃটিশ বাহিনী যাওয়ার পর প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজন মার্কিন জেনারেল বলেছেন, কাবুলের পতন হলেও এখনো আল কায়েদা বিপজ্জনক। কান্দাহার শহর এখনো তালিবান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং কুন্দুজের আশপাশে সংঘর্ষ চলছে। এদিকে, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজীর ভুট্টো বলেছেন, কাবুলের পতন পাকিস্তান সরকারের জন্য একটি বিরাট বিপর্যয়। খবর রয়টার্স এপি. বিবিসি, এএফপি'র। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা কাবুলে তাদের দখল জোরদার করার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য প্রদেশে তালিবান যোদ্ধারা নিজেদের প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে। পূর্বাঞ্চলীয় জালালাবাদ শহরের নিয়ন্ত্রণভার এখন একটি পশতুন মিলিশিয়া দল গ্রহণ করেছে। এ মিলিশিয়ারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটভুক্ত নয়। তালিবান যোদ্ধাদের এ নাটকীয় পিছু হটার ব্যাপারে সমর বিশেষজ্ঞদের মনে বেশ সংশয় দেখা দিয়েছে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকালে গতকাল পাকিস্তানী সমরবিশারদ ও আফগান বিশেষজ্ঞ ডঃ পারভেজ ইকবাল চিমা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ তালিবানদের যে শক্তি তাতে তাদের এভাবে পিছু হটে আসার ঘটনাটি একটি যুদ্ধকৌশল বলেই মনে হচ্ছে। মার্কিন-বৃটিশ তীব্র বোমা হামলা এবং ব্যাপক রক্তপাত এড়ানোর জন্যই তালিবানরা হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে পিছু হটে গেছেন। তালিবানদের হিসাবমতে মার্কিন বোমা হামলা এবং উত্তরাঞ্চরীয় জোটির সাথে মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর যৌথ আক্রমণ মোকাবিলা করার চেয়ে তালিবানদের পরিচিত এলাকাগুলোতে একত্রিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই সুবিধাজনক বলে তালিবান কমান্ডাররা মনে করেন। কাবুলসহ দেশের অন্যান্য শহর থেকে তালিবান যোদ্ধাদের হঠাৎ করে পিছু হটার অর্থ রাতারাতি তালিবানদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এমন ভাবা ঠিক নয় বলে ডঃ চিমা মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, তালিবানদের মধ্যে অনেকেই আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। কারণ তাদের যাবার কোন জায়গা নেই, একমাত্র দেশ পাকিস্তান তালিবানদের আশ্রয় দেবে না, ফলে যুদ্ধ ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তালিবানদের কেউ কেউ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রত্যন্ত কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবেন এবং আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

পাকিস্তানে এক মাওলানার হেফাজতে বিন লাদেন?

মার্কিন এবং আফগান সেনারা যখন ওসামা বিন লাদেনের খোঁজে তোরাবোয়া পার্বত্য এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন, ঠিক সে সময়েই কাতারের আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত তার একটি ভিডিও টেপ বার্তা নিয়ে চলছে এখন বিশ্বব্যাপী তোলপাড়। লাদেন নিহত হয়েছেন বলে যখন নানা সূত্র থেকে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে তখনই এই টেপ প্রচার করা হল। এদিকে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, লাদেন বর্তমানে পাকিস্তানে সে দেশের এক মওলানার হেফাজতে রয়েছেন। মুখপাত্র হাবীল বলেন, ওসামা বিন লাদেন মওলানা ফজলুর রহমানের হেফাজতে রয়েছেন। তবে পাকিস্তানের ঠিক কোন অংশে তাকে রাখা হয়েছে সেটা আমাদের জানা নেই। বিন লাদেন ও তার লোকজন এখন আর এখানে (আফগানিস্তানে) নেই বলে হাবীল জানান। মওলানা ফজলুর রহমান তালেবান বাহিনী গঠনে সহায়তা করেছিলেন। এদিকে সদ্য প্রচারিত এই টেপে লাদেন বলেন, ইসরাইলের প্রতি অব্যাহত মার্কিন সমর্থন বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে ১১সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। মোট ৩৩ মিনিট স্থায়ী এই ভিডিও টেপের মাত্র ৪ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। তবে আল-জাজিরা জানিয়েছে, পুরা টেপটিই গতকাল গভীর রাতে প্রচার হওয়ার কথা। প্রচারিত ভিডিও টেপে বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি বিন লাদেনকে বেশ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার গায়ে ছিল যোদ্ধার বেশ, আর পাশে ছিল একটি কালাশনিভ রাইফেল।

লাদেন তাঁর বার্তায় বলেন, 'মার্কিন সমর্থনে ইসরাইল আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে। আমাদের ওপর অন্যায় ঠেকানোর জন্যই আমাদের এই সন্ত্রাস। এ সন্ত্রাস গৌরবের।' আল-জাজিরার এক ঘোষক জানান, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের গত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ৯০ দিন পর লাদেনের এই ভিডিও টেপ রেকর্ড করা হয় বলে খোদ লাদেনই জানিয়েছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল টেপের এই ঘটনাটিকে নিছক প্রপাগান্ডা বা প্রচার হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। সন্ত্রাসকে মহিমান্বিত করার দায়ে আর আফগান সরকারের মুখপাত্র লাদেনের এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তার দেশে পরিচালিত মার্কিন বিমান আক্রমণ আসলে ইসলামের বিরুদ্ধেই হামলা।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, তারা কয়েকদিন আগে বিমান ডাকে টেপটি পেয়েছে। এটি পাঠানো হয়েছে পাকিস্তান থেকে। তবে প্রেরকের কোন নাম ঠিকানা ঐ ডাকে ছিল না। বিবিসির সংবাদদাতা রিচার্ড মিরন বলেছেন, লাদেন ঠিক কোথায় রয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, আর অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন এডমিরাল ইউজিন ক্যারল বলেছেন, লাদেনের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা হয়ত আমরা কোনদিনই জানতে পারব না। গত ৩ নভেম্বরের পর আল-জাজিরা এই প্রথম লাদেনের কোন ভিডিও টেপ প্রচার করল।

নয়া আফগান অন্তর্বর্তী প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইউনুস কানুনী বলেছেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস এ টেপ বার্তা আফগানিস্তানের বাইরে রেকর্ড করা হয়েছে। তবে হেজবে ইসলামী দলের একজন সাবেক কমান্ডারের আতিথ্যে ওসামা এখনো রয়েছেন বলে কানুনী জানান। তিনি বলেন, এ মর্মে আমাদের কাছে কিছু খবর রয়েছে। এএফপির সাথে এক সাক্ষাৎকারে কানুনী জানান, আল-কায়েদা তার ভুখণ্ড হারিয়েছে, নেতৃত্ব নয়। আল-কায়দা যা-তা সংগঠন নয়-এ এক ভয়ঙ্কর নেটওয়ার্ক। খবর বিবিসি, এপি ও এএফপির।

মোল্লা উমরের প্রতি প্রখ্যাত তিন আরব মাশায়েখের ঐতিহাসিক পত্র ঃ

আপনি মুসলিম জাতির গৌরব, সমকালীন ইতিহাসের মহানায়ক বিশ্ব মুসলিম আপনার সঙ্গে আছে

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত তিন মাশায়েখ আল্লামা শায়খ হামুদ ইবনে আকলা আশ-শুআইবী, শায়খ আলী খুদায়র আল খুদায়র ও শায়খ সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উলওয়ান তালিবান-প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ উমরের নামে এক ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন। সম্প্রতি ওয়েব সাইটে প্রচারকৃত এ পত্রে তারা বলেন, আল্লাহতাআলা আপনার হেফাজত করুন এবং আমাদের এ পত্র সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় আপনি প্রাপ্ত হন। প্রখ্যাত আরব আলেমগণ বলেন, আপনার অস্তিত্ব আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য গর্ব ও অহঙ্কারের কারণ। আরব বিশ্বের জাগ্রত জনতা ও আলেম সমাজ আপনাকে ইসলামের মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করেন। কেননা, আপনি আধুনিক যুগে পবিত্র কোরআনের ওপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও পৃথিবীর এক বিশালসংখ্যক নাগরিক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এতে আপনার মানমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগবে না।

প্রতিনিধিত্বশীল আরব ইসলামী চিন্তাবিদগণ আরো বলেন, এই উম্মতের অভিভাবকদের মধ্যে আপনি অন্যতম। বিশ্ববাসীর সামনে এ কথা আজ সুপ্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি আপনার দরদ ও ভালবাসা অন্য অনেকের চেয়ে বেশী। আপনি কুফরের সামনে মাথানত না করার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। বিশ্ব ইসলামবিদ্বেষী শক্তির পক্ষ থেকে আপনার ন্যায় এমন এক আপসহীন নেতার ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রকৃত মর্দে মুমিনের নিয়তি এমনই হওয়ার কথা। আপনি আমাদের সালাম গ্রহণ করুন, আপনার সকল সহকর্মী, বিশেষ করে মোল্লা মোহাম্মদ হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মওলভী আবদুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, মোল্লা দাদ-আল্লাহকেও আমাদের সালাম ও মোবারকবাদ।

যারা আপনাদের শত্রু তারা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সম্মান ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দুশমন। এরা মার্কিনীদের হয়ে আফগানিস্তানে কুফরী সংস্কৃতি চালু করতে চায়। দুনিয়ার সকল অপশক্তি তাদের পেছনে আছে। আপনারা যে কোন উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকুন, চূড়ান্ত বিজয় আপনাদেরই হবে। ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ মুজাহিদদের সাহায্য করা আল্লাহর অমোঘ প্রতিশ্রুতি দেয়া হল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামুদ ইবনে আকলা আশ-শুআইবী, আলী খুদায়র আল খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উলওয়ানের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর মুজাহিদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ! আসাসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ আপনার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান করুন এবং সত্যের ওপর আপনাকে আরো দৃঢ়পদ করে দিন। আল্লাহর দরবারে দোয়া কুরি, আমাদের পত্র যখন আপনার হাতে পৌছাবে তখন আপনি পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। আমীরুল মুমিনীন! মুসলিম উম্মাহর আলেম সমাজের জন্য আপনি গৌরবের প্রতীক। কেননা আপনি এ উম্মতকে 'আনতুমুল আ'লাউনা' বা তোমরাই জয়ী হবে-এ কথার ওপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুগত বিজয় বা শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের মূখ্য না, এখানে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়তের ওপর সুদৃঢ় থেকে যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না, পূর্ণ ঈমানদার হতে পারলে তোমরাই বিজয়ী হবে। এ আয়াত হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে তখন নাযিল করা হয় যখন ওহুদের ময়দানে তাদের এক সাময়িক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, চূড়ান্ত বিজয়। আর ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ থাকাই মুসলমানের বিজয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ইসলামই সুইচ্ছে প্রতিষ্ঠিত থাকবে অপর কোন ধর্মই এর মোকাবিলায় এসে সফল হতে পারবে না।'

ইমাম বোখারী প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছেন, ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ সনদে। তো, মুসলমানরা সাময়িক বেকায়দায় পড়লেও বিজয় ইসলাম ও মুসলমানেরই হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মর্যাদা ও পরাক্রম তো আল্লাহর, তার রাসূলের এবং ঈমানদারদের।' অতএব, পরাক্রম ও মর্যাদা আল্লাহ এবং তার রাসূলেরই। আর ওসব ঈমানদারের যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিরাপোষ। এসব মুমিন আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থার ফলে মর্যাদাবান থাকবে আর আল্লাহর পরাক্রমে সে পরাক্রান্তও হবে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য।

হে আমিরুল মুমিনীন বিশ্ব মুসলিমের একটি অংশ আপনার কর্মের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে অজ্ঞ। কিন্তু এতে করে আপনার মর্যাদায় বিন্দুমাত্রও খামতি আসবে না। আপনি এ উম্মাহর অনেক বড় একজন ব্যক্তিত্ব। অচিরেই আমরা বর্তমান সময়ের ইতিহাস রচনায় হাত দেব, অনাগত প্রজন্মকে আমরা বলে যাব যে, মোল্লা মোহাম্মদ উমর ছিলেন আজকের ইসলামী জগতের মহানায়ক। যদি কোন ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া প্রথমেই আপনাকে শহীদ করে দেয়া হতো তথাপি আপনার অবদান স্বর্ণাক্ষরেই লিপিবদ্ধ থাকত। আপনাকে শহীদ করে দেয়া হতো তথাপি আপনার ইসলামের মৌলিক নীতি পদ্ধতির ওপর দৃঢ়চিত্তে শক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, যখন মুসলিম নামধারী বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্রুসেডারদের সামনে ঝুঁকে পড়েছিল। আমরা সবাই মিলে রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেব যে, এ যুগে মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বড় শুভার্থী ও কল্যাণে-প্রয়াসী ছিলেন আপনি।

আফসোস! আমরা মুসলমানরা আপনার মতো প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। আপনার ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাতির জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের উৎস। বাতিলের সামনে মাথা না নোয়ানো এ মানুষটির প্রাপ্য আমরা দিতে পারিনি। হে আমিরুল মুমিনীন! যখন আপনি আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়েছিলেন তখন সেখানে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। আপনি সেখানে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, সম্মান, সহানুভূতি ও আস্থার পরিবেশ কায়েম করেন। আপনিই তো সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সুফল উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কেননা, ইতোপূর্বে এ মহান জিহাদের মহমূল্যবান অর্জন কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিধর্মীদের চক্রান্তের ফলে নস্যাৎ হতে যাচ্ছিল। তখন এ সর্বনাশ আপনি ঠেকিয়েছিলেন। এমনকি গোটা মুসলিম বিশ্ব নিজ হৃত গৌরব উদ্ধারের প্রত্যাশা নিয়ে আফগান ভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা ভাবত যে, মুসলমানের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা আফগান মুজাহিদদের নীতি অনুসরণেই সম্ভব।

আপনাকে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা হলে আপনি যখন দেশটিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার ঘোষণা দেন তখন আমরা বলেছি, আলহামদু লিল্লাহ। আপনার মাধ্যমে আল্লাহপাক বিশ্বব্যাপী জিহাদকে শক্তিপ্রদান করেছেন। আপনি এম একটি দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যে দেশটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত রক্তমাখা এক ধ্বংসস্তূপ। এ কবরস্থানকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন আপনি। এখানেই, আপনি কায়েম করতে সচেষ্ট ছিলেন ন্যায় ও সুশাসন। শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার দেয়া হয়েছে। শরীয়ত মোতাবেক বিচার ফায়সালা করেছেন। এমনকি কেউ যদি বলে যে, আপনার শাসনকালে একই মাঠে নেকড়ে ও ছাগল চরত, তাহলেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এরপর সারা পৃথিবীর চাপ সত্ত্বেও আপনি মূর্তি উৎখাত করেছেন। যে কাজের জন্য হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটেছিল। তখন আমরা বলেছি যে, বর্তমান যুগে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শ পুনরুজ্জীবনকারী এক মর্দে মুজাহিদের আগমন ঘটেছে। তাওহীদের অর্থ ও মর্মকে নতুন রূপদানকারী এ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলেছি, বহু দিন পর আবার মুসলিম জাতি একজন সাহসী সংস্কারক পেল। মুসলমানের সকল দেশেই আজ কোন না কোন রূপ নিয়ে মূর্তি ও প্রতিমা সংস্কৃতি চালু রয়েছে। কিন্তু আপনি এমন একটি দেশে অবস্থান করা পছন্দ করেননি, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে। আপনার এ তাওহীদী আবেগ আমাদের সকলকে অপার আনন্দ দিয়েছে। আপনি আপনার দেশে খোদাদ্রোহীদের লাঞ্ছিত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে যেমন কাফির-মুশরিক জিম্মিরা লাঞ্ছনার সাথে মুসলমানদের কর দিয়ে বসবাস করত। আমরা বলেছি, আফগানিস্তানে আজ নতুন যুগের নতুন উমর ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। দুনিয়াব্যাপী আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা ইসলামী মর্যাদার স্বপ্নভূমি আফগানিস্তানের পানে ছুটে যেতে শুরু করলে স্থানীয় শাসকদের বাধার সম্মুখীন হন, তখন আপনার প্রকৃতিতে মর্দে মুমিনের সকল চিহ্ন ঝলসে উঠতে দেখা যায়।

পূর্ব-পশ্চিমের সকল ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, কমিউনিস্ট, জাতি-পূজারী, মুরতাদ ও মুনাফিক এক হয়ে একে অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করছিল, আপনার উচ্চ

মর্যাদা, প্রতাপের মোকাবিলা করবে বলে। তখন তাদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি, সৈন্যবাহিনী আর ভয়ানক সকল মারণাস্ত্র আপনাকে বিন্দুমাত্রও ভীত বা চিন্তিত করতে পারেনি। আপনার সৈনিকরা এক মুহূর্তের জন্যও কম্পিত বা বিচলিত হয়নি। আপনি শেষ পর্যন্তই নিজ সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার উপর অটল রইলেন। এতে পৃথিবীর তাবৎ কাফির লাঞ্ছিত হল। এ সময় অনেক নামধারী মুসলমানের ঈমানের গায়ে ফাটল ধরতে শুরু করে, আপনাকে তখন দেখা গেছে মজবুত এক পর্বতের ন্যায় নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে থাকতে। এ জন্য বিশ্ব মুসলিম গর্ববোধ করতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত অবিশ্বাসী নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আপনার উপর হামলে পড়ল আর আফগানিস্তানে তাণ্ডবলীলা চালাল।

ইতিহাস সাক্ষী, ঈমানদারদের ছোট একটি দলের উপর কাফিরদের এতবড় সমষ্টি এমন শক্তি নিয়ে আর কখনই হামলা করেনি। আপনি নিজের দেশ, জান, মাল, সামর্থ্য ইত্যাদি সব কিছুর কোরবানী দিয়েছেন। এ ছিল আপনার ঈমান ও সততার বৈশিষ্ট্য। সম্মিলিত শত্রুশক্তির সকল আয়োজনের তুলনায় আপনার ঈমান ও তাওয়াক্কুলের শক্তি ছিল বহু বহুগুণ বেশী। আমীরুল মুমিনীন! যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। এখানে আমরা আপনাকে মহান আল্লাহর রহমতে এক উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিজয়ের অগ্রিম মোবারকবাদ দিচ্ছি। যার পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। পাশাপাশি ওই মহাসাফল্যের সুসংবাদও দিতে চাই, যা আপনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। কেননা, অবিশ্বাসীদের শত অপপ্রচার সত্ত্বেও আল্লাহ আপনার মর্যাদাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। আপনার ভূমিকা ও চিন্তাধারার সপক্ষে বিশ্ব জনমত সহানুভূতিশীল রয়েছে। আপনার প্রতিপক্ষ যারা ন্যায়নীতি, সুবিচার, মানবাধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার পতাকাবাহী হওয়ার দাবীদার, প্রতিটি ঘটনায়, প্রতি অবসরে তারা আজ মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরূপে লাঞ্ছিত হচ্ছে। যুদ্ধ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। ইহুদী-খৃষ্ট শক্তির মনোবিকার, বুকভরা বিদ্বেষও মানুষ দেখেছে। মানুষ খুব ভাল করে বুঝেছে যে, নিষ্পাপ নাগরিকদের হন্তারক কারা? মানবাধিকারের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে আর কারা মানুষের অধিকার ধ্বংস করে, তাও মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাছাড়া, একথাও দুনিয়া জোড়া মানুষ বুঝে ফেলেছে যে, স্বাধীনতার অর্থ কি আর আইনের শাসন কাকে বলে? এ কথাও আজ মানুষ বুঝতে পারছে যে, নানা ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির ঐক্য কোন্ মূলনীতির আলোকে রচিত হওয়া সম্ভব!

কাফেরের দল আপনার অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারই কামনা করে। ওরা চায় ক্রুসেডীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। আপনাকে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা যে, আপনি গোটা পৃথিবীকে যে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন তার বাস্তবতা বিদালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে; যা এতদিন অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। আপনার ঈমানী শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ-নির্ভরতার ফলে ক্রুসেডারদের প্রতারক চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে।

হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দৃঢ়তার গুণে কাফিররা যেমন তাদের শক্তি প্রদর্শন ও প্রতাপপ্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে তেমনি আপনার শক্তিশালী ঈমানের আভায় বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলামী আদর্শ ও উত্তরাধিকার নতুনরূপে এসে ধরা দিয়েছে, যা একসময় অতীত কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আপনার ভূমিকার ফলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মুসলমানের শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস

কোনটি? আপনার আপসহীন মনোবৃত্তি ও অনড় অবস্থান ইসলাম, জিহাদ, জয়-পরাজয়, আত্মবিসর্জন ও আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয়ের সকল পবিত্র বিষয়ের যথার্থ অর্থ, মর্ম ও দৃষ্টান্ত কার্যত বিশ্বমানবের সামনে এসে গেছে।

ইসলামের পক্ষ ত্যাগ করার শর্তে আপনাকে বিশাল ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত শাসক নেতা হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শান্তি-সুখ ভোগ করার প্রলোভন দেখান হয়েছে। মুনাফিকরা আপনাকে ইসলামী নীতি-আদর্শ ও জিহাদী ভূমিকা ত্যাগ করার জন্য কখনও লোভ-লালসা দেখিয়েছে, কখনও হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করেছে। কিন্তু আপনি মুসলমানদের স্বার্থ ত্যাগ বা ইসলামী নীতি-আদর্শে শৈথিল্য প্রদর্শনে এক মুহূর্তের জন্যও রাজি হননি। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, যদি আপনি জিহাদী চেতনা ছেড়ে মুসলমানের মান-মর্যাদার ব্যবসায় নেমে পড়তেন তাহলে আজ আপনি বিশ্বের সেরা ধনবান আরা ভীষণ শক্তিধর এক শাসকরূপে বরিত হতে পারতেন। কিন্তু যে হৃদয় ঈমানের আলোক-আভায় প্রোজ্জ্বল সে কখনও ঐশী জ্যোতির বিনিময়ে আঁধার ক্রয় করতে পারে না। পারে না পরলোককে বিকিয়ে দিতে নশ্বর কোন কিছুর বদলে।

আরব জাতি তো দেড় হাজার আগেকার একজন বীর ইহুদী সামওয়াল ইবনে আদিয়াকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার উচ্চতর মানবিক গুণাবলীর জন্য। যে আশ্রিত ব্যক্তি ও আমানতের হেফাজতের জন্য বড় বড় সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল। নিজের অবস্থান থেকে এক পা-ও হটেনি। অখণ্ড শামের শাসক হারিস ইবনে জাবালাহ গাস্সানী যখন ওই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চেয়েছিল যা সামওয়ালের কাছে রক্ষিত ছিল, তখন সামওয়াল তা দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে প্রাচীণ সিরিয়ার বাদশাহ সামওয়ালের চোখের সামনে তার পুত্রকে হত্যা করে। তথাপি সামওয়াল তার সত্য অবস্থানে দৃঢ় থেকে ওই আমানত তার হকদারদের (কবি ইমরাউল কায়েসের আত্মীয়বর্গ) হাতে পৌঁছে দেয়। এরপর থেকেই সামওয়ালের চেয়ে হাজার গুণ বেশী স্বীকৃতির দাবীদার। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উচিত, আপনার সাহস ও দৃঢ়তাকে উপমা হিসেবে পেশ করা এবং ভাষা, বক্তৃতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতায় প্রবচনরূপে তা ব্যবহার করা।

প্রখ্যাত আরব কবি আ'শা তার কবিতায় সামওয়ালের প্রশংসা করেছেন এর সবটুকুও আপনার কীর্তিগাথার সামান্য ঝলক মাত্র। এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আমরা সে ঐতিহাসিক কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করতে আগ্রহী, যা আরবী সাহিত্যের অনন্য উত্তরাধিকাররূপে কালজয়ী হয়ে রয়েছে। কবি বলেন-

১। সামওয়ালের মত হও, কেননা সে ছিল দৃঢ়চিত্ত, উচ্চাভিলাষী। সে এত বৃহৎ এক সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল, যার ব্যাপ্তি ছিল রাতের অন্ধকারের মত।

২। সে যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আর বিমুখ করেনি। আশ্রিতের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

৩। তীমা অঞ্চলে তার দুর্গ সাদা ও কাল পাথরের তৈরি। এ এক দুর্জেয় খাটি, যা কাউকে আশ্রয় দিলে কোন অবস্থায়ই গাদ্দারী করে না।

৪। অবরোধকারী সৈন্যরা বলল, হয়ত আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে গাদ্দারী কর এবং ওদের আমাদের হাতে তুলে দাও। নতুবা ওদের এ দুর্গ থেকে বের করে দাও।

সামওয়াল তখন এর জবাবে বলেছিল, আমার সন্তান-সান্ততিসহ আমি নিজে আমার আশ্রিতদের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, তথাপি, মনুষ্যত্বের অবমাননা করব না। হীনতা, ভীতি বা কাপুরুষতা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

হে আমীরুল মুমিনীন! ইসলামী নীতি আদর্শের উপর আপনি যেভাবে দৃঢ়তার সাথে আমল করেছেন, তা দেখে আরব আলেমগণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন। আমরা সর্বক্ষণ আপনার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ আপনাকে আমৃত্যু দৃঢ়পদ রাখেন। আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা আপনার সাথে আছে এবং থাকবে।

আপনার ভূমিকা ও অবস্থানের উপর আরব উলামা-মাশায়েখের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন আছে। আমাদের হৃদয়ও এ বিষয়ে পূর্ণ উন্মুক্ত ও নিশ্চিন্ত। বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ, দাঈ, ইসলামপন্থী ছাত্র যুবক জনতা আপনার সমর্থক। আমরা আপনার নিকট আবেদন জানাই, আপনি কোন গুজব বা অপপ্রচারের প্রতি মোটেও কান দেবেন না। যারা বলে, একজন মানুষের জন্য আপনি গোটা আফগানিস্তানের বিরাট ক্ষতি করেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাত হয়ে গেল আপনার অনমনীয়তার ফলে। এসবই ঈমান-বিরোধী চিন্তার ফসল। আপনার এ সিদ্ধান্ত শতকরা একশ' ভাগ সঠিক ছিল। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ সমর্থিত ছিল।

আপনার পরিবার, আপনার সৈন্যদল ও দেশবাসীর উপর যে বিপদ-আপদ আবর্তিত হয়েছে এসবই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে। এ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্র নির্দেশেই আপনারা সহ্য করছেন। আল্লাহ পাকেরই হুকুম, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, সর্বাবস্থায় দ্বীনের আহকামের উপর আমল কর, ঈমানদারদের বন্ধুত্বে বরণ কর, মুজাহিদদের সাহায্য কর, কাফের-মুশরিকদের বন্ধু বানাবে না, দ্বীনের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক জিহাদ কর-এসব কাজ নিষ্ঠার সাথে করলে দুনিয়াতে মর্যাদা, শাসনক্ষমতা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আখেরাতের যে সাফল্য এ পথে রয়েছে তা কল্পনাতীত। আসহাবুল উখদুদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তা তো এমনই।

'নিঃসন্দেহে এরা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য এমন সব বেহেশত রয়েছে যার তলদেশে প্রবাহিত শ্রোতস্বীনি। আর এ হচ্ছে অনেক বড় সাফল্য।' এমনকি কাজ ছিল, যে জন্য আসহাবুল উখদুদকে এত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। এদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনি নীতি আদর্শের উপর আমৃত্যু দৃঢ়পদ ছিল। কোরআন শরীফে এরা ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য বড় মর্যাদার কথা বিবৃত হয়নি। অথচ এ গোটা সম্প্রদায়টিই কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেছিল।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার ও আপনার বিশিষ্ট সহকর্মী যথাঃ মোল্লা মোহাম্মদ হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মওলভী আব্দুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, মোল্লা দাদ-আল্লাহ, মোল্লা রঈস আবদুল্লাহসহ সকল মুজাহিদ নেতা ও তালিবান যোদ্ধার প্রতি বিনীত নিবেদন পেশ করছি, সদা-সর্বদা যথাসম্ভব প্রতিরোধ সংগ্রাম ও জিহাদী কার্যক্রম যেন তারা অব্যাহত রাখেন। শরীয়তের প্রশ্নে কোনদিন যেন আপস না করেন।

গোটা তাওহিদী বিশ্ব জনতার চোখে আপনারাই প্রশান্তিময় শীতলতা। আল্লাহর সকল সৈন্য আপনাদের উপর সন্তুষ্ট। দূরে থাকা সত্ত্বেও আমরা আপনাদের কাছে আছি, যতদূর সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা আমরা করে যাব। পৃথিবীর মুসলমানদের আমরা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেই যাব। উদ্দীপিত করব মুসলিম সন্তানদের নতুন দিনের স্বপ্নের জন্য। সম্ভব হলে ওরা সবাই আপনার নেতৃত্বে লড়াই করবে। পরিশেষে বিজয় আমাদেরই হবে। যদি আপনারা জিহাদের দ্বারা দীনের সম্মানকে উর্ধ্বে তুলে রাখেন তাহলে সহসাই আবার ইসলামী শরীয়তী শাসন কায়েম হবে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে অন্যত্র আনন্দের সময়ও দেখা দিতে পারে। যে আল্লাহ্ জিহাদের হুকুম দিয়ে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন তার ইচ্ছাতেই জিহাদ ভিত্তিক এক শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বিশ্ব মুসলমানের প্রতি তাদের শুভার্থীরূপে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আফগান ইসলামী যোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। বিশেষ করে আফগান জনগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করে হলেও ইসলামী নেতৃত্বের সাথে থাকুন। আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের উচ্চ মর্যাদার লড়াই চালিয়ে যান। ওসব মুজাহিদের প্রতিও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যারা আমীরুল মুমিনীনের সাথে দৃঢ়পদে সত্যের জন্য সংগ্রামরত আছেন, আপনারা ইসলামী নীতি-আদর্শ থেকে এক চুলও নড়বেন না। সর্বাবস্থায় জিহাদ অব্যাহত রাখুন, অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদা সময়মত আসবে।

এখানে পাক কোরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি, যেসব জায়গায় আল্লাহ সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

১। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তাদের শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হবে। যেমন-পূর্বকার লোকদের দেয়া হয়েছে। যে দ্বীন তাদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করা হবে এবং আল্লাহ তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দেবেন। এরা এমন মানুষ যারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে আর কোন শক্তিকে শরীক করে না। এরপরও যেসব লোক অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসিক।'

আয়াতের এ মর্ম থেকে বোঝা গেল, যারা ঈমান আনবে, নেক আমল করবে এবং সর্ববিধ শিরক থেকে মুক্ত থাকবে তাদের জন্যই সাহায্য ও বিজয়।

২। 'হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং দৃঢ়পদ থাক। এ পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের চান, এর অধিকার দেন। তবে চরম সাফল্য তাদের জন্যই-যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে।'

আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের সাহায্য পাওয়ার শর্ত বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, দৃঢ়পদ থাকা আর তাঁর নির্দেশের ওপর অটল থেকে তাঁকে ভয় করে চলা।

৩। 'হযরত মূসা (আঃ) বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, তবে কেবল তাঁর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাক।'

তৃতীয় আয়াতের মর্মেও সাহায্যের শর্ত করা হয়েছে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থাকে।

৪। মহান আল্লাহ বলেন, 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নানা উপদেশের পর আমি এ কথাও লিখেছি যে, পৃথিবীর অধিকারী হবে আমার সৎ কর্মশীল বান্দারা।'

চতুর্থ আয়াতের মর্মে বোঝা যায়, প্রকাশ্য ও গোপন সকল ক্ষেত্রে সংশোধন হয়ে যাওয়া নেক বান্দারাই পাবে পৃথিবীর মালিকানার অধিকার।

৫। ' যেসব লোক স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ আমার প্রভু। অতঃপর এ স্বীকৃতির ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রতি এ বার্তা নিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন যে, আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না, সুসংবাদ গ্রহণ করুন সে জান্নাতের যার ওয়াদা আপনাদের সাথে করা হয়েছে। ইহলোকে আমরা আপনাদের বন্ধু ছিলাম পরলোকেও থাকব। জান্নাতে পরম দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহর মেহমানদারিতে আপনাদের জন্য ওসব বস্তু রয়েছে যা আপনাদের মন চায় অথবা আপনারা যা কামনা করবেন। এ আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আর দ্বীনের ওপর দৃঢ়তাকেই সাহায্য ও সাফল্যের শর্ত করা হয়েছে।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসে সাহায্য ও বিজয়ের শর্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযি ও আহমাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে একটি বাহনে সহযাত্রী ছিলাম। তিনি তখন বললেন, হে তরুণ অথবা হে তরুণ সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের এমন কিছু কথা বলে দেব না তোমাদের খুব উপকারে আসবে?' আমি উত্তর দিলাম, অবশ্যই! হযরত বললেন, 'আল্লাহপাকের বিধিনির্দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত কর, আল্লাহ তোমাদের সুরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহর বিধান ও আদর্শকে সমুন্নত রাখ, আল্লাহকে সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। তোমরা যদি তৃপ্ত ও সুখি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, বিপদে দুঃসময়ে আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করবেন। আর যখন তোমরা কিছু চাইবে বা কোন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আর শুধু আল্লাহর কাছেই চাও। আগামীতে যা কিছু হবে এর সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। যদি গোটা বিশ্ব এক হয়েও তোমার কোন উপকার করতে চায় আর এ উপকারটুকু আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না। আর সারা পৃথিবী যদি তোমার ক্ষতিসাধনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, আর এ ক্ষতিতে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে ওরা সবাই মিলেও তোমার কিছুই করতে পারবে না। আর একটি কথা জেনে রাখ, যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা মানুষের জন্য খুবই পীড়াদায়ক, এ ধরনের ধৈর্যে মানুষের জন্য অসাধারণ কল্যাণ থাকে। আর কঠিন সময়ের পেছনেই রয়েছে সুখের সময় এবং প্রতিটি কষ্টের পরেই থাকে আনন্দ।

জেনে রাখা উচিত যে, দুঃখ, কষ্ট ও ধৈর্য যদি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় তাহলে স্বয়ং আল্লাহতাআলা মুসলমানদের সাহায্য করবেন। দুনিয়াতে তো বটেই, আখেরাতেও তার বিশেষ রহমত মুসলমানদের আবৃত করে রাখবে। কাফিরদের আল্লাহপাক লাঞ্ছিত, অপমাণিত করবেন। এতো আল্লাহর ওয়াদা-যাঁর কোন ব্যত্যয় নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণ ও ঈমানদারদের সাহায্য করব এবং ওই দিবসেও যেদিন মানবজাতি থাকবে সাক্ষীর ভূমিকায়।' আল্লাহ আরো বলেন,

'কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে রুখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। এরা যত খরচই করুক সবই হবে তাদের লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে। তাছাড়া কাফিরদের দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।'

বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'সম্প্রতি তোমার সামনে যুদ্ধরত দুটো সৈন্য বাহিনীর একটি দৃষ্টান্ত কায়েম হল। একটি বাহিনী আল্লাহর পথে লড়াই করে অপরটি অবিশ্বাসী সৈন্য দল। যারা নিজেদের খোলা চোখে মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ রূপে দেখত। আর আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যের দ্বারা শক্তিপ্রদান করে থাকেন। চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।'

এক হাদীসে আছে, 'এই দ্বীন এমন প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়বে যেখানে দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে। আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সম্মানিত করে, আর কিছু মানুষকে লাঞ্ছিত করে এ দ্বীনকে ঘরে ঘরে পৌছে দেবেন। ইসলামপন্থীদের আল্লাহতাআলা সম্মানিত করবেন, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত। সহীহ সনদে ইমাম আহমাদ হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীসে সাহায্য ও দ্বীনের বিজয়ের সুসংবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। অতএব মুসলিম জাতির অন্তরে সাহস ও আশাবাদ ধরে রাখাই ঈমানের দাবী। হকপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত। পরিবেশে আল্লাহপাকের প্রশংসাবাদ ঘোষণা করছি, আর অত্যাচারীদের জন্য করছি ঘৃণা ও চিরশত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

আপনার ভাই ঃ হামুদ ইবনে আকলা আল-শুআইবী, আলী ইবনে খুদায়র আল খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উলওয়ান।

দৈনিক ইনকিলাবের আদিগন্ত পাতায় প্রকাশিত
উবায়দুর রহমান খান নদভীর
একটি অনুবাদ-নিবন্ধ।
সূত্র ঃ ইন্টারনেট

॥ সমাপ্ত ॥

প্রথম সুযোগেই সংগ্রহ করুন

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি / ৮০
বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ ঃ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা / ৮০
জিহাদ – জান্নাতের পথ /৭০
লাল সাগরের ঢেউ ঃ জিহাদী কাব্যগ্রন্থ / ৫০
ইতিহাসের কান্না / ৪০

মাওলানা নদভীর আরো বই

নবীজী (সাঃ) কেমন ছিলেন / ৬০
অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) / ৫০
মহানবীর (সাঃ) স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ / ৮০
আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী / ৫০
অন্তিমশয্যায় খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি / ৫০

যামানার সাথে বদলায় যারা তারা বড় অসহায়
তাহারাই মহা মানব যাহারা যামানারে বদলায়।

-লাল সাগরের ঢেউ